RIZON
কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৪৩
রকিব হাসান
সেবা
প্রকাশনী
ANIK

ভলিউম ৪৩

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
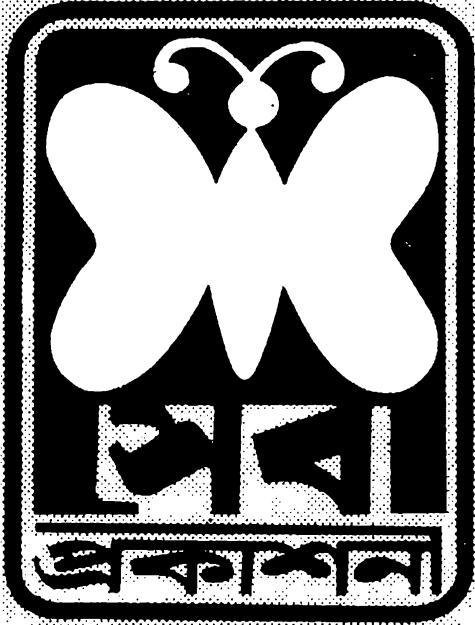
ISBN 984-16-1437-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-43
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

সেবা
প্রকাশনী

উনচল্লিশ টাকা

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪০/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪১/-

তি. গো. ভ. ২৭ (ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে) ৪১/-
তি. গো. ভ. ২৮ (ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ২৯ (আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩০ (নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩১ (মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২ (প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৩ (শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৩৪ (যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৫ (নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩৬ (টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৭ (ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮ (উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৯ (বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক) ৩১/-
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা) ৩২/-
তি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক) ৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া) ৩৩/-
তি. গো. ভ. ৫৯ (চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক) ৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬০ (শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৬১ (চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬২ (যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের যাদুঘর) ৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩ (ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা) ৩৮/-

---

আবার ঝামেলা

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে আছে গ্রীনহিলস গাঁয়ের পুলিশম্যান ফগর‍্যাম্পারকটের। টেবিলে ছড়িয়ে রাখা তিন টুকরো কাগজ। একপাশে তিনটে সস্তা খাম।

প্রতিটি কাগজেই একটা করে লাইন লেখা। কলম বা পেন্সিল দিয়ে নয়, খবরের কাগজ থেকে শব্দ কেটে আঠা দিয়ে পর পর সাজিয়ে বাক্য তৈরি করা হয়েছে, যাতে হস্তাক্ষর দেখে কে লিখেছে সেটা সনাক্ত করা না যায়। একটাতে লেখা: আইভি থেকে ওকে বের করে দাও! আরেকটাতে: কার্টারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো ওর আসল নাম কি। আর তৃতীয়টাতে: নিজেকে পুলিশ ভাবো? তাহলে যাও, কার্টারের সঙ্গে দেখা করো।

'ঝামেলা!' বিড়বিড় করে বলল ফগ। একটা খাম তুলে নিয়ে দেখল। ওপরে লেখা শুধু 'মিস্টার ফগ'। এটাও খবরের কাগজ কেটে নিয়ে লাগানো।

আচমকা চিৎকার করে উঠল ফগ, 'মিসেস বেক! দেখে যাও তো জলদি!'

'আসছি!' রান্নাঘর থেকে জবাব দিল ফগের কাজের বুয়া মিসেস বেক। 'হাতটা মোছার সময়টা দেবেন তো।'

রাগ আরও চড়ে গেল ফগের। বেটিটা ভাবে কি! তাকে গেরাহ্যিই করতে চায় না!

মিনিট পাঁচেক পর এমন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল মিসেস বেক, যেন পাঁচ মাইল দৌড়ে এসেছে। 'বাসন-পেয়ালাগুলো ধুচ্ছিলাম, শুরু করলেন হাঁক-ডাক। দেখুন, মিস্টার ফগ, আগেই বলে রাখি আপনাকে, নতুন দুটো কাপ আর একটা পিরিচ কেনা লাগবে...'

'জাহান্নামে যাক তোমার কাপ-পিরিচ!' চিৎকার করে উঠল ফগ। 'এদিকে দেখো...'

'কাপ-পিরিচ মোছার কাপড়গুলোও তেনা হয়ে গেছে,' ফগের চিৎকার কানেই তুলল না মিসেস বেক। 'কাপড় ছাড়া মুছব কি দিয়ে? কিনতে হবে...'

'মিসেস বেক, তোমাকে একটা অফিশিয়াল কাজে ডেকেছি,' কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠল ফগ। 'ঘরোয়া আলোচনা নিষেধ।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলুন,' ফগের 'অফিশিয়াল' কাজটাকেও মিসেস বেক বিশেষ গুরুত্ব দিল বলে মনে হলো না। 'আমাদের বাগান থেকে টমেটো চুরি করছে কে যদি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে বলব...'

'আহ, থামো, বোকা মহিলা!' ফগের ইচ্ছে করছে 'হাঁদা'টাকে নিয়ে গিয়ে

হাজতে ভরে রাখে ঘণ্টা দুয়েক, যাতে ওর ফড়ফড়ানি বন্ধ হয়। 'যা জিজ্ঞেস করব শুধু সেটার জবাব দেবে। একটা ফালতু কথা বলবে না।'

ভুরু কুঁচকে ফগের দিকে তাকাল মিসেস বেক। মোটেও ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো না। 'ধমকাচ্ছেন কেন? কি করেছি আমি?'

'এই যে তিনটে চিঠি এনে দিলে,' খামগুলো দেখাল ফগ, 'কোথায় পেলে এগুলো?'

'বললাম না তখন, একটা পেয়েছি কয়লার গাদায়, বেলচার ওপর।'

'বাকি দুটো? তা তো বলোনি।'

'একটা পেয়েছি লেটার-বক্সে। কখন ফেলে গেছে বলতে পারব না,' মিসেস বেক জানাল। 'আপনি তখন ছিলেন না। তাই টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছি। আরেকটা পেয়েছি ডাস্টবিনের ঢাকনার ওপর, টেপ দিয়ে আটকানো। ডাস্টপ্যান পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি ঢাকনায় আটকে আছে, ওপরে আপনার নাম লেখা। খামগুলোতে ঠিকানার জায়গায় শুধু নাম দেখে অবাক হয়েছিলাম। কি লিখেছে? মজার কিছু নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' আবার কি জিজ্ঞেস করে বসে মিসেস বেক, সেজন্যে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাইল ফগ। 'আশেপাশে কাউকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছ? কয়লার গাদায় কিংবা ডাস্টবিনের ওপর খাম রাখতে হলে নিশ্চয় বাড়ির ভেতরে ঢুকতে হয়েছে তাকে, বেড়া ডিঙিয়ে।'

'নাহ্, কাউকে দেখিনি,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল মিসেস বেক। 'দেখলে কি মনে করেন আস্ত রাখতাম? ঝাড়ু দিয়ে পিটিয়ে সোজা বানিয়ে দিতাম না। নোটগুলোতে কি লেখা আছে, স্যার? মজার কিছু?'

'না না,' হাত নেড়ে যেন উড়িয়ে দিল ফগ। 'ছাগলের মত রসিকতা করেছে কোন বদমাশ। তা মিসেস বেক, আইভি নামে কোন জায়গার কথা শুনেছ তুমি?'

'আইভি?' ঠোঁট কামড়ে ধরে মনে করার চেষ্টা করল মিসেস বেক। 'না, চিনি না। তবে পপলার চিনি। ওখানে এক ভদ্রলোক থাকেন। শুক্রবারে তার ওখানে কাজ করতে যাই, খুব ভাল ব্যবহার করেন তিনি...'

'আমি জানতে চেয়েছি আইভির কথা, পপলার নয়,' রেগে গেল আবার ফগ। 'ঠিক আছে, যাও এখন। পেছনের বাগানের দিকে নজর রাখবে। কাউকে ঢুকতে দেখলে জানাবে আমাকে।'

'ঠিক আছে, স্যার,' যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল মিসেস বেক। 'কিন্তু আমার কাপ-পিরিচের কি হবে, স্যার? দুটো কাপ, একটা পিরিচ, কাপড়...'

'যাও যাও, যা খুশি কিনে নাওগে! আগামী একটি ঘণ্টা কোন ভাবে বিরক্ত করবে না আমাকে। জরুরী কাজ করব।'

'আমারও জরুরী কাজ আছে,' জবাব দিল মিসেস বেক। 'তেল-কালি দিয়ে রান্নাঘরের স্টোভটার যা দশা করে রেখেছেন, মুছে দেয়ার জন্যে কান্নাকাটি করছে...'

'আহ্, যাও না! কান্নাকাটি বন্ধ করোগে ওটার!'

মিসেস বেক বেরিয়ে যেতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ফগ।

নোট তিনটে নিয়ে গবেষণায় মগ্ন হলো আবার। কোন্ খবরের কাগজ থেকে কাটা? কে পাঠাল এই অদ্ভুত নোট? কেন? তার জানামতে গ্রীনহিলসে 'আইভি' বলে কোন জায়গা বা বাড়ি নেই।

একটা লোক্যাল ডিরেক্টরি বের করে তাতে রাস্তা আর বাড়িঘরগুলো দেখল ভালমত। তারপর তুলে নিল টেলিফোন রিসিভার।

এক্সচেঞ্জ সাড়া দিলে গম্ভীর স্বরে ফগ বলল, 'ফগর‍্যাম্পারকট বলছি পোস্টমাস্টারকে দাও।'

লাইন পেতে দেরি হলো না।

'পোস্টমাস্টার সাহেব?' ফগ বলল। 'একটা তথ্য দরকার আমার। গ্রীনহিলসের সব বাড়ির ঠিকানা তো আপনার জানা। আইভি নামে কোন বাড়ির নাম শুনেছেন?'

'আইভি?' ভাবতে লাগলেন পোস্টমাস্টার। 'আইভি...আইভি...না, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। পপলার চিনি। ওটা হলে...'

'না না, পপলার না,' অধৈর্য কণ্ঠে জবাব দিল ফগ। 'কার্টার নামে একজন লোককেও খুঁজছি আমি...'

'কার্টার? তা চিনি। গ্রীনহিলসে অন্তত পনেরোজন কার্টারের ঠিকানা দিতে পারি।' পোস্টমাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখনই দরকার আপনার?'

'না না, থাক, লাগবে না,' তাড়াতাড়ি লাইন কেটে দিল ফগ। আছাড় দিয়ে ফেলল রিসিভারটা। গজগজ করতে করতে তাকাল আবার নোটগুলোর দিকে। ঠিকানা নেই। নিচে নাম সই করা নেই। এল কোত্থেকে? সত্যি কোন গুরুত্ব আছে এগুলোর, নাকি নিছক রসিকতা?

রসিকতা! কার এতবড় সাহস পুলিশের সঙ্গে রসিকতা করে? ফগর‍্যাম্পারকটের সঙ্গে! মোটাসোটা, কোঁকড়াচুলো হাসিখুশি একটা ছেলের মুখ মনের পর্দায় ভেসে উঠতেই অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল ফগ

'মোটকা পাশা!' জোরে জোরে বলে উঠল সে 'কিশোর পাশা! ছুটি কাটাতে এসেছিল গ্রীনহিলসে। স্কুল খোলেনি, এখনও ফেরত যায়নি রকি বীচে। উদ্ভট সব মেসেজ পাঠিয়ে ভুল পথে চালানোর চেষ্টা করছে আমাকে। আইভি না কচু!'

ঠিক এই সময় দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল মিসেস বেক। 'মিস্টার ফগ, স্যার...'

'ফগর‍্যাম্পারকট!' ধমকে উঠল ফগ।

'সরি, ফগর‍্যাম্পারকট স্যার, এই যে আরেকটা চিঠি।' হাঁপানো দেখে মনে হচ্ছে দশ মাইল দৌড়ে এসেছে।

খামটার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল ফগ, 'কাউকে দেখেছ?'

'না। দড়িতে কাপড় দিতে গিয়েছিলাম। দেখি একটা ক্লিপে আটকানো রয়েছে খামটা।'

'বাড়িতে আজ কে কে এসেছিল?'

'কেউ না, স্যার, শুধু ওই কসাইয়ের দোকানের ছেলেটা।'

'কসাইয়ের ছেলে!' এত জোরে চিৎকার করে উঠল ফগ, লাফ দিয়ে পেছনে সরে গেল মিসেস বেক। 'এতক্ষণে বুঝলাম! কসাইয়ের ছেলে! দেখেছ ওকে?'

'না, স্যার,' ফগের আপেলের মত লাল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিভরে জবাব দিল মিসেস বেক, 'আমি তখন দোতলায় আপনার বিছানা পাতছিলাম। নিচে নেমে দেখলাম, রান্নাঘরের টেবিলে মাংস রেখে চলে গেছে। শিস দিতে দিতে যাচ্ছিল, শুনতে পেয়েছি...'

'কসাইয়ের ছেলে, না? হুঁম! সব এখন পরিষ্কার,' মাথা দোলাতে দোলাতে বলল ফগ। 'মিসেস বেক, আমি বেরোচ্ছি। ফোনটোন এলে ধোরো। শুনে খুশি হবে, এ ধরনের নোট এটাই শেষ, আর আসবে না। ওর ঝামেলাগিরি আজ বের করব আমি...'

বাধা দিল মিসেস বেক। 'কিন্তু টম তো খুব ভাল ছেলে। কসাই আমাকে বলেছে, এ পর্যন্ত যতগুলো ছেলেকে কাজে রেখেছে, তারমধ্যে সবচেয়ে ভাল ওই টম...'

'টমের কথা ভাবছি না আমি।' মাথায় হেলমেট পরল ফগ। বেল্টের বাকল্স্ আঁটল। ওপরে-নিচে ঠেলে বেরিয়ে রইল ফোলা ভুঁড়ি। 'আমি ভাবছি আরেকজনের কথা। এবার ওকে একটা শিক্ষা না দিয়ে ছাড়ব না আমি।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মিসেস বেক। কৌতূহলে ফেটে পড়ছে। কিন্তু ফগকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না।

গটমট করে অফিস থেকে বেরিয়ে এল ফগ। হ্যাঁচকা টানে সাইকেলটা স্ট্যান্ড থেকে নামিয়ে চেপে বসল তাতে। পকেটে চারটে নোট। চতুর্থটার কথা ভাবতে ভাবতে সাইকেল চালাচ্ছে সে। লিখেছে: কার্টারের সঙ্গে যদি দেখা না করো, কপালে দুঃখ আছে তোমার।

'দুঃখ! দুঃখই তো! দেখাব মজা আজ! তোমার বিচ্ছুগিরি আজ না গুছিয়েছি তো আমার নাম ফগর্‌্যাম্পারকট নয়!' বিড়বিড় করে বলল ফগ। 'কসাইয়ের ছেলে! এক চালাকি করে বোকা আর কবার বানাবে? এর আগেও কসাইয়ের ছেলে সেজেছিলে তুমি। আর পড়ছি না ফাঁকিতে।'

কিশোরদের বাড়ির গেট খোলা দেখে সাইকেল নিয়ে ঢুকে পড়ল ফগ। মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো যেন একটা ছোট কুকুর। খেক-খেক করতে করতে দৌড়ে এল ফগের গোড়ালি কামড়াতে।

'আহ্, ঝামেলা! এই, যাও, ভাগো!' চিৎকার করে উঠল ফগ। লাথি ঝাড়ল উল্লসিত কুকুরটাকে লক্ষ্য করে। 'যেমন মনিব, তেমনি তার কুত্তা! সর্! সর্!'

'হাল্লো, মিস্টার ফগ...'

'ফগর্‌্যাম্পারকট!' চিৎকার করে উঠল ফগ।

'সরি, মিস্টার ফগর্‌্যাম্পারকট।' হাসিমুখে কুকুরটাকে ডাক দিল কিশোর,

'অ্যাই, টিটু, সরে আয়। উনি আমাদের মেহমান। তা কি মনে করে, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট? জরুরী কোন কাজ আছে বুঝি?'

সাইকেল থেকে লাফ দিয়ে নামল ফগর‍্যাম্পারকট। লাল মুখটা রাগে আরও লাল হয়ে গেছে। 'কুত্তাটাকে দূরে রাখো।' কিশোর পাশা, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে আমার। নোট পাঠিয়েছ কেন?'

'কি বলছেন আপনি, কিছুই তো বুঝতে পারছি না,' অবাক হয়ে জবাব দিল কিশোর। 'আসুন, ঘরে আসুন। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার চেয়ে ঘরে গিয়ে বসি।'

দুই

পাশের দরজা দিয়ে ফগকে সিটিং-রূমে নিয়ে এল কিশোর।

'তোমার চাচী আছেন?' জিজ্ঞেস করল ফগ। 'চাচা?' তাঁদের সামনে তাঁদের 'দুর্দান্ত' ভাতিজাটাকে ধোলাই দেয়ার লোভ সামলাতে পারছে না ফগ।

'না, বাড়ি নেই,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে মুসা, রবিন, ফারিহা–ওরা সবাই আছে। ডাকব? আপনার গল্প শুনলে খুব খুশি হবে ওরা। আমাদের এ ছুটিটা বৃথাই কাটল। কোন রহস্য-টহস্য পেলেন নাকি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট?'

'যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না,' উপমাটা দিতে পেরে খুব খুশি হলো ফগ। 'তোমার বিচ্ছু বন্ধুগুলোও তারমানে আছে এখানে? গুড। যাও, নিয়ে এসো। এসে শুনুক সব।'

দরজার কাছে গিয়ে এমন জোরে চিৎকার করে উঠল কিশোর, চমকে গেল ফগ। একটা চেয়ারের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে ঘেউ ঘেউ শুরু করল টিটু। জ্বলন্ত চোখে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইল ফগ।

'সর্! সর্ আমার কাছ থেকে, কুত্তা কোথাকার!' ধমকে উঠল ফগ। 'কিশোর পাশা, তোমার ওই জানোয়ারটাকে কয়েক মিনিটের জন্যে ঘর থেকে সরাতে পারো না? আরেকবার আমার ধারে-কাছে এলে কিন্তু লাথি মেরে কোমর ভেঙে দেব।'

'না, তা আপনি পারবেন না,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'আপনি কি চান, জন্তু-জানোয়ারের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগে আমি ক্যাপ্টেন রবার্টসনের কাছে রিপোর্ট করি? অ্যাই টিটু, চুপ করে বোস।'

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দুড়দাড় করে নিচে নেমে আসতে লাগল মুসা, রবিন আর ফারিহা–কিশোরকে এত জোরে চিৎকার করতে শুনে অবাক হয়ে গেছে ওরা। ফগকে দেখে থমকে গেল।

'ওহ্...হালো, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট,' রবিন বলল। 'দারুণ সারপ্রাইজ দিয়েছেন তো!'

'সব ক'টাই আছ তাহলে,' কড়া চোখে সবার দিকে তাকাতে তাকাতে বলল ফগ। 'বসে বসে শয়তানির ফিকির করছিলে, তাই না?'

'না, তা কেন করব?' জবাব দিল মুসা। 'কিশোরের চাচী–মেরিআন্টি, পুরানো জিনিসপত্র সব বেচে দিয়ে বাড়ি পরিষ্কার করতে চাইছেন। চিলেকোঠায় সেগুলোই গোছাচ্ছিলাম আমরা। পুরানো জিনিস আপনিও বিক্রি করতে পারেন, মিস্টার ফগর্যাম্পারকট? এই যেমন ধরুন, পুরানো হেলমেট, যেগুলো আপনার মাথায় ফিট করে না–হটকেকের মত বিক্রি হবে কিন্তু।'

ফিকে করে হেসে ফেলল ফারিহা। পরক্ষণে টিটুর পেছনে সরে গেল, ফগকে তার দিকে আগুন-ঝরা দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে।

'বোসো। সবাই।' আদেশের সুরে বলল ফগ। 'জরুরী ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি আমি। হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করার আগে তোমাদের মুখ থেকে আমি সব শুনতে চাই।'

'সর্বনাশ! কি হয়েছে, মিস্টার ফগ···সরি, ফগর্যাম্পারকট?' কাউচে বসতে বসতে বলল কিশোর, 'আপনিও বসুন না? আরাম করে বসে বসেই শোনান আপনার রূপকথার গল্প।'

'কথাবার্তা ঠিকমত বলবে, কিশোর পাশা, তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি,' ঘরের সবচেয়ে বড় আর্ম-চেয়ারটায় ভারিক্কি চালে বসতে বসতে বলল ফগ। 'তাতে তোমার ভালই হবে। এখন একটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি–আর সবার সঙ্গে চিলেকোঠায় গেলে না কেন তুমি?'

অবাক মনে হলো কিশোরকে। 'কিছু পুরানো মাল নামিয়ে এনে গ্যারেজে রাখতে গিয়েছিলাম। টিটুকে চিৎকার করতে শুনে কে এল দেখতে বেরিয়েছি। এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'কেন করছি? করছি, আজ সকালে কোথায় কি করছিলে তুমি, জানা আছে আমার–সেজন্যে। সকাল বেলা কসাইয়ের ছেলেটার ছদ্মবেশ নিয়েছিলে আবার, তাই না? "না" বলে পার পাবে না, সব জানি আমি। তোমার সেই ডোরাকাটা কসাইয়ের অ্যাপ্রনটা পরে, লাল পরচুলা মাথায় লাগিয়ে···'

'সরি! আজ ওরকম কিছুই করিনি আমি,' বাধা দিল কিশোর। 'স্বীকার করছি, পুরানো মাল টানা-হেঁচড়ার চেয়ে ছদ্মবেশে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে অনেক বেশি ভাল লাগে আমার। কিন্তু আজ বেরোইনি।'

'ছদ্মবেশ নাওনি বলছ?' গলা চড়তে লাগল ফগের। 'তুমি বলতে চাও, আজ সকালে কাপড় টানানোর দড়িতে ক্লিপে আটকে দিয়ে আসোনি খামে ভরা নোটটা? কয়লার গাদায় বেলচার ওপর রেখে আসোনি আরেকটা···'

এতটাই অবাক হলো কিশোর, ভাষা হারিয়ে ফেলল। সবাই হতবাক। একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে। ফগ কি পাগল হয়ে গেল? ক্লিপ! বেলচা! এরপর কোন্খানে রাখার কথা বলবে?

'এরপর কোন্খানে রাখবে?' ধমক দিয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল ফগ। 'বলো! কোনখানে? আমি শুনতে চাই। তারপর গিয়ে খুঁজে দেখব সেখানে।'

'ভেবে দেখি,' কপাল কুঁচকে রেখেছে কিশোর। 'পানির বালতিতে রাখলে

কেমন হয়? কিংবা বাজারের ব্যাগে?'

'কিংবা ড্রেসিং টেবিলের ওপর,' মুসা বলল। 'তাহলে বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হবে না আপনাকে। ঘরে ঢুকলেই পেয়ে যাবেন।'

টকটকে লাল হয়ে গেল ফগের মুখ। ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল সবার মুখের দিকে। ভয় পেয়ে গেল ফারিহা। দরজার দিকে দৌড় দেবে কিনা ভাবছে।

'ইয়ার্কি মারা হচ্ছে, না!' গর্জে উঠল ফগ। 'কপালে দুঃখ আছে বলে দিলাম। তোমাদের কথা শুনেই বুঝতে পারছি, জেনেশুনে প্ল্যান-পরিকল্পনা করেই ওগুলো রেখে দিয়ে এসেছ আমার বাড়িতে।'

'মিস্টার ফগর্যাম্পারকট,' সত্যি সত্যি কিছু একটা ঘটেছে আঁচ করে ফেলে সিরিয়াস হলো কিশোর, 'আপনার কথাবার্তা কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আপনার কথা আপনি খোলাখুলি বলুন। আমরাও সত্যিই বলব।'

'যত ভালমানুষীর ভঙ্গিই করো না কেন, কিশোর পাশা, তোমরা যে এতে জড়িত,তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার,' ফগ বলল। 'তোমার গন্ধ লেগে আছে ওগুলোতে। তুমি যা করো–মজা পাওয়ার জন্যে, ঠিক সেই রকম কাণ্ড। কিন্তু কাউকে আজেবাজে কথা লিখে নোট পাঠানোর মধ্যে মজার কিছু নেই। কাজটা ঠিক করোনি।'

'তারমানে উড়োচিঠি!' ফারিহা বলল। 'সত্যি বলছি, আমরা আসলেই কিছু জানি না।'

'আপনার কথায় মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল, 'কেউ নোটটোট কিছু পাঠিয়েছে, যেটাতে নাম-ঠিকানা কিচ্ছু নেই। উড়োচিঠি বা উড়ো নোটেই কেবল ওসব থাকে না। ভীতু, কাপুরুষের কাজ। তাই না, মিস্টার ফগর্যাম্পারকট?'

'তা তো বটেই,' জবাব দিল ফগ। 'দেখো, কিশোর পাশা, কাজটা যদি তোমার হয়ে থাকে, সোজাসুজি স্বীকার করো, এবারকার মত আর কিছু বলব না।'

'না, আমি করিনি,' ধৈর্য হারানো শুরু করেছে কিশোর। 'আসল কথায় আসছেন না কেন আপনি? কি হয়েছে খুলে বলুন আমাদের। পুরোপুরি অন্ধকারে রাখলে আর কি বুঝব?'

'না, তা তোমরা থাকছ না।' পকেট থেকে তিনটে খাম বের করল ফগ। বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে।

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে খামগুলো নিল কিশোর। বের করে নিল নোটগুলো।

'এই যে, প্রথমটা: লিখেছে–কার্টারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো ওর আসল নাম কি,' জোরে জোরে পড়ল কিশোর। 'দ্বিতীয়টায় লেখা–আইভি থেকে ওকে বের করে দাও!...তৃতীয়টা–নিজেকে পুলিশ ভাবো? তাহলে যাও, কার্টারের সঙ্গে দেখা করো।...সব শেষেরটায় লিখেছে–কার্টারের সঙ্গে যদি দেখা না করো, কপালে দুঃখ আছে তোমার।...কি সব উদ্ভট কথাবার্তা!' বন্ধুদের বলল, 'আর দেখো, হাতেও লেখেনি।'

সবার হাতে হাতে নোটগুলো ঘুরতে থাকল।

'খবরের কাগজ থেকে কেটে নিয়ে সাজিয়েছে,' রবিন বলল। 'সহজ বুদ্ধি। হাতে লিখলে ধরা পড়ে যেতে পারে এই ভয়ে।'

'আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'এই কার্টার লোকটা কে? আর "আইভি" হাউসটাই বা কোথায়?'

'বুঝতে পারছি না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'তবে "পপলার" হাউসটা চিনি–আমাদের গলিতেই।'

'তাই! আবার সেই পপলার!' আনমনে নিজেকেই শোনাল যেন ফগ। কেউ তার কথায় কান দিল না।

'তারপর আছে "ফার",' ফারিহা বলল। 'গাছপালা, ফুল-লতা-পাতা নিয়ে বাড়ির নাম রাখার একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে। "চেস্টনাট"ও আছে। কিন্তু আইভির কথা তো শুনিনি।'

'আর এই যে কার্টারের কথাই ধরো,' একটা নোটের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল কিশোর, 'কেন ওকে আইভি থেকে বের করে দিতে হবে? আর মিস্টার ফগর্যাম্পারকটই বা গিয়ে তাকে তার আসল নাম কি জিজ্ঞেস করবেন কেন? মনে হচ্ছে, কেউ একজন ওখানে বাস করছে ছদ্মনাম নিয়ে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে। পুরো ব্যাপারটাই বড় অদ্ভুত!'

'আমার কাছে দারুণ এক রহস্য মনে হচ্ছে!' মুসা বলল। 'এতদিন ছুটি গেল, কোন কিছু তো পাইনি, এবার বোধহয় পাওয়া গেল।'

'আর নোটগুলোও রেখেছে কোথায় দেখো!' কিশোর বলল। 'কাপড় শুকানোর দড়িতে, ক্লিপে আটকে। কয়লার গাদায়, বেলচার ওপরে। বাকি দুটো কোথায় পেয়েছেন, মিস্টার ফগর্যাম্পারকট?'

'একটা লেটার বক্সে, অন্যটা ডাস্টবিনের ঢাকনায়...' বলেই থেমে গেল ফগ। কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল কিশোরের দিকে। 'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? কোথায় রেখেছ, সেটা তো তুমিই ভাল জানো! সকাল বেলা নাকি আজ কসাইয়ের ছেলেটা গিয়েছিল আমার বাড়িতে–মিসেস বেক বলল। তার পর পরই পাওয়া গেছে শেষ নোটটা। কার কাজ, এরপর সেটা বুঝতে কি আর কারও বাকি থাকে।'

'থাকে। আমি কসাইয়ের ছেলের ছদ্মবেশে আজ কোথাও যাইনি,' জবাব দিল কিশোর। 'সত্যি, দারুণ একটা রহস্য, মিস্টার ফগর্যাম্পারকট। নিশ্চয় এর পেছনে জরুরী কোন কারণ আছে!'

'আমারও তাই ধারণা, কিশোর পাশা!' ব্যঙ্গ করে বলল ফগ। 'তুমি আমাকে বোঝাতে চাইছ, এই অকাজগুলো তোমার নয়। ভেবেছ, তোমাকে আমি চিনি না। খুব খারাপ কাজ করেছ, আমার সঙ্গে রসিকতা করে!'

'আপনি এখন যেতে পারেন, মিস্টার ফগর্যাম্পারকট,' এত করে বলার পরও বিশ্বাস না করাতে রেগে গেল কিশোর। 'রসিকতা আমি করি না তা নয়; কিন্তু সব সময় না। আপনাকে আমি বললাম, আমি এই নোটগুলো পাঠাইনি। অতবড় কাপুরুষ আমি নই। বিশ্বাস যখন করছেন না, কি আর করা। নিন, আপনার নোট। যান এখন।'

ভারী শরীর নিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল ফগ। কিশোরের হাত থেকে নোটগুলো নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল মেঝেতে।

'তোমার জিনিস তুমিই রাখো!' গর্জে উঠল সে। 'মনে রেখো, এ রকম আর একটা নোট যদি আমার কাছে যায়, তোমার হাজতবাস কেউ ঠেকাতে পারবে না। সোজা গিয়ে ক্যাপ্টেন রবার্টসনের কাছে নালিশ করব আমি।'

'এখনই যান না,' জবাব দিল কিশোর। 'কোন আপত্তি নেই আমার। এ সবের পেছনে কোন সিরিয়াস ব্যাপার থাকতে পারে। আমার পেছনে না লেগে যে পাঠিয়েছে তার পেছনে লাগুনগে। কাজ হবে। আমি আবারও বলছি, এ সব নোট আমি পাঠাইনি।'

'কাগজগুলোতে গিয়ে আঙুলের ছাপ খুঁজলেই তো হয়,' হঠাৎ মনে পড়ল মুসার। 'তাহলেও তো প্রমাণ পেয়ে যাবেন কিশোর লিখেছে কিনা।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' কিশোর বলল। 'আমার আঙুলের ছাপ নিতে এলে সঙ্গে সঙ্গে দেব।'

'ঝামেলা! ছেলেগুলো কি গাধা পেয়েছে নাকি আমাকে!' রাগ কমল না ফগের। 'কিশোর পাশা কি এতই বোকা আঙুলের ছাপ দিয়ে দেবে নোটের কাগজে? শয়তানিটা করার আগে দস্তানা পরার কথা ঠিকই মনে ছিল তার। যাকগে, আমি এখন যাচ্ছি। তবে শেষবারের মত বলে দিয়ে যাচ্ছি—আর মাত্র একটা নোট; পেলেই হয়, এমন বিপদে পড়া পড়বে, মনে হতে থাকবে না জন্মালেই ভাল হত। তোমার জায়গায় আমি হলে এখনই গিয়ে কসাই-বালকের অ্যাপ্রন আর পরচুলাটা পুড়িয়ে ফেলতাম। ওই ছদ্মবেশটা না নিলে কোনমতেই বুঝতে পারতাম না আমি, কাজটা কার।'

গটগট করে বেরিয়ে গেল ফগ। দড়াম করে লাগিয়ে দিয়ে গেল দরজাটা। তাতে রেগেমেগে খেউ খেউ করে ছুটে গিয়ে দরজা আঁচড়াতে শুরু করল টিটু।

'অ্যাই টিটু, থাম!' আবার চেয়ারে বসে পড়ল কিশোর। সহকারীদের দিকে তাকাল। 'কি মনে হচ্ছে তোমাদের? অদ্ভুত, তাই না?'

মেঝে থেকে নোটগুলো কুড়িয়ে এনে টেবিলে রাখল রবিন। কিশোরের দিকে তাকাল। 'রহস্য একটা পেয়ে গেলাম, কি বলো?'

ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কয়েকবার কিশোর। মাথা ঝাঁকাল, 'সে-রকমই মনে হচ্ছে!'

তিন

কিশোর পাশার কিছু করতে না পেরে রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি ফিরে এল ফগ। কোনমতেই তার মুখ থেকে ছদ্মবেশের কথা আদায় করতে পারেনি। তবে, সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেছে, এটুকুই স্বস্তি।

সাইকেলটা বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে ঘরে ঢুকল সে। মিসেস বেক তখন রান্নাঘরের মেঝে ধুচ্ছে।

'এই যে, এসে গেছেন,' ফগকে দেখেই বলে উঠল মিসেস বেক। 'আমার একটা নতুন ব্রাশ লাগবে, স্যার। এটার অবস্থা দেখেছেন? রোঁয়াগুলো সব সমান হয়ে গেছে...'

তার কথায় কান দিল না ফগ। 'মিসেস বেক, শুনে খুশি হবে, নোটফোট আর কিছু আসবে না। যে ওগুলো লিখে পাঠাত, আচ্ছা করে ধমকে দিয়ে এসেছি তাকে। ভয়েই আধমরা হয়ে গেছে বেচারা। কি আর করব। এবারের মত মাপ করে দিয়েছি। কাজেই আর কোন নোট পাবে না।'

'ভুল করলেন, স্যার,' হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল মিসেস বেক। হাতের ব্রাশ থেকে সাবানের ফেনা মেশানো পানি ঝরছে। 'আপনি যাবার পর পরই আরেকটা নোট পাওয়া গেছে।'

'ঝামেলা!' প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল যেন ফগ। 'তা কি করে হয়!'

'কিন্তু তাই তো হয়েছে, স্যার,' মিসেস বেক বলল। 'আর এবার রেখেছে কোথায় জানেন? দুধওলা না দেখালে তো কোনমতেই দেখতাম না আমি।'

'দুধওলা? তাই নাকি!' বিস্ময় আরও বেড়ে গেল ফগের। 'কোথায় ওটা?'

'দুধের খালি বোতলের মুখে ঢোকানো। দরজার পেছনে রাখা ছিল বোতলটা।' ফগকে অবাক করে দিতে পেরে মজা পাচ্ছে মিসেস বেক। 'বোতলটা তুলে নিল দুধওলা। মুখের মধ্যে গোঁজা দেখতে পেল গোল করে পাকানো খামটা।'

ধপ করে রান্নাঘরের চেয়ারে বসে পড়ল ফগ। 'রাখল কখন নোটটা? কসাইয়ের ছেলেটা যখন এল, তখন রাখেনি তো?'

'না, স্যার, তা রাখবে কি করে? দুধওলা আসার মাত্র কয়েক মিনিট আগে বোতলটা ধুয়েছি আমি। আপনি কি মনে করেছেন আধোয়া বোতল আমি দুধওলাকে দিই? জীবনেও না। অন্য কাজের বুয়াদের মত আমি অত নোংরা না। রোজ বোতল ধুই। ওটা রাখার তিন মিনিট পরেই এল গ্রেগরি–দুধওলাটা। আপনার দুধের বোতলটা বের করল দরজার পেছন থেকে।'

'আর তুলেই দেখে খামটা, তাই না?' বিশ্বাস করতে পারছে না ফগ।

'হ্যাঁ, স্যার। আমাকে জিজ্ঞেস করল–আরে, মিসেস বেক, এটা কি? খামের ওপর তো মিস্টার ফগের নাম লেখা...'

'ফগর‍্যাম্পারকট!' ধমকে উঠল ফগ।

'আমি তো আর বলিনি, স্যার, বলেছে ওই হাঁদারাম, দুধওলাটা। গ্রেগ কখনও মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট বলে না, বলে ফগ...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ফগ। 'তারপর?'

'তারপর আর কি? খামটা আমার হাতে দিল। আমি নিয়ে গিয়ে রেখে দিলাম আপনার অফিসের টেবিলে।'

'ঠিক কখন ওটা তোমার হাতে দিল দুধওলা?'

'এই মিনিট বিশেক আগে।'

গুঙিয়ে উঠল ফগ। বিশ মিনিট! তখন তো কিশোরদের বাড়িতে ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছিল সে। তারমানে ওদের কেউ এসে যে নোটটা রেখে যায়নি, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। কিশোর তো তার সামনেই বসা ছিল।

'আপনাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে, স্যার?' মিসেস বেক বলল। 'এক কাপ কফি করে এনে দেব? কেটলিতে পানি ফুটছে।'

'অ্যাঁ!...হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও। এক কাপ চা এখন আমার খুব দরকার।' চেয়ার থেকে উঠে ভারী পায়ে অফিসের দিকে চলে গেল ফগ।

ছোট্ট অফিসটাতে ঢুকে বসে বসে ভাবতে লাগল সে। কি করবে এখন? কাজটা কিশোর করেনি। অন্য কেউ এসে মিসেস বেকের অলক্ষে করে যাচ্ছে। আর কি সর্বনাশটাই না করে এসেছে সে নিজে! বোকার মত নোটগুলো ফেলে এসেছে 'বিচ্ছুগুলোর' কাছে! কয়েক মিনিটেই মাথার মধ্যে গোল পাকিয়ে গেল তার। মিসেস বেককে বিশাল এক কাপ চা নিয়ে আসতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'চার চামচ চিনি দিয়েছি, স্যার,' মিসেস বেক বলল, 'আপনি চিনি পছন্দ করেন জানি তো।...তা, প্রসঙ্গটা যখন উঠলই, ব্রাশের কথাটা বলেই ফেলি। ব্রাশ কেনার কি হবে, স্যার?'

'ব্রাশের প্রসঙ্গ উঠল কোথায়?' খেঁকিয়ে উঠল ফগ। 'তুমি যাও তো এখন, মিসেস বেক। মাথাটা এমনিতেই গরম হয়ে আছে। ডিনারের আগে আর এ সব ফালতু কথা নিয়ে এসো না আমার কাছে।'

'তবে কি ডিনারের পরে আসব?'

'যাও! বেরোও!' আর ধৈর্য রাখতে পারল না ফগ।

আহত হলো মিসেস বেক। বেরিয়ে গিয়ে রাগ দেখানোর জন্যে দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিল। সে প্যাসেজে থাকতে থাকতেই হাঁক দিল ফগ, 'মিসেস বেক! শুনে যাও তো!'

ফিরে এল মিসেস বেক। মুখটা গোমড়া করে রেখেছে। 'আবার কি হলো? চায়ে চিনি লাগবে?'

'না না, ওই যে, কসাইয়ের ছেলেটার কথা বলছিলাম।' ফগের মনে এখনও একটা ক্ষীণ আশা—কোনভাবে যদি কিশোরকে জড়াতে পারে। 'সে কি সত্যি সত্যি মাংস নিয়ে এসেছিল? তুমি যে রকম আনতে বলেছিলে?'

'নিশ্চয়ই! রানের দুই টুকরো খুব ভাল মাংস, আপনি যে রকম পছন্দ করেন। সেটা তো আগেই বলেছি আপনাকে। আর আপনাকে এ-ও বলেছি, ওকে আসতে দেখিনি আমি, তখন দোতলায় আপনার বিছানা গোছাচ্ছিলাম। তবে শিস শুনতে পেয়েছি ওর। তা ছাড়া ওর গলাও শুনেছি, চিৎকার করে পাশের বাড়ির ছেলেটাকে ডাকছিল। এর মধ্যে আবার কোন্ রহস্য দেখলেন, স্যার?'

'না, কিছু না!'

'আমি এবার যাব, স্যার? রান্নাঘরে অনেক কাজ।'

'যাও।'

ক্ষীণ আশাটুকুও শেষ, একেবারে চুপসে গেল ফগ। বোঝা যাচ্ছে, কিশোর পাশা নয়, আসল কসাইয়ের ছেলেটাই এসেছিল। টমের ছদ্মবেশে কিশোর এলে মিসেস বেকের নির্দেশমত মাংস আনতে পারত না, কারণ তার জানারই কথা নয় কি ধরনের মাংসের অর্ডার দিয়েছে মিসেস বেক।

টেবিলের দিকে ফিরল ফগ। চৌকোনা খামটা চোখে পড়ল। সেই একই রকম সাধারণ খাম। ওপরে খবরের কাগজের অক্ষর কেটে বসিয়ে লেখা: মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। নোটে এবার কি লিখেছে?

খামের মুখটা ছিঁড়ল সে। নোটটা বের করার আগে থমকে গেল। কাগজে আঙুলের ছাপ দেখার কথা মনে হলো। নিজের দস্তানাজোড়া বের করে পরল। মোটা দস্তানা পরে পাতলা এক টুকরো কাগজ বের করা যে কত কঠিন, এতদিনে জানল। বহু কসরতের পর কাগজটা বের করে টেবিলে রাখল সে।

যা করতে বলা হচ্ছে, সেটা করছ না কেন, হাঁদা কোথাকার!—লেখা রয়েছে কাগজে। আপেলের চেয়েও লাল হয়ে গেল ফগের মুখ। এ রকম কথা লেখে! কার এত্তবড় সাহস! ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখোনি, বাছাধন! দাঁড়াও, আগে ধরে নিই, তারপর বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল!

ক্যাপ্টেনের কাছেও যেতে পারব না এখন—ভাবছে সে। গেলে সব কথা খুলে বলতে হয়। কিশোরকে ফোন করে তখন বলে দেবেন তিনি, রহস্যটার তদন্ত করার জন্যে। এরচেয়ে অপমানজনক আর কিছু হবে না আমার জন্যে। নাহ্, ছেলেটা সব সময় আমার থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকে। কি করব আমি এখন?

বসে বসে ভাবতে লাগল ফগ, আর দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হতে থাকল। নোটগুলো যে পাঠাচ্ছে তাকে যদি খালি একবার ধরতে পারত! কিন্তু ধরার জন্যে দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই পাহারা দিতে হবে তাকে। সেটা সম্ভব নয়। তার আরও কাজ আছে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ-ঝলকের মত মাথায় ঢুকল বুদ্ধিটা। উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। বব! তার ভাতিজা! কয়েক দিনের জন্যে তাকে এনে রেখে দিলে মন্দ হয় না। ছেলেটার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। দরকার হয় কিছু হাত-খরচা দেয়া যাবে।

চা যে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে খেয়ালই করেনি ফগ। সেটা আর খেল না। বেরিয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকে দেখে মজা করে চা খাচ্ছে মিসেস বেক। এটা তার দ্বিতীয় কাপ।

'মিসেস বেক, আমি বেরোচ্ছি,' ফগ বলল। 'ফিরতে ফিরতে বিকেল হবে। কড়া নজর রাখবে। খেয়াল রেখো, আবার কেউ নোট রেখে যায় কিনা।'

'আপনার মাংসের কি হবে, স্যার? রান্না তো বসিয়ে দিয়েছি...'

কিন্তু মাংসের কথা ফগের কানে ঢুকল বলে মনে হলো না। দরজার কাছে চলে গেছে সে। বাইরে বেরিয়ে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে রাখা সাইকেলটা সোজা করে নিয়ে তাতে চেপে বসল।

কাপে আবার চা ঢেলে নিল মিসেস বেক। ভাবল, রাতে ডিনারের সময়ও

যদি না ফেরে ফগ, মাংসগুলো সে নিজেই খেয়ে ফেলবে। নষ্ট তো আর হতে দেয়া যায় না।

মায়ের সঙ্গে খেতে বসেছিল তখন বব আর তার যমজ দুই ভাই জব ও পাব। এই সময় বাড়ির ভেতরে ঢুকল ফগ। জানালা দিয়ে চোখ পড়তেই বলে উঠলেন ববের মা, 'আরে, এ-কি! ফগ এসেছে...'

ঝট করে জানালার দিকে ফিরে তাকাল জব আর পাব। চাচাকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে চেয়ার-টেয়ার উল্টে ফেলে দৌড় দিল দোতলার সিঁড়ির দিকে। অ্যাটম বোমা পড়লেও এত জোরে দৌড় দিত না। চাচাকে যমের মত ভয় পায়। ববও পালাতে যাচ্ছিল, কিন্তু দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে ততক্ষণে ফগ। বলল, 'অ্যাই, কোথায় যাচ্ছিস? তোর জন্যে একটা চাকরি ঠিক করেছি আমি। পুলিশকে সাহায্য করতে হবে।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে পড়ল আবার বব। কাছে এসে তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে ফগ বলল, 'আমার পরে পরিবারের মধ্যে তুইই হলি সবচেয়ে বুদ্ধিমান। তাই তোর কথাই সবার আগে মনে পড়ল আমার।'

সন্দেহ ফুটল মিসেস র‍্যাম্পারকটের চোখে। কিছু বললেন না। তাকিয়ে রইলেন দেবরের দিকে।

ববও সন্দিহান। পুলিশম্যান এই চাচাটিকে হাড়ে হাড়ে চেনে সে। মিনমিন করে জিজ্ঞেস করল, 'কাজটা কি?'

'আমার সহকারী হতে হবে তোকে,' ফগ বলল। 'তদন্তের কাজে সাহায্য করতে হবে। ভাবিসনে বিনে পয়সায় খাটাব। রোজ দশ ডলার করে পাবি।'

বলে কি! ববের চোখ তো ছানাবড়া। মিসেস র‍্যাম্পারকটের সন্দেহও বেড়ে গেল। দেবরের কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না।

টাকার কথা শুনে আর 'না' বলতে পারল না বব। তা ছাড়া বললেও শুনত না তার চাচা, জানে। জোর করেই ধরে নিয়ে যেত তাহলে।

'কখন যেতে হবে?' জিজ্ঞেস করল বব।

'এখনই। খাওয়া হয়ে গেছে? ওঠ্। চল, যাই।'

'তুমি কিছু খাবে না?' ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস র‍্যাম্পারকট।

'না না, এখন আমার সময় নেই,' হাত নেড়ে ভাবীকে যেন উড়িয়ে দিতে চাইল ফগ। 'বহুত জরুরী কাজ ফেলে এসেছি।'

চার

সেদিন বিকেলে চিলেকোঠা থেকে পুরানো মাল নামানোয় ব্যস্ত গোয়েন্দারা, এই সময় তীক্ষ্ণ একটা শিস শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। 'কে?' বলেই চোখ পড়ল সিঁড়ির গোড়ায়। 'আরি, বব! তুমি?'

'জলদি নেমে এসো,' হাত নেড়ে ডাকল বব। 'জরুরী খবর আছে। চাচার

সঙ্গে থাকতে এসেছি আমি। বাড়ি থেকে গিয়ে ধরে নিয়ে এসেছে।'

'চাচার সঙ্গে থাকবে!' দৌড়ে নামতে নামতে বলল কিশোর। বিশ্বাস হচ্ছে না তার।

ববকে দেখে কিশোরের পেছন পেছন হুড়াহুড়ি করে নেমে আসতে শুরু করল বাকি তিনজন–না না, চারজন–টিটুও আছে। ঘেউ ঘেউ করে সারা বাড়ি কাঁপিয়ে গিয়ে ববের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। বব কোলে তুলে নিতেই আদর করে ওর গাল চেটে দিতে শুরু করল টিটু।

ববকে দেখে খুশি হলো সবাই।

'এখানে এলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'তোমার চাচা তোমাকে আসতে দিল?'

'দিল,' মাথা ঝাঁকাল বব। 'আগেই তাকে বলে নিয়েছি, আমার যেখানে যেতে ইচ্ছে করে যাব–স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাব চাকরি ছেড়ে দিয়ে।'

ভুরু কুঁচকে ববের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিশোর। 'চাকরি! হুঁ!' আনমনে মাথা দোলাল সে। 'তোমার কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারছি না। চলো, আমাদের ছাউনিতে। সেখানে গিয়ে আরাম করে বসে সব শোনা যাবে।'

ছাউনিতে গিয়ে অনেক কথা হলো, অনেক আলোচনা। ফগের সমস্যার কথা সব ববের কাছে জানতে পারল গোয়েন্দারা। তাকে কি কাজ করতে ডেকে এনেছে ফগ, তা-ও জানল। পঞ্চম নোটটাতে কি লেখা আছে, ফগকে যে 'হাঁদারাম' বলেছে, শুনে হাসতে লাগল সব ক'জন। রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে মীটিংটা পরদিনের জন্যে স্থগিত রেখে যার যার বাড়ি রওনা হলো সবাই।

পরদিন সকালে নিজেদের ছাউনিতে বসে সবার আসার অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর। এক টিন বিস্কুট আর বড় এক বোতল কোকাকোলা এনে রেখেছে। খালি মুখে মীটিং জমে না।

সবার আগে এল রবিন। 'হাল্লো, কিশোর,' দরজা দিয়ে ঢুকেই বলে উঠল সে, 'মেসেজ রহস্যের সমাধান করেছ?'

'যত সহজ ভাবছ তত সহজ না ব্যাপারটা,' জবাব দিল কিশোর।

একটা বাক্সের ওপর বসল রবিন।

এই সময় এল মুসা আর ফারিহা। এবং সবার শেষে ছুটতে ছুটতে এল বব। তাকে দেখেই উল্লসিত হয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল টিটু। ববকে খুব পছন্দ করে সে।

'দেরি করে ফেললাম, তাই না?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল বব। 'আমি তো ভাবলাম, আসতেই পারব না। চাচা বলল, যা একটু ঘুরে আয়। আমি আছি এখন বাড়িতে। নজর রাখতে পারব। তোর ডিউটি বিকেলে।'

'টাকা-পয়সা কিছু দিয়েছে?' জানতে চাইল ফারিহা।

'নাহ্,' আরেকটা বাক্সের ওপর বসতে বসতে বলল বব। 'বলেছে, রোজ ডিনারের সময় রোজকার বেতন মিটিয়ে দেবে। কয়েক ডলার অ্যাডভান্স

চেয়েছিলাম। দিল না। দিলে চকলেট কিনে আনতে পারতাম তোমাদের জন্যে।'

'থাক,' কিশোর বলল, 'যখন দেয় তখনই এনো। আসল কথা বলো এখন। কাউকে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখেছ বাড়ির আশেপাশে? আর কোন নোট রেখে গেছে?'

'না। তাতে হতাশই হয়েছে চাচা। কারণ নোট রাখতে এলে ধরতে পারত।'

'কাউকে দেখোনি? আশেপাশে কোন লোককেই চোখে পড়েনি তোমার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

সামান্য চিন্তা করে বব জবাব দিল, 'পাশের বাড়ির ছেলেটা ঢুকেছিল, বল নিতে। খেলতে খেলতে বল পড়ে গিয়েছিল চাচার বাড়ির সীমানার মধ্যে। দেয়াল টপকে ঝড়ের গতিতে ঢুকল, বলটা তুলে নিয়েই এমন জোরে দৌড় মারল, যেন ভূতে তাড়া করেছে। চাচাকে সে-ও ভয় পায় বাঘের মত। জানালার কাছে বসে সবই দেখেছি আমি। কোন নোটফোট রেখে যেতে দেখিনি তাকে।'

'তুমি একাই দেখেছ? না মিসেস বেকও দেখেছে?'

'দূর, ওই মহিলা দেখবে কি?' হাত নাড়ল বব। 'ওর তো চোখ থেকেও কানা। সামনে দিয়ে হাতি চলে গেলেও খেয়াল করবে না। একমনে কাজ করে, আর যখন-তখন চা খায়। অন্যান্য খাবারেও ভাল লোভ।'

আড়চোখে মুসার দিকে তাকাল ফারিহা। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে হেসে ফেলল সবাই। মুসাও হাসল, 'আমি খাই বটে, কিন্তু মিসেস বেকের মত কানা নই। আমার সামনে দিয়ে এসে নোট রেখে গেলে কোনমতেই পার পেত না ব্যাটা।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল রবিন, 'সত্যিই তাই। বাড়ির মধ্যে পর পর এসে এতগুলো নোট রেখে গেছে লোকটা, মিসেস বেক কানা না হলে চোখে তো অবশ্যই পড়ার কথা।'

'তাহলে তুমি বলছ,' ববের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'পাশের বাড়ির ছেলেটাকে সন্দেহ থেকে বাদ দেয়া যায়?'

'তা বলছি না,' জবাব দিল বব। 'তবে আমি কোন খাম বা কাগজের টুকরো ফেলে যেতে দেখিনি ওকে। আর যে ভাবে বল নিয়ে দৌড় মারল, তাতে মনে হয় না চাচার বাড়িতে ঢুকে ওসব শয়তানি করার সাহস হবে ওর।'

'হুঁ!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। ফারিহার দিকে তাকাল, 'ফারিহা, দাও তো সবাইকে বিস্কুট আর কোক ভাগ করে।'

আলোচনা চলতে লাগল। রহস্যটা কি করে ভেদ করা যায়, তা নিয়ে। 'আইভি' শব্দটার ওপর জোর দিল সবাই। কিশোরের ধারণা, ওটা কোন পুরানো বাড়ি। কোনকালে হয়তো 'আইভি'ই নাম ছিল বাড়িটার—পুরানো আমলে ফুল কিংবা গাছের নামে বাড়ির নাম রাখার একটা রেওয়াজ ছিল। অবার এ-ও হতে পারে, বাড়িটার নাম আসলে আইভি নয়, প্রচুর পরিমাণে আইভি লতায় ছাওয়া

বলে লোকের মুখে মুখে ডাকনাম হয়ে গেছে 'আইভি'। এই শেষ সম্ভাবনাটার ওপর জোর দিল সবাই। ঠিক হলো, বিস্কুট আর কোক খাওয়া শেষ হলেই বাড়িটা খুঁজতে বেরিয়ে পড়বে ওরা।

বব তার সাইকেল নিয়ে এসেছে। বাকি সবারই সাইকেল আছে। সুতরাং বাড়ি খুঁজতে যেতে অসুবিধে নেই। কিন্তু কোথায় যাবে? কোনদিকে?

তিন দলে ভাগাভাগি হয়ে তিন দিকে ছড়িয়ে পড়ার পরামর্শ দিল কিশোর। বলল, টিটুকে নিয়ে সে একা যাবে এক দিকে। রবিন আর ফারিহা আরেক দিকে। মুসার সঙ্গে বব যাবে, ওরা আবার যাবে অন্য আরেক দিকে।

যে যেদিকেই যাক, দেখা শেষ করে আবার এসে মিলিত হবে এই ছাউনিতে। কে কি করে এসেছে, জানাবে অন্য সবাইকে।

সুতরাং যার যার মত ভাগ হয়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে 'আইভি' খুঁজতে বেরোল সবাই।

পাঁচ

কিছুক্ষণ পর আবার যার যার মত ফিরে এসে ছাউনিতে ঢুকল ওরা। সবাই ফিরে এলে এক প্যাকেট চকলেট মেশানো বিস্কুট বের করল কিশোর। আসার সময় দোকান থেকে কিনে এনেছে। সবাইকে দিয়ে, পকেট থেকে নোটবুক বের করল। 'হ্যাঁ, এবার বলো, কার কি খবর?'

'তোমারটাই বলো আগে,' বিস্কুট চিবাতে চিবাতে বলল মুসা।

'আমি তেমন কিছু জানতে পারিনি,' নোটবুক খুলল কিশোর। 'আইভি লতায় ছাওয়া বড় একটা বাড়ি পেয়েছি, টোয়েন্টি ফার্স্ট জুলাই রোডে–নাম, ফ্লাওয়ার গার্ডেন। দেয়াল থেকে শুরু করে ছাত পর্যন্ত আইভি লতায় ছাওয়া। ওটার নাম কখনও "আইভি" ছিল কিনা, সেটা এখন জানতে হবে আমাদের। এগারো নম্বর হলি লেনে আরেকটা ছোট কটেজ পেয়েছি, যেটাতে বাস করে কার্টাররা।'

নাম শুনে কান খাড়া হয়ে গেল সবার। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'যে কার্টারকে খুঁজছি আমরা, সে-ই নয় তো?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'কটেজটার পাশে একটা বড় বাড়ি আছে, ওখানে কাজ করত যে মালী, তার বাড়ি ছিল আগে ওই কটেজটা। আর বড় বাড়িটার নাম: ইয়েলো ফ্লাওয়ার, আইভি নয়। আর বর্তমানে যে কার্টাররা বাস করছে কটেজে, তারাও আমাদের আসল কার্টার নয়, যাকে খুঁজছি আমরা। যাকগে, ওটার কথা বাদ। তোমাদের কথা বলো। রবিন, তুমি আর ফারিহা কি দেখে এলে?'

'বলার মত কিছুই না,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন। 'আইভিতে ছাওয়া একটা বাড়ি পেয়েছি আমরা, বেশ পুরানোই মনে হলো।'

'কিন্তু ওটার নাম গ্রীন হাউস,' ফারিহা জানাল, 'আইভি তো লেখা দেখলাম না কোথাও। বাড়িতে কোন লোকজন না দেখে ড্রাইভওয়েতে ঢুকে পড়েছিলাম আমরা। সামনের গেট থেকে ভালমত দেখা যায় না। বাইরে একটা বড় নোটিশ লাগানো: এই বাড়ি বিক্রি হইবে।'

'অতিরিক্ত পুরানো,' মুখ বাঁকাল রবিন। 'মোটা মোটা থাম। বড় বড় ব্যালকনি বেরিয়ে আছে যেখানে সেখানে। পুরানো আমলে বোধহয় লোকের আর কোন কাজ ছিল না, খালি ব্যালকনিতে আড্ডা দিত আর প্রকৃতি দেখত। নইলে বানাল কেন?'

'আর বড় বেশি নির্জন,' ফারিহা জানাল। 'গা ছমছম করে। জানালাগুলো এমন ভাবে তৈরি, মুখ তুলে তাকালেই মনে হবে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে...'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'ভূতের বাড়ি নাকি?'

ওর কথায় কান না দিয়ে রবিন বলল, 'বাড়িটাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায়, কারণ, ওটার নাম আইভি নয়, লোকজন বাস করে না, সুতরাং কোনও কার্টার থাকার প্রশ্নই ওঠে না।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। মুসা আর ববের দিকে ফিরল। 'তোমাদের কি খবর?'

'আমরা পেয়েছি দুটো বাড়ি,' মুসা জানাল, 'আইভি লতায় ছাওয়া। একটা বাড়ি সন্দেহজনক, কিশোর। ভালমত দেখা দরকার। আমি আর বব দুজনেই একমত।'

'তাই?' খুশি হলো কিশোর। 'ভাল খবর। খুলে বলো।'

'প্রথম বাড়িটা আগে চোখে পড়েছে ববের,' ওকে নোটবুক বের করতে দেখল মুসা। 'বব, তুমিই বলো।'

নোটবুক খুলে নামটা দেখে নিল আরেকবার বব। 'বাড়িটার নাম বেকার লজ, হ্যারিসন রোডে। আগাগোড়া আইভি লতায় ছাওয়া। বাড়িতে লোক থাকে।'

'নাম কি ওদের?' জানতে চাইল ফারিহা, 'কার্টার?'

'উঁহু,' আবার নোটবুকের দিকে তাকাল বব। 'দুধওলাকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়িতে কে থাকে ভাই? কার্টাররা? বলল, না। যারা আছে, তারা নাকি ষোলো বছর ধরে আছে ওখানে। রোজ নিয়মিত দুধ দিয়েছে দুধওলা, কখনও মিস হয়নি—কেবল ওর বিয়ের সময়কার দুটো দিন বাদে।'

নোটবুক বন্ধ করল বব। মুসার দিকে তাকাল, 'মুসা, এবার তোমার বাড়িটার কথা বলো।'

মুসা বলল, 'আমি যেটা আগে দেখলাম, সেটা কিডস লেনে। খুব বেশি বড় না, আবার তেমন পুরানোও না। আধা দোকান, আধা বাসস্থান। সামনের গেটে বড় করে লেখা নোটিশ: কার্টার অ্যান্ড হগম্যান, নার্সারি-মেন। গাছ আর লতার চারা বিক্রয় হইবে। বাড়ির ভেতরে যোগাযোগ করুন।'

'কার্টার অ্যান্ড হগম্যান!' আগ্রহী হয়ে উঠেছে কিশোর। 'আইভি লতায়

ছাওয়া তো?'

'না, ঠিক ছাওয়া বলা যাবে না,' মুসা জানাল। 'তবে আছে, আইভি–সাদা রঙ করা দেয়ালের অর্ধেকটা বেয়ে উঠেছে; পাতার রঙ হলুদে-সবুজে মেশানো, আমার কাছে অস্বাভাবিক লেগেছে। বব আর আমি দুজনেই একমত, ওই অদ্ভুত লতার চারা কার্টার আর হগম্যান দুজনে মিলে লাগিয়েছে। যাই হোক, বাড়িটার নাম আইভি নয়। বরং লেনের নামে নাম: কিডস নার্সারি।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে জোরে একবার টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। 'তোমার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে, এই বাড়িটাই খুঁজছি আমরা। আইভি লতা আছে, দুজন বাসিন্দার একজনের নাম কার্টার···আগে হয়তো বাড়িটার নাম আইভিই ছিল, নতুন বাসিন্দারা এসে বদলে ফেলেছে।'

'কিশোর, এরপর কি করব আমরা?' চোখ বড় বড় করে মাথা দুলিয়ে বলল বব, 'ভাবছি, সারাটা সকাল কি করেছি আমরা, চাচাকে যদি জানাই, কি করে বসবে!'

'যা খুশি করুক,' কিশোর বলল, 'আমাদের কাজ আমরা করে যাব। এখন পর্যালোচনা করে দেখা যাক, কোনটা সন্দেহের তালিকায় রাখব আমরা, আর কোন্‌টা বাদ। প্রথমে ধরা যাক, ফ্লাওয়ার গার্ডেনের কথা। জানতে হবে ওটাতে যারা বাস করে তাদের নাম কার্টার কিনা। আগে বাড়ির নাম আইভি ছিল কিনা। হলি লেনের কটেজটা আগেই বাদ দিয়ে দিয়েছি। ওটা নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ নেই। তারপর আছে রবিনরা যেটা দেখে এসেছে সেটা–গ্রীন হাউস। বাড়িতে লোকজন কেউ নেই, তাই ওটাও বাদ।'

'বাকি থাকল তাহলে কিডস নার্সারি,' বলে উঠল মুসা। 'বাসিন্দাদের নামও মিলে যাচ্ছে। আমার মনে হয়, আগে ওটার ব্যাপারেই খোঁজ-খবর নেয়া উচিত, কিশোর। যদি দেখি নামে মিলছে না, তখন তোমারটাতে খোঁজ নিতে যাব।'

'আমাদের হাউস-কীপার মিসেস বারজিকে জিজ্ঞেস করা দরকার,' কিশোর বলল। 'বহু বছর ধরে গ্রীনহিলসে আছে সে। ও কিছু জানতে পারে।'

কি মনে হতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল মুসা। 'খাইছে! খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। এই ফারিহা, চলো চলো! খাওয়ার সময় যেতে না পারলে মা আর আস্ত রাখবে না।'

সময় দেখে ববও শঙ্কিত হলো। 'বাপরে! এত্ত বাজে!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'দেরি হলে কানমলা তো খেতেই হবে, বেতনটাও দেবে না চাচা। চলি, কিশোর।' সবার দিকে তাকাল। 'চলি, দেখা হবে।'

দৌড়ে বাইরে বেরিয়েই সাইকেলে চেপে বসল সে। চিৎকার করে কিশোর বলল, 'আমি ফোন করব!'

সবাই চলে গেলে কিশোরও এসে বাড়িতে ঢুকল। চাচীকে দেখল লিভিং-রূমে বসে থাকতে। ডাইনিং-রূমে টেবিলে খাবার দিচ্ছে মিসেস বারজি।

কথা বলার এটাই সুযোগ। কোন ভূমিকা না করে সরাসরি বলল কিশোর, 'মিসেস বারজি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি–টোয়েন্টি ফার্স্ট জুলাই

রোডের যে বিশাল বাড়িটা, ফ্লাওয়ার গার্ডেন, ওটাতে কে থাকে জানেন?'

'জানব না কেন,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মিসেস বারজি, 'প্রথমে থাকত হলাররা। বুড়ো হলার মরে গেলে তার বিধবা বুড়ীটা চলে গেল মেয়ের কাছে। তারপর এল নরম্যানরা। টাকাটুকা সব খুইয়ে ওরাও বিদেয় হলো। ওদের পর এল হল্টরা। ওদেরকেও যেতে হলো, বেশ তাড়াহুড়া করেই, কারণ একটা গণ্ডগোল হয়েছিল...'

'সবশেষে এল কার্টাররা, তাই না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কার্টার! কার্টারের নাম কে বলল তোমাকে?' অবাক মনে হলো মিসেস বারজিকে।

'কেউ বলেনি,' তাড়াতাড়ি প্রশ্নটা কাটিয়ে দিতে চাইল কিশোর। 'ভাবলাম কার্টার নামে কেউ এসে উঠেছে বুঝি। টম-ডিকের মত কার্টার নামটাও খুব প্রচলিত তো।'

'না, কার্টার নয়,' মিসেস বারজি বলল। 'এসেছে লেডি বার্টনার। তার কথা আমি তেমন জানি না। শুনেছি, রোগে শয্যাশায়ী। বেচারী! কিন্তু ফ্লাওয়ার গার্ডেন নিয়ে তোমার এত আগ্রহ কেন?'

কার্টাররা থাকে না শুনে আগ্রহ হারিয়েছে কিশোর। 'নাহ্, এখন আর আগ্রহ নেই,' এবারেও প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল সে। 'আচ্ছা, গ্রীনহিলসের কোন বাড়ির নাম কি কখনও আইভি ছিল, জানেন?'

'তোমার ঘটনাটা কি, বলো তো, কিশোর?' সন্দেহ জেগেছে মিসেস বারজির। 'কোন রহস্য-টহস্যের তদন্ত করছ না তো? হতচ্ছাড়া ওই পুলিশম্যানটার সঙ্গে টক্কর লাগালে কিন্তু তোমার চাচী রেগে যাবেন, বলে দিলাম।'

'জানিই তো খেপবে। সে-জন্যেই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, গোপনে। বলুন না, আইভি নামে কোনও বাড়ি ছিল কিনা, যেটার নাম এখন বদলে ফেলা হয়েছে?'

'আইভি? নাহ্, এ নামের কোন বাড়ির কথা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। কেন, আইভি দিয়ে কি দরকার তোমার?'

মিসেস বারজি যতটুকু জানে, জানা হয়ে গেছে কিশোরের। নিজের কথা ফাঁস করতে রাজি নয়। বলল, 'যাই, হাত-মুখটা ধুয়ে আসি। অপরিষ্কার দেখলে চাচী আবার বকা দেবে।'

মিসেস বারজিকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর।

লাঞ্চে বসে সবে অর্ধেক খাওয়া শেষ করেছে, এ সময় বাজল ফোন। মেরিচাচী বললেন, 'দেখ্ তো কিশোর–আমার হাত বন্ধ–তোর চাচা বোধহয়। বাড়ি ফিরতে হয়তো দেরি করবে।'

কিন্তু রাশেদ পাশা নন। করেছে বব। খুব অস্থির হয়ে গেছে মনে হয় সে।

'কিশোর? সাংঘাতিক খেপে গেছে চাচা। আমাকে বেতন দিতে চাচ্ছে না। বাড়িও যেতে দিচ্ছে না। কি করব?'

'আমি আসছি,' কিশোর বলল। 'তোমার চাচার সঙ্গে কথা বলব। খেতে

বসেছি তো, সেরেই চলে আসব। আধঘণ্টার বেশি লাগবে না।'

ছয়

ঠিক আধঘণ্টার মাথায় পৌঁছে গেল কিশোর। দরজার কড়া নাড়তে খুলে দিল মিসেস বেক। কিশোর বলল, 'আমি মিস্টার ফগর্যাম্পারকটের সঙ্গে দেখা করব। বলুন গিয়ে, কিশোর পাশা এসেছে।'

মিসেস বেক ফগের অফিসে ঢুকতেই ধমকের সুরে বলল সে, 'ডেকে আনো ওকে! জানালা দিয়ে আসতে দেখেছি। চুরি করে ববের সঙ্গে কথা বলে যেন সটকে পড়তে না পারে।'

'ও তো আসতেই চাইছে, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে,' মিসেস বেক বলল।

ফগকে অবাক করে রেখে চলে এল মিসেস বেক। কিশোরকে এসে বলল ভেতরে যেতে।

ফগের অফিসে ঢুকেই কিশোর বলল, 'মিস্টার ফগর্যাম্পারকট, ববের ব্যাপারে কয়েকটা কথা বলতে এসেছি আপনার সঙ্গে।' সে জানে, ফগ তাকে বসতে বলবে না। তাই বলার অপেক্ষায় না থেকে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

'ববের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছ? কি কথা!' খর্খর্ করে উঠল ফগ। 'ও আমার বাড়িঘরসুদ্ধ খেয়ে সাফ করে ফেলল। কাজ করতে আনলাম, দেয় ফাঁকি, বাইরে গিয়ে রহস্যের তদন্ত করে। ওর কথা আবার কি শুনব? টাকা-পয়সা কিচ্ছু দেব না ওকে আমি।'

'কিন্তু তাকে বেতন দেবার কথা বলেই তো নিয়ে এলেন,' কিশোর বলল। 'তা ছাড়া সত্যি সত্যি তো কাজের কাজ করে এসেছে বব। কোথায় ও?'

'দোতলায়। ওর ঘরে আটকে রেখে এসেছি,' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল ফগ। 'তোমাকেও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি, কিশোর পাশা, অকারণ নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। জরুরী কাজ আছে।'

'অ, তাই নাকি? তাহলে আমি যাই,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'আমি আসলে বলতে এসেছিলাম, সারা সকাল বব আর আমরা কি করে কাটিয়েছি। আমার মনে হয়েছিল, শোনার আগ্রহ হবে আপনার।'

'কি করেছে সেটাই তো জানতে চেয়েছিলাম!' ফেটে পড়ল ফগ। 'কিন্তু ও শুরু করে দিল মিথ্যে বলা। আইভি লতায় ছাওয়া একটা বাড়ি নাকি খুঁজে বের করতে চাইছে। ফালতু কথা বলে বলে আবার এসে বেতন চায়!'

কঠোর দৃষ্টিতে ফগের দিকে তাকাল কিশোর। 'ঠিকই তো বলেছে ও। একবর্ণ মিথ্যে বলেনি। সত্যিই আমরা একটা আইভি লতায় ছাওয়া বাড়ি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। সামান্যতম বুদ্ধি যদি খরচ করতেন, তাহলে ও বলার

সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যেতেন কেন ওকাজ করছি আমরা।'

অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল ফগ। বুঝে গেছে। ইস্, বড় দেরিতে মাথায় ঢোকে সব কিছু।

'আমি এখন যাই, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট,' কিশোর বলল। 'ববের কথা যেহেতু শোনেননি, আমার কথা কি আর শুনবেন?'

'না, না! বোসো তুমি!' চিৎকার করে উঠল ফগ। 'আইভি লতাওয়ালা বাড়ির কথা বলো সব আমাকে।'

'বলতে অনেক সময় লাগবে,' ফগকে খোঁচাতে লাগল কিশোর। 'এখন তো আপনার অনেক জরুরী কাজ। কাজ নষ্ট করা উচিত হবে না। আমি বরং এখন যাই।'

'জাহান্নামে যাক কাজ!' কখন হাল ছাড়তে হয় জানা আছে ফগের। 'এসো তুমি, কিশোর পাশা, বসো ওখানে। বুঝতে পারছি, ববের কথা না শোনাটা ভুল হয়ে গেছে আমার। তুমি বলো সব।'

'বেশ, ববকে ডেকে আনান তাহলে,' কিশোর বলল। 'খোঁজাখুঁজির মধ্যে সে-ও ছিল। তাকে বাদ দিয়ে আলাপ করাটা উচিত হবে না। ওকে অবিশ্বাস না করে বরং ওকে নিয়ে আপনার গর্ব করা উচিত ছিল, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। ও একটা রত্ন। আর আপনি কিনা ওর কথা না শুনে ওকে নিয়ে আটকে রেখেছেন কয়েদীর মত।'

ভুলটা কি করেছে, বুঝতে পারছে না ফগ। কিশোরের কথা মেনে নিলে বুঝতে হবে ববের মাথায় অনেক বুদ্ধি। ছেলেটা চালাক-চতুর, তাতে কোন সন্দেহ নেই ওর, কিন্তু অত বুদ্ধিমান কবে থেকে হলো তা তো বুঝতে পারছে না।

'ঠিক আছে, নিয়ে আসছি ওকে,' চেয়ার থেকে উঠে বেরিয়ে গেল ফগ। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার তার ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে কিশোর।

তালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কিল খাওয়ার ভয়ে চাচার হাতের নিচ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল বব। একেক লাফে দুটো-তিনটে করে সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে নিচে নেমে এল। সোজা এসে ঢুকল অফিসে।

'তোমার গলা শুনতে পেয়েছি আমি, কিশোর,' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল বব। 'কিন্তু আমাকে মুক্ত করলে কিভাবে?'

'কিভাবে আবার? সকালে যা যা করেছি আমরা, সব বলে দিয়েছি তোমার চাচাকে,' জোরে জোরে বলল কিশোর। কানে আসছে ফগের নেমে আসার শব্দ। 'শোনো, তুমি আর মুসা মিলে যে কিডস নার্সারিটা খুঁজে পেয়েছ, বলে দাও তোমার চাচাকে। ঝামেলা খতম।'

মাথা ঝাঁকানোর সময় পেল কেবল বব, ঘরে ঢুকল তার চাচা।

চেয়ারে বসে ভাতিজার দিকে তাকাল ফগ। 'শুনলাম, তুই যা বলতে চাচ্ছিলি, পুরোটা মিথ্যে নয়, বব। ভাল করে বুঝিয়ে বললেই তো শুনতাম…'

'আমি তো বলতেই চাচ্ছিলাম, চাচা, তুমি শুনলে না,' বব বলল। 'ধমক মারা শুরু করলে। আর টাকার কথা বলতেই…'

‘ওসব কথা থাক,’ বাধা দিল কিশোর। ‘এখন আর তোমার চাচা টাকা দিতে অরাজী নন। আমি তাঁকে বললাম, সকাল বেলা তুমি একটা কাজের কাজ করে এসেছ। আমাদের মধ্যে তুমি আর মুসাই সবচেয়ে সফল।’

‘কিন্তু আমি ওকে টাকাটুকি কিচ্ছু দিতে পারব না,’ মানা করে দিল ফগ।

‘তাহলে আমিও আর একটা কথাও বলব না,’ কিশোরও বলে দিল সোজা। ‘ববের সঙ্গে আপনি খুব অন্যায় করছেন, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। ও আর মুসা মিলে আমাদেরকে কার্টারের সন্ধান দিতে সাহায্য করেছে।’

‘কি বললে! নোটে যার নাম লেখা, সেই কার্টার?’ ফগ অবাক।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ‘হতে পারে। তবে শিওর না আমি এখনও। ববের মুখে সব শুনলে আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন। তবে সে-তথ্যটা শোনার জন্যে বিশ ডলার ব্যয় করতে হবে আপনাকে–আর টাকাটা দিতে হবে আমার সামনে, নইলে ববকে বলার অনুমতি দেব না।’

চাচার সঙ্গে কিশোরকে শান্ত মাথায় এ ধরনের কথা বলতে শুনে চোখ গোল গোল হয়ে গেল ববের। নতুন শ্রদ্ধা নিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল সে। এ রকম বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

ফগের চোখও তার ভাতিজার মতই গোল গোল হয়ে গেছে। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে। কিন্তু বুঝে গেছে, পরাজিত হয়েছে সে। ওই ‘মোটকা বিচ্ছুটা’ আবার তাকে নিয়েছে একহাত। কি করে যেন সব সময় এক ধাপ আগে বেড়েই থাকে, কোনমতে ঠেকানো যায় না! ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে পকেটে হাত দিল ফগ। চকচক করে উঠল ববের চোখ।

দুটো দশ ডলারের নোট বের করে ববের পাশে টেবিলে রেখে দিল ফগ। ‘এই নে। কিন্তু মনে রাখিস, তথ্যটা যদি আমার কাজে না লাগে, কেড়ে নেব এই টাকা।’

টাকাটা নিয়ে কিশোরের হাতে দিল বব। ‘রাখো। আমার কাছে থাকলে খরচ করে ফেলব।’

চাচাকে যে কি পরিমাণ বিশ্বাস করে বব, এ থেকেই বোঝা যায়। হেসে নোট দুটো পকেটে রেখে দিল কিশোর। ববকে বলল, ‘এখন সব কথা বলতে পারো। তোমার চাচা জানেন, আইভি-ছাওয়া বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছিলাম আমরা আজ সকালে। তুমি যখন বললে, বিশ্বাস করেননি, তবে এখন করছেন। মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, কয়েকটা বাড়ি আমরা খুঁজে পেয়েছি–যেগুলো সন্দেহজনক। কেউ জানে না কোনকালে ওগুলোর নাম "আইভি" ছিল কিনা। আপনি খোঁজ-খবর করে কিংবা ডিরেক্টরি ঘেঁটে জানার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। সবচেয়ে সন্দেহজনক, মুসা আর বব যেটা খুঁজে পেয়েছে। বব, বলো তুমি।’

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল বব। তারপর বলতে লাগল সব। কিডস নার্সারিটার কথা জানাল–অর্ধেক দোকান, অর্ধেক বাসস্থান। প্রচুর আইভি লতা আছে। দোকানের বাইরে বোর্ডে নাম লেখা: কার্টার অ্যান্ড হগম্যান।

'আমাদের এখন বের করতে হবে,' বব বলল, 'এই কার্টারই সেই কার্টার কিনা।'

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল, 'কাজটা আমাদের নয়, আপনার, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। যদি কার্টার হয়ে থাকে–তাহলে নোটের লেখা অনুযায়ী ওটা ছদ্মনাম; আসল নামটা কি, তখন আপনাকে বের করতে হবে। তার অতীত নিয়ে সামান্য তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসবে আসল সত্যটা।'

'হুঁম্‌ম্‌!' মাথা দোলাল ফগ, 'একদম ঠিক। সেটা আমি সহজেই পারব। আমাকে সব জানিয়ে খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ, কিশোর পাশা। সত্যি এটা পুলিশের কাজ। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি, তোমরা এ থেকে সরে যাও, অকারণে নাক গলাতে যেয়ো না আর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই কার্টার অ্যান্ড হগম্যানরাই যত শয়তানির মূল। নিশ্চয় জেল খেটেছে কার্টার, বেরিয়ে এসে লোকের চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে ছদ্মনাম নিয়েছে। তাহলে পুলিশের রেকর্ড ফাইলে তার আঙুলের ছাপ থাকতে বাধ্য। আর সেটার সূত্র ধরে তার আসল নাম বের করে ফেলাটাও কিছু না।'

'কিন্তু আঙুলের ছাপ জোগাড় করবেন কি করে তার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ও, সেটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' কুটিল হাসি দেখা দিল ফগের চোখে, ভাল লাগল না কিশোরের।

'তবে মেসেজে বলা রহস্যময় ওই কার্টার এ লোক না-ও হতে পারে, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'সাবধান থাকলে ভাল করবেন।'

'থাক, তোমার আর উপদেশ খয়রাত করার দরকার নেই,' কঠোর হয়ে উঠল ফগের কণ্ঠ। 'তোমার জন্মের বহু আগে থেকে পুলিশের চাকরি করছি আমি।'

ফগকে গুড-বাই জানিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। ববকে জানালা দিয়ে পাহারা দিতে পাঠাল ফগ। যদি আবার কেউ এসে নোট রেখে যায়, তাকে ধরার জন্যে। অসমাপ্ত একটা রিপোর্ট শেষ করল সে। তারপর ঠিক করল, কার্টার অ্যান্ড হগম্যানের সঙ্গে কথা বলতে যাবে। ওই মোটকা ছেলেটা এসে তাকে খবরগুলো জানিয়ে গিয়ে খুব ভাল কাজ করেছে। মনে মনে ববের বুদ্ধির তারিফও না করে পারল না সে, বাড়িটা খুঁজে বের করার জন্যে। তবে বিশটা ডলার হাতছাড়া হয়ে গেছে মনে হতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

'ববটা আজকাল ভীষণ চালাক হয়ে গেছে,' মুখ বিকৃত করে ভাবল ফগ। 'মোটকা ছেলেটার কাছে টাকাটা না দিয়ে দিলে কেড়ে নেয়া যেত। থাকগে, বরং কিডস লেন থেকে ঘুরে আসি। দেখি, কার্টার কি বলে!'

রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে বাইরে বেরোতে গেল সে। দেখে বসে বসে চায়ের কাপে আঁকা ফুলের পাপড়ি গুনছে মিসেস বেক। রাগে পিত্তি জ্বলে গেল ফগের। চিৎকার করে উঠল, 'ঝামেলা! চায়ের কাপের ফুল গোণা···সময়ের কি অপব্যয়!'

দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। গজগজ করতে লাগল, 'অলস, অসতর্ক মেয়েমানুষ!···কাজ নেই কর্ম নেই, বসে বসে থাকা, আর খালি জিনিস ভাঙা···' জানালার দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল সে।

বিশ্বাস হতে চাইছে না। জানালার চৌকাঠে পড়ে আছে একটা চৌকোনা খাম। কোন সন্দেহ নেই কি ওটা, তবু কাছে গিয়ে নামটা পড়ল: মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট।

রহস্যময় নোট! কে রেখে গেছে নিশ্চয় দেখেছে বব। সে যেখানে বসে আছে, তার চোখ এড়িয়ে বাগান পেরিয়ে জানালার কাছে কেউ আসতে পারবে না। খামটা হাতে নিয়ে গটমট করে আবার ভেতরে এসে ঢুকল ফগ।

'বব! বব!' চিৎকার করে ডাকল সে। 'জলদি নেমে আয়! মিসেস বেক, ওখানেই বসে থাকো। তোমার সঙ্গেও কথা আছে আমার।'

সাত

চাচার উত্তেজিত চিৎকার শুনে পড়ি-মরি করে দোতলা থেকে দৌড়ে নেমে এল বব। ভাগ্যিস টাকাগুলো কিশোরের হাতে দিয়ে দিয়েছিল।

'কি হয়েছে, চাচা? কি ব্যাপার?'

চেয়ারে বসে অবাক হয়ে ফগের দিকে তাকিয়ে আছে মিসেস বেক। যেন ভাবছে, হলো কি ফগের!

'বব, এদিকে আয়,' বজ্রপাত ঘটাল যেন ফগের কণ্ঠ। 'এই দেখ, আরেকটা নোট। মিসেস বেক, জানালার দিকেই তো মুখ করে বসে আছ দেখছি। কতক্ষণ ধরে আছ?'

'এই মিনিট তিনেক হবে, স্যার,' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে মনে হচ্ছে মিসেস বেক। 'বাসন-পেয়ালাগুলো ধুয়ে এসে দ্বিতীয় কাপ চা নিয়ে বসেছি। তিন মিনিটই হবে।'

'বাগানে কাউকে ঢুকতে দেখেছ?'

'একটা প্রাণীকেও না,' জবাব দিল মিসেস বেক। 'আপনার হাতে ওটা কি? আরেকটা নোট নাকি! সর্বনাশ! আর জায়গা পেল না, জানালার চৌকাঠে রেখে যায়! সাহস বটে!'

'কিন্তু তোমার তো সেটা চোখে পড়ার কথা!' হতাশ ভঙ্গিতে বলল ফগ।

'দশ মিনিট আগেও তো ছিল না,' মিসেস বেক জবাব দিল। 'জানালা খুলে মুরগীকে বাসি রুটি দিয়েছি। থাকলে তো তখনই চোখে পড়ত। কানা তো আর নই।···ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙাচ্ছেন কেন? আমি কি করলাম?'

'বেড়া ডিঙিয়ে কেউ না কেউ তো ঢুকেছেই। বাগান পার হয়ে জানালার কাছে এসেছে গত দশ মিনিটের মধ্যে।' ববের দিকে তাকাল ফগ, 'তোর তো

অবশ্যই দেখার কথা। দেখিসনি?'

'না…ইয়ে…না, কাউকে দেখিনি আমি!' ভয়ে ভয়ে জবাব দিল বব। মিসেস বেকের চেয়ে কম বিস্মিত হয়নি।

'তারমানে তুই পাহারা দিসনি,' মেজাজ ঠিক রাখতে পারছে না আর ফগ। 'জানালার কাছে থাকলে তোর চোখ এড়িয়ে কেউ ঢুকতে পারত না এ বাড়িতে। কেউ না!'

'কিন্তু জানালার কাছ থেকে আমি এক মুহূর্তের জন্যে সরিনি,' জোর দিয়ে বলল বব। 'বাথরুমেও যাইনি। কসম খেয়ে বলছি, কেউ ঢোকেনি বাগানে।'

'তাহলে নোটটা রেখে গেল কিভাবে?' গর্জে উঠল ফগ। 'রান্নাঘরে বসে রইল মিসেস বেক, তুই বসে থাকলি দোতলার জানালার কাছে–অথচ গোপনে এসে খামটা রেখে চলে গেল সে, তোদের কারোর চোখেই পড়ল না, এ কথা বিশ্বাস করতে বলিস?'

'কি জানি, কিছু বুঝতে পারছি না!' বোকা হয়ে গেছে বব। 'আমিও দেখলাম না, মিসেস বেকও দেখল না, তারমানে কেউ আসেনি–যদি সে অদৃশ্যমানব হয়ে না থাকে।'

'ছাগল পেয়েছিস আমাকে!' রেগে কাঁই হয়ে গেল ফগ। 'অদৃশ্যমানব! মিসেস বেক তো নাকের কাছে জলজ্যান্ত একটা মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলেও দেখতে পাবে না, এতটাই কানা…'

'দেখুন, বাজে কথা বলবেন না!' ঝাঁজিয়ে উঠল মিসেস বেক।

'আর তুই নিশ্চয় পড়ছিলি কমিক!' মিসেস বেকের সঙ্গে না পেরে ববকে ধরল ফগ। 'জলদি বল্! সত্যি কথা! কমিক পড়ছিলি না?'

'না, চাচা, কসম,' পিছিয়ে যেতে শুরু করল বব। 'সত্যিই আমি পাহারা দিচ্ছিলাম। পাহারা দেয়ার জন্যে তুমি টাকা দিচ্ছ, ফাঁকি দেব কেন? আমি হলপ করে বলছি, বাগান পেরিয়ে রান্নাঘরের কাছে কেউ আসেনি।'

'তবেরে হতভাগা, আবার মিছে কথা!' বলেই ববকে লক্ষ্য করে কিল মেরে বসল ফগ। ঝট করে নিচু হয়ে গেল বব। কিলটা ফসকে গিয়ে লাগল টেবিলের কানায়। প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার দিয়ে নেচে উঠল ফগ। এই সুযোগে একছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বব। নিজের সাইকেলটা টেনে নিয়ে চেপে বসল তাতে। তারপর সোজা রাস্তায়। পেছন ফিরে তাকাল না আর।

বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিল ফগ। টান মেরে খামের একধার ছিঁড়ল। ভেতর থেকে বের করল এক টুকরো কাগজ। মিসেস বেককে হাঁ করিয়ে রেখে গটগট করে এসে ঢুকল নিজের অফিসে। কাগজটা পড়ে ফগ নিজেও হতবাক হয়ে গেল। লেখা রয়েছে: কার্টারের সঙ্গে দেখা করে খালি বলো 'তোমার গোপন কথা আমি জানি'–দেখবে কি রকম চমকে যায়।

'ঝামেলা!' আপনাআপনি ফগের মুখ থেকে বেরিয়ে এল শব্দটা। 'মানে কি এ সবের? বেশ, তোমার গোপন কথাই খুঁজে বের করব আমি, মিস্টার কার্টার। আসছি আমি কিডস নার্সারিতে। অনেক সহ্য করেছি।…আর ওই হতচ্ছাড়া ছোঁড়াটা! আমার এতগুলো টাকা হজম করে জানালায় বসে বসে

কমিক পড়ে! দেখাব মজা! আগে আসল কাজটা শেষ করে আসি, তারপর...'

সাইকেলের জন্যে বাইরে বেরিয়ে দ্বিতীয়বার থমকে দাঁড়াল ফগ। আগে ওই মোটকা পাশাটাকে ফোন করে বলা দরকার না, যার জন্যে সুপারিশ করে এতগুলো টাকা খসিয়ে নিয়ে গেল সে, তার সাঙাত কি ফাঁকিবাজিটা করে গেছে? হ্যাঁ, তাই করতে হবে। টাকা ফেরত নিতে হবে ওদের কাছ থেকে।

আরেকবার ঘরে ফিরে এসে কিশোরকে ফোন করল ফগ। নতুন নোট পাওয়ার খবরটা শুনিয়ে অবাক করে দিল তাকে। নোটে কি লেখা আছে, তা-ও জানাল। ববের ফাঁকিবাজির কথা বলতে গিয়ে বলল, 'পাহারা বাদ দিয়ে কমিক পড়ছিল। এত টাকা বেতন দিয়ে কি ওকে কমিক পড়তে রাখা হয়েছে?...জিজ্ঞেস করতে গেছিলাম, পালিয়ে গেছে। তোমার কাছে যদি যায়, বলবে, কাজে ফাঁকি দিয়েছে, অতএব আর টাকা পাবে না। তোমাকে যেটা দিয়েছি, সেটাও ফেরত দিতে হবে।'

'এটা কিন্তু ঠিক বললেন না, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট,' প্রতিবাদ জানাল কিশোর। 'টাকা যা দিয়েছেন, সেটা আপনার কাজ করে দিয়ে সে অর্জন করে ফেলেছে। এরপর যদি তার আর পাওনা হয়ে না থাকে, দেবেন না। এখন কি করছেন আপনি? কার্টার আর হগম্যানের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ,' ফগ বলল। 'বব গেলে বলবে, অর্ধেক সকাল ঠিকমত কাজ করেছে সে, সুতরাং অর্ধেক টাকা পাবে–বাকি দশ ডলার যেন ফেরত নিয়ে আসে।'

জবাব না দিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর। খেপা ফগের আর কোন মন্তব্য শুনতে রাজি নয়। ববের জন্যে দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু দোতলার জানালায় বসে বাগান পেরিয়ে আসা লোকটাকে এই দিনের আলোতেও দেখতে পেল না কেন সে? আর লোকটারও সাহস বটে!

সাইকেলের ঘণ্টার শব্দে জানালা দিয়ে ফিরে তাকাল সে। বব আসছে। সাইকেলটা স্ট্যান্ডে তুলে দৌড় দিল দরজার দিকে।

'হাল্লো, বব,' কিশোর বলল। 'এইমাত্র ফোন করেছিল তোমার চাচা। শুনলাম, আরেকটা নোট নাকি পাওয়া গেছে। তোমার নাকের ডগা দিয়ে তোমার অলক্ষে রেখে গেল কি করে ওটা? তোমার তো পাহারা দেয়ার কথা।'

'কিশোর, বিশ্বাস করো ভাই, সত্যি সত্যি দিচ্ছিলাম,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল বব। 'জানালার ধারে বসে একনাগাড়ে তাকিয়ে ছিলাম বাগানের দিকে। মিসেস বেক নিচে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে মুরগীকে যে খাবার দিয়েছে, তা-ও দেখেছি। ও বলেছে, ওই সময় জানালার চৌকাঠে খামটা ছিল না।'

'মুরগীকে খাবার দেয়ার পরও চোখ সরাওনি বাগানের দিক থেকে?'

'মুহূর্তের জন্যেও না।'

'মিসেস বেকও কাউকে আসতে দেখেনি?'

'না। ও দেখলে তো আমিও দেখতাম। আমার মনে হয় মুরগীকে খাবার দেয়ার সময়ও খামটা ওখানেই ছিল, মিসেস বেক দেখতে পায়নি। ও কোন কিছুই দেখে না। সাধে কি আর কানা বলি!'

'তা অবশ্য হতে পারে,' কিশোর বলল, 'কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। কি ভাবে কি ঘটছে, ব্যাপারটা আমার মাথায়ও ঢুকছে না। যাকগে, তুমি আপাতত আমাদের এখানেই থেকে যাও। তোমার চাকরি খতম। তোমার চাচার ওখানে গিয়ে আর লাভ নেই।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, কিশোর,' কৃতজ্ঞতায় গলে গেল বব। 'আমি জানতাম, তোমার কাছে এলে একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। কোন কাজটাজ আছে, বলো, করে দিই।'

'আছে,' কিশোর বলল, 'চাচীর পুরানো মালের বোঝা সব গ্যারেজে রাখতে হবে আগে। তারপর ঠেলাগাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া লাগবে পুরানো মার্কেটের দোকানে, বিক্রি করার জন্যে।' এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'তোমার চাচা আমাদের একটা কাজ অন্তত কমিয়ে দিতে গেছে। খোঁজ নিতে গেছে কার্টার অ্যান্ড হগম্যানদের বাড়িতে। নোটে যে কার্টারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার খোঁজ নেবে। ওই লোকটা আসল কার্টার না হলে কাল সকালে কিডস নার্সারিতে গিয়ে অহেতুক সময় নষ্ট করা লাগবে না আমাদের।'

ফগের ওদিকে সময় খুব খারাপ যাচ্ছে। প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ নিয়ে কিডস নার্সারিতে পৌঁছাল সে। গেট দিয়ে তীব্র গতিতে সাইকেল চালিয়ে ঢোকার সময় আরেকটু হলেই ধাক্কা লাগাচ্ছিল ঠেলাগাড়িতে করে ফুলের টব ঠেলে আনতে থাকা একটা লোকের সঙ্গে।

'আরে এই মিস্টার, কি করছেন!' ঠেলা থামিয়ে চিৎকার করে উঠল লোকটা।

'কার্টার অ্যান্ড হগম্যানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি,' ফগ বলল।

'ওদের অর্ধেকের সঙ্গে কথা বলছেন আপনি,' তেজের সঙ্গে জবাব দিল লোকটা। 'আমি হগম্যান। কি চাই আপনার? আমার কুকুরের লাইসেন্স আছে, রেডিওর লাইসেন্স আছে, ভ্যানের লাইসেন্স আছে...'

'লাইসেন্স চাইতে আসিনি আমি,' লোকটার কণ্ঠে ইয়ার্কির সুর বুঝেও এড়িয়ে গেল ফগ। 'আমি এসেছি মিস্টার কার্টারের সঙ্গে দেখা করতে।'

'সেটা তো খুব কঠিন কাজ,' খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে জবাব দিল হগম্যান।

'ঘরে নেই?' জিজ্ঞেস করল ফগ। 'নাকি বাগানে?'

'না না, ওসবখানে না,' ফগের এই চাপাচাপি পছন্দ হচ্ছে না হগম্যানের। 'এ মুহূর্তে ঠিক কি করছে সে বলতে পারব না আমি।'

'কিন্তু ওর সঙ্গে এ মুহূর্তে আমার দেখা করাটা জরুরী,' ফগ বলল। 'ওর কাছে আমাকে নিয়ে চলুন, প্লীজ!'

'কি করে? কত কাজ আমার এখানে।'

অধৈর্য হয়ে উঠছে ফগ। 'ওর আসল নাম কি সত্যিই কার্টার?'

অবাক মনে হলো হগম্যানকে। তাকিয়ে রয়েছে ফগের দিকে। 'যদ্দূর জানি তাই তো হওয়ার কথা। সেই ছোটবেলা থেকেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। তখন থেকেই জেনে এসেছি ওর নাম কার্টার। আপনি কি অন্য কিছু

জানেন নাকি?'

'না, তা নয়…তবে…' কথা খুঁজে পাচ্ছে না ফগ। শেষে অন্য প্রসঙ্গে সরে গেল, 'এ বাড়িটার নাম কি আগে অন্য কিছু ছিল? আইভি-টাইভি?'

'তাই বা কেন থাকবে?' হগম্যান বলল। 'এটার নাম কিডস নার্সারি ছিল, যখন আমি কিনেছি। আমি কেনার অনেক আগে থেকেই এই নাম। তা নাম নিয়ে এই গবেষণা কেন, মিস্টার পুলিশম্যান?'

'না, ভাবলাম, দেয়ালে এত আইভি লতা যখন, নামটা আইভি হলেই মানায় ভাল।' অস্বস্তি বোধ করছে ফগ। যা জিজ্ঞেস করছে, উল্টো জবাব শোনা লাগছে। আবার কোন খোঁচানো কথা শুনতে হয়, তাই সাবধানে বলল, 'দয়া করে যদি এখন বলেন, মিস্টার কার্টারকে কোথায় পাব, ভাল হয়।'

'বেশ, না জেনে ছাড়বেনই না যখন, আসুন।'

ঠেলাটা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে ফগকে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোল হগম্যান। একটা বড় ঘরে ঢুকে টেবিলে রাখা একটা গ্লোবের কাছে নিয়ে এল। গ্লোবটা ঘুরিয়ে সামনে নিয়ে এল দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাপটা। একটা নামের ওপর আঙুল রেখে বলল, 'এটা পড়ুন। কি দেখছেন? রিও ডি জেনেইরো। এখানেই আছে এখন কার্টার। বিশ বছর আগে অবসর নিয়ে চলে গেছে গ্রীনহিলস থেকে, কিন্তু আমি রয়েই গেছি; নামটা না বদলে কার্টার অ্যান্ড হগম্যান নিয়েই চালিয়ে যাচ্ছি। এক কাজ করুন। পরের প্লেনটা ধরেই দক্ষিণ আমেরিকায় চলে যান। কার্টারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, আসলেই তার নাম কার্টার কিনা। আমার মনে হয় না, মিথ্যে কথা বলবে।'

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল। রাগে, ক্ষোভে, হতাশায় কেবল তিনটে শব্দ বেরোলো ফগের মুখ দিয়ে, 'ঝামেলা! আহ্, ঝামেলা!'

প্রচণ্ড রাগে মনে মনে নিজেকেই ধমকাতে লাগল সে: ইস্, কেন যে নিজে তদন্ত করতে এসেছিল! তারচেয়ে মোটকা পাশাটাকে পাঠালে এ ভাবে অপদস্থ হওয়া লাগত না।

চুপচাপ বাড়ি ফিরে এল ফগ। কিন্তু চুপ থাকতে পারল না। খানিক পরেই ফোন করল কিশোর। কিডস নার্সারিতে কি জেনে এসেছে, জানতে চাইল।

'কার্টার-ফার্টার বলে কেউ নেই এখন ওখানে,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল ফগ। 'বিশ বছর আগেই ওখান থেকে চলে গেছে কার্টার। ওখানে পাঠিয়ে অকারণ সময় নষ্ট করালে আমার। বব বাঁদরটা কোথায়?'

'আছে এখানেই,' নিরীহ ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'মালপত্র সরাতে আমাকে সাহায্য করছে। আপনি তো তাকে চাকরি থেকে খেদিয়ে দিয়েছেন, তাই বলেছি আমাদের এখানে থেকে যেতে। পারিশ্রমিকটা ঠিকমতই দেব। যাই হোক, কিডস নার্সারির খবরটা জানালেন বলে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট।'

ফগকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর।

আট

পরদিন সকালে রবিন এসে একটা চমকপ্রদ খবর দিল, গ্রীন হাউসের চিমনিতে ধোঁয়া উড়তে দেখে এসেছে। ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হলো সবার কাছেই। সুতরাং ওই 'আপাত নির্জন' বাড়িটাতেই আগে খোঁজ নিতে চলল সবাই।

পাঁচটা সাইকেলে করে রওনা হলো ওরা। সাইকেলের পেছন পেছন দৌড়ে চলল টিটু, জিভ বের করে হাঁপাতে হাঁপাতে।

ববের কপাল খারাপ, কিছুদূর এগোতে না এগোতে পড়বি তো পড় একেবারে বাঘের মুখে—তার চাচা ফগ। ববকে দেখেই সাইকেল নিয়ে ছুটে এল সে, 'বব! বব!' বলে চেঁচানো শুরু করল। যেদিকে খোলা পেল সেদিকে ঘুরেই ছুট দিল বব। তার সঙ্গে রইল বাকি সবাই। ফগকে কাটাতে অনেক বেগ পেতে হলো ওদের।

অনেক ঘুরে সাবধানে ফিরে এল আবার গ্রীন হাউসের সামনে। ফগকে দেখা গেল না আশেপাশে কোথাও।

রবিনের কথা ঠিক। সত্যি চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে।

'জঘন্য জায়গা,' বাড়িটা দেখেটেখে রায় দিল কিশোর। 'কুৎসিত। আজকাল এ সব বাড়ি দেখলে ভূতের বাড়ি মনে হয়।...কি রকম নোংরা দেখো। কতকাল ধরে খালি পড়ে আছে কে জানে।'

'ভূতের কথা বলে তো দিলে ভয় ধরিয়ে,' মুসা বলল। 'নইলে ভেতরে ঢুকে দেখতাম।'

'ভূত বললেই তো আর ভূত নেই,' জবাব দিল কিশোর। 'ধোঁয়া মানে আগুন, আর আগুন মানে মানুষ। ভেতরে ঢুকে দেখতেই হবে।' সাইকেলটা একটু আড়াল করে রাখল দেয়ালে ঠেস দিয়ে। ফিরে এসে বলল, 'সাইকেলগুলো এমন ভাবে রাখো, যাতে রাস্তা থেকে সহজে দেখা না যায়। তোমরা এখানেই আশেপাশে লুকিয়ে থাকো। আমি আর ফারিহা যাচ্ছি, টিটুর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে। কেউ বেরোলে বলব কুত্তাটা হারিয়ে গেছে। ফারিহাকে ছোটমানুষ দেখলে সহজে সন্দেহ করবে না।'

'ঠিক,' টিটুর কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল রবিন। পেছনে গেল মুসা আর বব।

ফারিহাকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল কিশোর। ঘুরে চলে এল পেছন দিকে। জোরে জোরে টিটুর নাম ধরে ডাকতে শুরু করল। হাতের কাছে যে ক'টা জানালা পড়ল, সবগুলোর কাঁচে নাক ঠেকিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল।

আসতে আসতে রান্নাঘরের কাছে চলে এল। পেছনের আঙিনায় মানুষ বাস করার আরও প্রমাণ পেল, ভেজা কাপড় শুকাতে দেয়া হয়েছে দড়িতে।

জোরে জোরে টিটুকে ডাকা শুরু করল আবার কিশোর। ডাক শুনে

রান্নাঘরের দরজায় উঁকি দিল একজন বয়স্কা মহিলা। চেহারাটা এক সময় ভালই ছিল, খেটে খেটে আর দুশ্চিন্তাতে এখন ভেঙেচুরে গেছে।

'কি ব্যাপার,' জিজ্ঞেস করল সে, 'কুকুর হারিয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'খুঁজে পাচ্ছি না। বিরক্ত করলাম বোধহয় আপনাদের। আমরা তো ভেবেছিলাম, খালি বাড়ি।'

গায়ের শালটা ভালমত টেনে দিল মহিলা। 'আমরা এটার কেয়ারটেকার। ভিক্ষুক-ভবঘুরেদের আস্তানা হয়ে যাচ্ছে দেখে বাড়ির মালিক আমাদের থাকতে বলেছেন। তা-ও প্রায় পনেরো বছর হয়ে গেছে। সত্যি কথাটাই বলি, এখন মনে হচ্ছে বিক্রি না হলেই ভাল হয়, থাকতে পারব।'

হঠাৎ বাড়ির মোড় ঘুরে ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে এল টিটু। কিশোরকে দেখে চেঁচিয়ে গলা ফাটাতে শুরু করল। রবিন ওকে আটকাতে পারেনি; কোন্ ফাঁকে ছুটে চলে এসেছে। এতক্ষণ আটকে থেকে কিশোরকে দেখে যেন উন্মাদ হয়ে গেছে।

'ওই যে, এসে গেছে তোমার কুকুর,' মহিলা বলল। 'কাছাকাছিই কোথাও ছিল। এ রকম একটা কুকুর যদি আমি পেতাম! এ বাড়িতে চোরের বড় উপদ্রব। রাতে তিন দিন এসেছে। খালি বাড়িতে কিসের আশায় আসে ওরা, বুঝি না।'

ভেতর থেকে পুরুষকণ্ঠে ডাক শোনা গেল। পরক্ষণে একটানা কাশি।

'আমার স্বামী,' মহিলা বলল। 'ভীষণ অসুস্থ। তোমরা কি বাজারের কাছ দিয়ে যাবে? ওষুধের দোকানে যাওয়ার দরকার ছিল, কিন্তু ওকে একা ফেলে যেতে পারছি না এখন।'

'আপনার ওষুধ দরকার?' কিশোর বলল, 'কি ওষুধ লাগবে, প্রেসক্রিপশনটা দিন, এনে দিই। আমাদের সাইকেল আছে।'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়,' কৃতজ্ঞ হয়ে গেল যেন মহিলা। 'দাঁড়াও নিয়ে আসছি।'

ভাবছে কিশোর, ভেতরে পুরুষ মানুষও আছে। নামটা জানা দরকার। প্রেসক্রিপশনে নিশ্চয় নাম লেখা থাকবে।

মিনিটখানেকের মধ্যেই ফিরে এল মহিলা। প্রেসক্রিপশন আর টাকা বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে, 'এই যে।'

প্রেসক্রিপশনের রোগীর নামটা দেখে ভুরু কুঁচকে গেল তার। মিস্টার ফিল কার্টার!

মহিলা বলল, 'দোকানদার আমাদের চেনে।'

'আমিও চিনি,' কিশোর বলল। 'অসুবিধে হবে না। দশ মিনিটের মধ্যেই চলে আসছি আমরা।'

সুন্দর একটা হাসি দিল মহিলা। তার মলিন, শীর্ণ মুখটাও ঝলমল করে উঠল সে-হাসিতে।

ফারিহার দিকে তাকাল কিশোর, 'চলো।' টিটুকে ডাকল, 'আয়, টিটু।'

মহিলার কাছ থেকে সরে এসে নিচুস্বরে বলল কিশোর, 'লোকটার নাম

কার্টার।'

ড্রাইভওয়ে ধরে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল ওরা। মাথার মধ্যে ভাবনাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে কিশোরের। এই কার্টার কি অন্য কেউ, নাকি ওরা যাকে খুঁজছে সেই লোকই?

'এত দেরি করলে কেন?' ওদের দেখে এগিয়ে এল রবিন। 'কি করছিলে?'

সাইকেলটা দেয়ালের কাছ থেকে সরিয়ে আনতে আনতে কিশোর বলল, 'পনেরো বছর ধরে দুজন কেয়ারটেকার বাস করছে ও বাড়িতে। লোকটার নাম কার্টার। কি বুঝলে?'

'আমরা এখন ওষুধের দোকানে যাচ্ছি ওষুধ আনতে,' ফারিহা জানাল।

'কেন!' চমকে গেল মুসা, 'কার জন্যে?'

'চলো, যেতে যেতে বলছি,' কিশোর বলল।

সাইকেল চালাতে চালাতে কথা বলা বিপজ্জনক। কারণ সবাই কাছ ঘেঁষে আসছে শোনার জন্যে। হ্যান্ডেলে হ্যান্ডেলে লেগে যাওয়ার জোগাড়। যাই হোক, নিরাপদেই ওষুধের দোকানে পৌঁছল ওরা। প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে ভেতরে ঢুকল কিশোর।

প্রেসক্রিপশন দেখে দোকানি জিজ্ঞেস করল, 'বুড়ো কার্টার কেমন আছে এখন? গত এক বছর ধরেই তো ভুগছে। আসলে ওর যা রোগ, হাওয়া পরিবর্তন দরকার। এত পুরানো বাড়িতে থাকলে কি আর কারও শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ওকে নিয়ে এখন সাগরের পাড়ে চলে যাওয়া উচিত বুড়িটার।'

'মিসেস কার্টারকে তো খুব ভালমানুষই মনে হলো,' কিশোর বলল। 'মিস্টার কার্টারকে আমি চিনি না।'

'আজব লোক,' প্রেসক্রিপশন দেখে ওষুধ বের করতে করতে দোকানি জানাল। 'সারাক্ষণ কেমন ভয়ে ভয়ে থাকে। ওর বউয়ের যখন অসুখ করেছিল, ও ওষুধ নিতে আসত আমার দোকানে, মুখ খুলে হ্যাঁ-টা পর্যন্ত বলতে চাইত না।...এখন বিছানায় পড়েছে বুড়োটা। সাগরের পাড়ে আর যাবে কোত্থেকে, টাকা লাগে না? আছে নাকি কিছু। কোনমতে টেনেটুনে চলে। আমার তো মনে হয়, ওই বাড়ি বিক্রি হোক এটাও চায় না ওরা এখন। থাকবে কোথায়?'

'বাড়িটার মালিক কে?' জানতে চাইল কিশোর।

'জানি না,' দোকানি বলল। 'বহুকাল ধরে খালি পড়ে আছে—আমি এ গাঁয়ে আসার আগে থেকে। এখন তো ভেঙে ভেঙে পড়ছে। মানুষ বাসের অযোগ্য। থাকতে গেলে বহু মেরামত দরকার।...এই যে, নাও।...যা-ই বলো, বুড়িটার জোরেই এখনও বেঁচে আছে বুড়ো। স্বামী-অন্ত প্রাণ।'

দোকানিকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। সবাইকে সহ ফিরে চলল আবার গ্রীন হাউসে।

বাড়ির গেটে পৌঁছে সঙ্গীদের বলল, 'ফারিহাকে নিয়ে আমি আবার যাচ্ছি ওখানে। দেখি, মিসেস কার্টারের মুখ থেকে আর কিছু বের করতে পারি নাকি।'

কিন্তু আর কোন কথা বের করা গেল না। কথা বলার সময়ই নেই মিসেস কার্টারের। স্বামীর সেবাতেই ব্যস্ত।

খানিকটা হতাশ হয়েই ফারিহাকে নিয়ে ফিরে এল আবার কিশোর।

ফারিহা বলল, 'মহিলাটা এত ভাল…খোদা, ওর স্বামীর যেন কিছু না হয়! তাহলে ও বাঁচবে না। আমাদের কাছে ভাল লাগলে কি হবে, ফগর‍্যাম্পারকটের কাছে যে লোক নোট লিখেছে, সে ওদের দু'চোখে দেখতে পারে না,বোঝাই যায়। কিন্তু কি গোপন কথা আছে কার্টারের? তার গোপন কথা বলে কি বোঝাতে চেয়েছে?'

'এখনও কিছু বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে মনে হচ্ছে এগোচ্ছি আমরা, উত্তর জানতে দেরি হবে না…' হঠাৎ চাপা উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'বব, তোমার চাচা! জলদি লুকাও!'

মুহূর্তে ঘন ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল বব।

ধীরে সুস্থে সাইকেল চালিয়ে আসতে আসতে কিশোরদের ওপর চোখ পড়ল ফগের। সঙ্গে সঙ্গে গতি বাড়িয়ে দিল। ছুটে এসে ব্রেক কষে থামল। ধমকে উঠল, 'ঝামেলা! এখানে কি করছ তোমরা?'

মুসা জবাব দিল, 'অনেকক্ষণ ছোটাছুটি করেছি তো, বিশ্রাম নিচ্ছি।'

'বাজে কথা রাখো!' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাড়িটা দেখল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। 'ও, বুঝেছি। আইভি লতায় ছাওয়া…' ওদের দিকে ফিরে বলল, 'তাহলে তদন্ত করা হচ্ছে এখানে। বব পাজিটা কোথায়?'

'আমরা কি করে জানব?' নিরীহ স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'আপনার তাড়া খেয়ে সেই যে ছুটল, আর দেখা নেই…নিশ্চয় বাড়ি চলে গেছে। মা'র কাছে নিশ্চয় আপনার গুণপনার কথা বয়ান করছে–ওর মা তো ভাবীই হয় আপনার, তাই না? বলছে হয়তো কাজ করিয়ে টাকা দিতে চান না…'

'খবরদার!' গর্জে উঠল ফগ। 'কথাবার্তা ঠিকমত…'

কিন্তু তাকে কথা শেষ করতে দিল না টিটু। এতক্ষণ চুপ করে ছিল ফগকে শান্ত থাকতে দেখে। কিন্তু যেই সে রেগে গেল, অমনি টিটুও উত্তেজিত হয়ে উঠল। ঘাউ-ঘাউ করে ছুটে গেল ফগের গোড়ালি কামড়ে দেয়ার জন্যে।

বেগতিক দেখে লাফ দিয়ে সাইকেলে চড়ে দ্রুত কেটে পড়ল ফগ।

নয়

বিকেল বেলা কিশোরকে ফোন করল ফগ। বলল, 'শয়তানি বন্ধ করে দিয়ে এলাম। নোট আর পাঠাবে না।'

কিশোর অবাক। 'কি করে বন্ধ করলেন?'

'পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে ওদের বেরিয়ে যেতে বলে দিয়ে এসেছি,' খুশি খুশি

গলায় জানাল ফগ। 'ওরা বেরিয়ে গেলেই নোট লেখক আর নোট লিখে পাঠাবে না আমার নামে।'

'এ কি করেছেন, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট! কাজটা কি ঠিক হলো?'

'পুলিশকে পরামর্শ তোমার কাছ থেকে নিতে হবে নাকি?' ফগের মেজাজ ভাল, তাই কিশোরের ওপর চটল না। 'সব শুনতে চাইলে চলে এসো আমার গাড়িতে। আমি বসে আছি।'

'ঠিক আছে, আসছি আমি এখুনি।'

জানালা দিয়ে তাকিয়েই ছিল ফগ। কিশোরকে দেখামাত্র মিসেস বেককে ডেকে বলল, 'যাও, ছোঁড়াটাকে নিয়ে এসো। আর আমাকে এক কাপ চা দিয়ে যাও।'

কিশোর ঘরে ঢুকতেই ফগ বলল, 'বসো।'

তারমানে মেজাজ সত্যি তার খুব ভাল, নইলে কি আর বসতে বলে। বসল কিশোর।

'শোনো, তোমাদের রেখে তখন তো চলে এলাম,' ফগ বলল। 'কিন্তু খুঁতখুঁত করতেই থাকল মনটা। মনে হলো, নিশ্চয় ও বাড়িতে কিছু আছে। হাউস এজেন্টের অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম, হ্যাঁ, বাড়িটার নাম সত্যি এক সময় আইভি ছিল। গেলাম আবার ওখানে। বাড়িতে ঢুকে দেখি দুই বুড়ো-বুড়ি, বুড়োটার নাম সত্যি কার্টার। বুড়ি তো বার বার হাতে-পায়ে ধরতে লাগল–বুড়োটার শরীর খারাপ, ওদের যাতে বের না করে দিই। কিন্তু ওসব ভণ্ডামিতে কান দিলাম না। পুলিশের চাকরি করে কম তো আর দেখলাম না…'

'আপনি ওদের সত্যি সত্যি বেরিয়ে যেতে বললেন!' কিশোর অবাক।

'বলব না মানে? ঘাড় ধরে যে বের করে দিইনি তখনই, সময় দিয়ে এসেছি, এটাই বেশি। জানো ওই কার্টার কি করেছে? জেল খেটেছে। কেন জানো? দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে। চাকরি করত সরকারি এক গবেষণাগারে। সেখান থেকে মূল্যবান তথ্য শত্রু দেশের কাছে গোপনে বিক্রি করেছে বেশ কয়েক বার। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তেই হয়েছে। গেছে জেলে। জেল থেকে বেরিয়ে এসে ছদ্মনামে এখানে আছে। ওর আসল নাম ডকনিস।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'এতক্ষণে ওর গোপন কথাটা কি বোঝা গেল!'

'এতবড় অপরাধীকে বাড়িতে থাকতে দেয়াটা কি ঠিক?' ফগ বলল। 'সে-জন্যেই চলে যেতে বলে এসেছি। যে নিজেই অপরাধ করে জেলে যায়, সে অন্যের বাড়ি পাহারা দেবে কি?'

'কিন্তু লোকটা অসুস্থ। ওর স্ত্রী বুড়ো মানুষ। বড়ই অসহায়।'

'ওসব ভণ্ডামিতে তুমি ভুলতে পারো–ছেলেমানুষ তো, অভিজ্ঞতা কম, কিন্তু আমি ভুলব না। কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে এসেছি।' থেমে দম নিল ফগ। 'বুঝতে পারছ তো এখন, নোটগুলো কেন পাঠানো হচ্ছিল?'

'না, পারছি না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'যে পাঠাচ্ছে তার কি লাভ? একটা ব্যাপার পরিষ্কার, বুড়ো কার্টারের ওপর কোন কারণে আক্রোশ জন্মেছে নোট

প্রেরকের। ওকে বাড়িছাড়া করতে চাইছে। এই করার পেছনেও বড় কোন কারণ আছে।'

'অকারণ মাথা ঘামাচ্ছ তুমি, কিশোর পাশা,' অধৈর্য হয়ে উঠল ফগ। 'এর মধ্যে আর কোন রহস্যই নেই। কাল সকালে বুড়োটা এলেই আমি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ করব। ওকে নিয়ে কি করা যায়, জিজ্ঞেস করব। এতবড় একটা ক্রিমিন্যালকে খুঁজে বের করেছি, এবার আর আমার প্রমোশন ঠেকায় কে...'

'কিন্তু এখন তো আর সে ক্রিমিন্যাল নয়। অপরাধ যা করেছে, তার জন্যে শাস্তিও পেয়েছে–জেল খেটে বেরিয়ে আসার পর তাকে আর কোন্ দোষে দোষী সাব্যস্ত করবেন আপনি?'

'দেখো, আমাকে কাজ শেখাতে এসো না,' যুক্তি খুঁজে না পেয়ে রেগে গেল ফগ। 'একবার যে অপরাধ করে, বার বার করতে পারে...তোমার সঙ্গে এ সব নিয়ে তর্ক করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। তুমি এখন যেতে পারো...' রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিল সে, 'মিসেস বেক, চা এখনও হলো না!'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। গম্ভীর স্বরে বলল, 'আপনি যতই বলুন, মিস্টার ফগর্‌্যাম্পারকট, খোঁড়া যুক্তি দিয়ে আমাকে বোঝাতে পারবেন না। মিসেস কার্টার খুবই ভাল মানুষ। মিস্টার কার্টারও সত্যি সত্যি অসুস্থ। আপনি বুঝতে পারেননি। আপনি যে বলছেন, নোট রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে–তার কিছুই হয়নি। এ সব নোট পাঠিয়ে আপনাকে দিয়ে ওদেরকে ও বাড়ি থেকে বের করতে চাইছে কেউ; নিশ্চয় এর পেছনে জরুরী কোন কারণ আছে। এবং সেই কারণটাই জানতে হবে এখন আমাকে। ডেকে এনে সব জানানোর জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। চলি। গুড-বাই।'

দশ

ফগের অফিস থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। তার রাগের পরোয়াই করল না। বাড়ি ফিরে ববকে বলল, 'চলো, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে।'

'কোথায়?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল বব। 'চাচা কিছু বলেছে নাকি?'

'বলেছে। গ্রীন হাউসে যাব আমরা। এসো।'

মুসা, ফারিহা, রবিন যার যার বাড়ি চলে গেছে। এ মুহূর্তে ওদের খবর দেবার প্রয়োজন মনে করল না কিশোর।

সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুজনে। কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্রীন হাউসে পৌঁছে বাড়ির পাশ ঘুরে চলে এল রান্নাঘরের দিকটায়। সাইকেল রেখে জানালার দিকে এগোল কিশোর।

যা ভেবেছিল, তাই। বাড়ি ছেড়ে যায়নি কার্টার দম্পতি। এমনকি পোঁটলা-পুঁটলিও গোছায়নি।

মেঝেতে পড়ে আছে কার্টার। তার পাশে উপুড় হয়ে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তার স্ত্রী। মাঝে মাঝে ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে কপাল মুছিয়ে দিচ্ছে। 'চোখ মেলো, ফিল! ভেবো না, আমি তো আছি! আমি তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।'

দরজা খুলতে শুনল না মিসেস কার্টার। ছেলেদের ঢুকতে দেখল না। কিশোর যখন আলতো করে তার বাহুতে হাত রাখল, চমকে গেল ভীষণ ভাবে।

'মিসেস কার্টার,' কোমল কণ্ঠে বলল কিশোর, 'আমি গিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসছি। আপনি একটু সরুন দেখি, বিছানায় তুলে দিচ্ছি আপনার স্বামীকে। অসুখটা বাড়ল নাকি?'

'হ্যাঁ,' কিশোরকে চিনতে পেরেছে মিসেস কার্টার। 'প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছে তো–হঠাৎ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে আমাদেরকে। কোথায় যাব বলো? এ রকম একজন অসুস্থ মানুষকে নিয়ে?'

'ব্যবস্থা একটা হবেই,' কিশোর বলল, 'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আগে আপনার স্বামীকে বিছানায় তুলি। তারপর ডাক্তার ডাকব। দরকার হয় অ্যামবুলেন্স নিয়ে আসব। হাসপাতালে নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে।'

ববকে নিয়ে ধরাধরি করে কার্টারকে বিছানায় তুলে দিল কিশোর। বিড়বিড় করে কি যেন বলে চোখের পাতা অর্ধেক মেলল কার্টার। তারপর শুরু হলো কাশি। ভয়ানক কাশি। মুখ মুছিয়ে দিতে লাগল তার স্ত্রী। বুকে হাত রেখে আরাম দেয়ার চেষ্টা করল।

পানিতে ভরে এল ববের চোখ। কি করবে বুঝতে না পেরে কিশোরের দিকে তাকাল।

'ভয় নেই,' ববকে বলল কিশোর, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি এখানে বসে মিসেস কার্টারকে সাহায্য করো। আমি ডাক্তারকে ফোন করছি। আপনার স্বামীকে কে চিকিৎসা করেন, মিসেস কার্টার?'

ডাক্তারের নাম বলল মিসেস কার্টার, ডক্টর অ্যাডনার। মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ভালই হলো। ইনি আমাদেরও ডাক্তার। আমি আসছি।'

দৌড়ে বেরিয়ে এল কিশোর। রাস্তায় বেরিয়ে প্রথম যে ফোন-বুদটা পেল সেটা থেকেই ফোন করল ডাক্তারকে। রোগীর অবস্থার কথা শুনে অবাকই হলেন তিনি।

'তাই নাকি? এত খারাপ!' ডাক্তার বললেন। 'শক্-টক্ পায়নি তো?' কিশোরের কাছে যখন জানলেন, শক্ই পেয়েছেন, তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, হাসপাতালে বলে দিচ্ছি আমি, অ্যামবুলেন্স পাঠাক। আগেই বলেছিলাম মিসেস কার্টারকে, হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে। শুনল না। এখন তো আসতেই হলো। যাকগে, বেডের ব্যবস্থাও করে রাখছি। মহিলাকে চিন্তা করতে মানা কোরো।'

দৌড়ে ফিরে এসে আবার ঘরে ঢুকল কিশোর। বিছানায় তুলে সেবা-যত্ন করায় সামান্য ভাল মনে হচ্ছে আবার কার্টারকে। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছে, 'কিন্তু

কোথায় যাব আমরা? আমার সঙ্গে থেকে সারাটা জীবন শুধু কষ্টই করে গেলে তুমি, ক্লারা। আমি তোমার জন্যে ঝামেলারই কারণ হলাম শুধু...'

'থাক থাক, ওসব বলার দরকার নেই আর এখন,' বাধা দিল মিসেস কার্টার। 'তোমার এ সমস্যার জন্যে তো আমিই দায়ী। ওই অসুখটা যদি না হত আমার, টাকার দরকার না পড়ত, তুমি কি আর চুরি করে তথ্য বেচতে যেতে ওদের কাছে। জেলেও যেতে হত না তোমাকে, আজকের এই মরণ-ব্যাধিতেও ধরত না।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'তোমার মত ভাল ছেলে সত্যি আমি দেখিনি, কিশোর। আমার স্বামীকে তুমি ভুল বুঝো না। সত্যি সত্যি ও খারাপ নয়। ডাক্তারের খরচ দেয়ার জন্যে কিছু জরুরী তথ্য শত্রুদের কাছে বিক্রি করেছিল। আমাকে ভালবাসে বলে, আমাকে বাঁচানোর জন্যে এতবড় অপরাধ করে বসেছিল সে, আমি জানতামও না...'

'কোন কিছু নিয়েই ভাবার দরকার নেই এখন,' সান্ত্বনা দিল কিশোর। 'হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে এলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অ্যামবুলেন্স এসে যাবে।'

কিন্তু কথার নেশায় পেয়ে গেছে যেন মিসেস কার্টারকে, 'জেল থেকে বেরোনোর পর নাম পাল্টে ফেলল ফিল,' কাঁদতে শুরু করেছে আবার। 'না ফেলে উপায় ছিল না। একবার যদি কোন অপরাধ করে বসো তুমি, কোনদিন লোকে তোমাকে ক্ষমা করবে না, যতই জেল খেটে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে আসো না কেন তুমি। সে-জন্যেই লোকের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে চেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু পারিনি। আমাদের অবস্থা দেখে মিসেস গর্ডনের দয়া হলো। কেয়ারটেকার বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন এখানে।'

'মিসেস গর্ডন কি এ বাড়ির মালিক ছিলেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'বাড়িটার নাম যখন আইভি ছিল?'

'এখনও মালিক। মিসেস গর্ডন মারা যাননি, তবে অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন,' মিসেস কার্টার বলল। 'আমার চেয়ে অনেক বেশি বয়েস। হিরাম গর্ডনের নাম শুনেছ নিশ্চয়? মিসেস গর্ডনের ছেলে। বহু টাকার হীরা চুরি করে পালিয়েছিল। কিন্তু ধরা পড়ে যায় পুলিশের হাতে। তার আগেই হীরাগুলো লুকিয়ে ফেলেছিল। অনেক চেষ্টা করেও বের করতে পারেনি পুলিশ। জেলে গিয়ে মারা যায় হিরাম। তার বাবা মিস্টার গর্ডন ছেলের শোকে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যান। পত্রিকায় ছাপা হয় এ বাড়ির ছবি–তখন এটার নাম ছিল আইভি, লোকে এসে বিরক্ত করতে থাকে মিসেস গর্ডনকে। টিকতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে চলে যান তিনি...'

'তারপর থেকেই নাম বদলে এটার নাম গ্রীন হাউস রাখা হয়,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ,' মিসেস কার্টার বলল। 'কিন্তু বিক্রি আর হলো না। বদনাম হয়ে গেছে বলেই হয়তো। গর্ডনরা এত ভাল মানুষ, অথচ অসৎ সঙ্গে পড়ে তাঁদের ছেলেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হিরামের দুই দুষ্ট বন্ধু হীরা চুরির পর উধাও হয়ে

যায়। একজনকে ধরে ফেলে পুলিশ, হিরামের সঙ্গে জেলে যায় সে; আরেকজনকে কোনমতেই খুঁজে বের করতে পারেনি–শোনা যায়, সে বার্মায় পালিয়ে গিয়েছিল। জেলখানা একটা ভয়ানক জায়গা, কিশোর। দেখছ না, আমার স্বামীর কি দশা হয়েছে!'

'ওই যে, সাইরেন,' বলে উঠল কিশোর। 'অ্যামবুলেন্স আসছে।' ববের দিকে তাকাল সে। 'যাও তো, দেখো। এখানে নিয়ে এসো ওদের।'

চোখ মেলল বুড়ো কার্টার। 'ক্লারা,' খসখসে কণ্ঠস্বর, 'তুমি কোথায় যাবে? কি হবে তোমার?'

'আমাকে নিয়ে ভেবো না তুমি, ফিল,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল মিসেস কার্টার। 'তুমি যাও। হাসপাতালে দেখা করব।'

দরজায় দেখা দিল বব। 'দুজন লোক স্ট্রেচার নিয়ে এসেছে। সঙ্গে একজন নার্স।'

ফোলা গালওয়ালা একজন নার্স ঘরে ঢুকল। এক নজর তাকিয়েই কার্টারকে দেখিয়ে বলল, 'রোগী, না?' মিসেস কার্টারকে বলল, 'কোন চিন্তা করবেন না আপনি। যা করার আমরাই করব।' একজন স্ট্রেচার বাহকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডেন, ওঠাও একে।'

পেশাদার লোক ওরা। কার্টারকে বের করে নিয়ে গিয়ে অ্যামবুলেন্সে তুলতে দুই মিনিটও লাগল না। স্ত্রীকে 'গুড-বাই' জানানোরও সুযোগ পেল না কার্টার, কারণ আবার কাশা শুরু করেছে সে। কিন্তু গাড়িতে তোলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তার হাতটা ধরে রাখল তার স্ত্রী। দরজা বন্ধ হলো। গেটের দিকে রওনা হয়ে গেল মস্ত গাড়িটা।

'আজ রাতে তো কোথাও যেতে পারব না আমি,' ঘোরের মধ্যে বলল যেন মিসেস কার্টার। 'যাবই বা কোথায়? কোন জায়গা তো নেই!'

'আজ রাতে এখানেই থাকুন,' কিশোর বলল। 'কাল একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমার চাচীকে বললেই কিছু একটা করে ফেলবে। কিন্তু সমস্যা হলো আজকের রাতটা নিয়েই। একা তো এ বাড়িতে থাকতে পারবেন না।'

'একা থাকবেন কেন?' বলে উঠল বব। 'আমি থাকব ওনার সঙ্গে।'

'তুমি থাকবে?' ববের দিকে তাকাল কিশোর। 'খুব ভাল কথা। আর কোন সমস্যা রইল না তাহলে। কিন্তু ঘুমাবে কোথায়?'

মিসেস কার্টার বলল, 'পাশের রুমে একটা সোফা আছে। তাতে শুয়ে যদি ঘুমাতে পারে, তাহলে আর চিন্তা নেই।' ববকে বলল, 'খাওয়ার জন্যেও ভেবো না। ভাল খাবার রান্না করে খাওয়াব আমি তোমাকে।'

'বেশ, আমি তাহলে এখন বাড়ি যাচ্ছি,' কিশোর বলল। 'কাল সকালেই আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।'

'তোমার চাচীকে বোলো, বিনে পয়সায় তাঁর খাবার ধ্বংস করব না আমি। ঘরবাড়ি পরিপাটি রাখতে পারি আমি, সেলাই জানি, রান্না করতে পারি।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, ও নিয়ে আপনি ভাববেন না,' কিশোর বলল। 'আমি যাচ্ছি।…বব, সাবধানে থেকো। রাতে নাকি আবার চোর আসে। দরজা-

জানালাগুলো ভালমত আটকে দিও।'

'দেব। তুমি যাও,' বব বলল। 'কোন অসুবিধে হবে না আমাদের।'

এগারো

পরদিন সকালে উঠেই ট্যাক্সি ভাড়া করে নিয়ে মিসেস কার্টারকে আনতে ছুটল কিশোর। রাতেই কথা বলে রেখেছে চাচীর সঙ্গে। ফগের কথা উঠতেই ফুঁসে উঠেছেন চাচী, 'ওই পুলিশটাকে ভয় পাই নাকি আমি! যা, তুঁই গিয়ে নিয়ে আয় মহিলাকে।'

চাচীর ভরসা পেয়েছে। কোন কিছুকে আর কেয়ার করে না কিশোর। খুশি মনে গ্রীন হাউসে চলল সে। সঙ্গে টিটু।

ট্যাক্সিওয়ালাকে ড্রাইভওয়েতে রেখে রান্নাঘরের দরজায় এসে টোকা দিল। ববকে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে জানালা খুলে মুখ বের করতে দেখে অবাক হলো কিশোর। 'কি ব্যাপার! দরজা খুলছ না কেন?'

তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দিল বব। 'যাক, তুমি এলে। বাঁচলাম!'

'কেন, কিছু হয়েছে নাকি?'

'কাল রাতেও চোর এসেছিল। বড় জ্বালাতন করেছে। এদিকের জানালা-দরজা খুলতে না পেরে গিয়ে ব্যালকনির দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করেছে। পারেনি। সব আটকে দিয়েছিলাম। শেষে যখন বুঝলাম, ছিটকানি ভাঙার চেষ্টা করছে, বড় কুকুরের ডাক নকল করে ঘেউ-ঘেউ শুরু করলাম।' কিভাবে ডেকেছে দেখিয়ে দিল বব। এতটাই বাস্তব মনে হলো, অবাক হয়ে কান খাড়া করে ফেলল টিটু। নিজেও ডাকা শুরু করে দিল।

'ছেলেটা সত্যি সাংঘাতিক,' ববের প্রশংসা করল মিসেস কার্টার। 'তোমরা সময় মত না এলে আমার কি যে দুর্গতি হত!...ফিল কেমন আছে, জানো?'

'ভাল। আসার আগেই ফোন করেছিলাম,' জানাল কিশোর। 'আর দেরি করে লাভ নেই। আমি ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি। আপনি ববের সঙ্গে আমাদের বাড়ি চলে যান। ওখান থেকে আপনার স্বামীকে দেখতে যেতে পারবেন। জিনিসপত্র কি কি গোছগাছ করতে হবে, দেখিয়ে দিন, করে দিই।'

'জিনিসপত্র আর কি!' জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলল মিসেস কার্টার। 'একটা থলেতেই জায়গা হয়ে যায়। গুছিয়ে রেখেছি। আসবাবপত্র যা দু'চারটা আছে, সেগুলো আর এখন নেব না। থাক। ফিল ভাল হলে পরে এসে নিয়ে যাওয়া যাবে।'

'ঠিক আছে।' ববের দিকে তাকাল কিশোর, 'তুমি ওনার সঙ্গে যাও।'

'তুমি?'

'আমার কাজ আছে। দরজায় তালা লাগাব। চাবিটা নিয়ে গিয়ে রেখে

আসব হাউস এজেন্টের অফিসে। বলে আসব, বাড়িটা আপাতত খালি।'

মিসেস কার্টার আর ববকে নিয়ে চলে গেল ট্যাক্সি। ওদের রওনা করিয়ে দিয়ে চাবি হাতে রান্নাঘরের কাছে ফিরে এল আবার কিশোর। চাবিটা রেখে দিয়েছে মিসেস কার্টারের কাছ থেকে। পেছন পেছন এল টিটু।

দরজায় তালা লাগানোর আগে আরেকবার ঘরের বাকি দরজা-জানালাগুলো দেখে নিল কিশোর, বন্ধ আছে কিনা। তারপর বাইরে বেরোনোর দরজাটায় তালা লাগিয়ে চাবিটা ফেলল পকেটে। টিটুকে নিয়ে হেঁটে চলল হাউস এজেন্টের অফিসে। বেশি দূরে না অফিসটা।

ভাবতে ভাবতে চলেছে কিশোর। এই চোর আসার ব্যাপারটা বড় সন্দেহজনক। কি খুঁজতে আসে ওরা? এতটাই বেপরোয়া যে ঘরে মানুষ আছে জেনেও ছিটকানি ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করে!

হাউস এজেন্টের অফিসে ঢুকে ডেস্কের সামনে বসে থাকতে দেখল একজন বুড়ো ক্লার্ককে। চোখে ভারী পাওয়ারের চশমা। চাবিটা টেবিলে রেখে দিয়ে কিশোর বলল, 'এটা গ্রীন হাউসের পেছনের দরজার চাবি। আপনার কাছে থাক। গ্রীন হাউসের কেয়ারটেকার কার্টারকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার স্ত্রীও খানিক আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। মিসেস গর্ডন যদি তাদের খোঁজ জানতে চান, জানাবেন এ কথা।' চলে আসতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল কিশোর, 'ও, আরেকটা কথা। মাঝে মাঝেই চোর আসে ও বাড়িতে। কাল রাতেও ঢোকার চেষ্টা করেছিল। আপনাকে জানিয়ে রাখা উচিত ভাবলাম, তাই বললাম। কার্টারদের আসবাবপত্রগুলো এখনও রয়ে গেছে বাড়িতে।'

'চোর!' কিশোরের দিকে তাকাল ক্লার্ক। ভারী লেন্সের ভেতর দিয়ে তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড় আর গোল গোল দেখাল। 'তাহলে তো চিন্তার কথা। এতকাল পর আজ সকালেই যখন ওই বাড়ি কেনার লোক এল, তখনই চোরের উপদ্রব–শুনলে হয়তো আর কিনতেই চাইবে না ওরা।'

বাড়ি কেনার লোক! কাকতালীয় মনে হলো কিশোরের। 'কারা এসেছিল?'

'দুজন লোক। বলল, বাচ্চাদের স্কুল বানাবে।'

সতর্ক হয়ে গেল কিশোর। 'বাড়িতে ঢোকার চাবি দিয়েছেন নাকি ওদের?'

'ক্রেতা যখন, দিতেই তো হয়। বাড়ির ভেতরটা ঘুরে ফিরে দেখতে চাইল।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'নাম কি ওদের?'

'নামটা জিজ্ঞেস করা হয়নি,' ক্লার্ক বলল। 'তবে চাবি দিতে ফিরে এলে জিজ্ঞেস করব, ভেবেই রেখেছি।'

ক্লার্ককে ধন্যবাদ দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। টিটুকে নিয়ে হাঁটতে লাগল বাড়ির দিকে। চিন্তিত। বাড়ি যাবার শর্টকাট পথ আছে। কিন্তু ঘুরপথই ধরল সে, গ্রীন হাউসের সামনে দিয়ে। মনে মনে আশা, যে দুজন লোক বাড়ি কিনতে চেয়েছে, তাদের দেখতে পাবে।

কিন্তু গ্রীন হাউসের গেটে এসে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও ওদের দেখা পেল

না। বুঝল, হয় ওরা দেখে চলে গেছে, নয়তো এ সময়ে আসবে না। রাতে যারা ঢোকার চেষ্টা করেছিল, তারা হয়ে থাকলে হয়তো রাতেই আসবে আবার।

বারো

'অনেক কিছুই জানা হয়ে গেছে এখন আমাদের,' কিশোর বলল। 'একটা ব্যাপারেই কেবল শিওর হতে পারছি না, ওই লোকগুলো রাতের বেলা কিসের জন্যে গ্রীন হাউসে-যায়?'

ছাউনিতে মীটিং বসেছে গোয়েন্দাদের। কেসটা নিয়ে আলোচনা করছে।

'যায় হয়তো হীরাগুলোর জন্যে,' জবাব দিল রবিন। 'ওগুলো খুঁজে পায়নি পুলিশ। হিরাম গর্ডন হয়তো ওই বাড়ির কোনখানে লুকিয়ে রেখেছিল হীরাগুলো। জেল থেকে ফিরে এসে বের করে নিয়ে বাকি জীবন পায়ের ওপর পা তুলে কাটানোর স্বপ্ন দেখেছিল।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' বলে উঠল মুসা। 'আর আজ সকালে যে দুজন লোক হাউস এজেন্টের অফিসে বাড়ি কিনতে গিয়েছিল, তাদের একজন ছিল হীরা-ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত—হিরাম ছাড়া বাকি দুজনের যে একজন ধরা পড়েনি, সেই লোকটা...'

'যে বার্মায় পালিয়েছিল!' মুসার কথাটা শেষ করে দিল রবিন।

'আর যে লোকটা হিরামের সঙ্গে জেল খেটেছে, তাকে নিশ্চয় হীরাগুলো কোথায় আছে মরার আগে বলে গিয়েছিল হিরাম,' মুসা বলল। 'লোকটা বেরিয়ে আসার পর কোনভাবে যোগাযোগ হয়েছে তার বার্মায় পালানো দোস্তের সঙ্গে। দুজনে মিলে যুক্তি করে এখন হীরাগুলো বের করে নেয়ার চেষ্টা করছে।'

'একদম ঠিক,' তুড়ি বাজাল কিশোর। 'আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি। কার্টাররা থাকলে ওদের খুঁজতে অসুবিধে হয়, তাই ওরাই ফগের কাছে নোট পাঠিয়ে তাকে জানানোর চেষ্টা করেছে কার্টারের অতীত। ওরা বুঝতে পেরেছে, কার্টারের জেল খাটার কথা জানতে পারলে কোন দিকে আর না তাকিয়ে ওদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে চাইবে ফগ, ওদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। সেই সুযোগে গিয়ে হীরাগুলো খুঁজে বের করে নিয়ে আসবে দুই চোর। তবে একটা ভুল ওরা করেছে—গ্রীন হাউসের পুরানো নামটা ব্যবহার করে; নিশ্চয় বহুকাল পর গ্রীন হিলসে ফিরেছে, নোট লেখার সময় ওরা জানতই না আইভির নাম পাল্টে ফেলা হয়েছে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'খাপে খাপে বসে যাচ্ছে সব। আইভির কথা বলেই জটিল করে ফেলেছে ওরা। খুঁজে বের করা কঠিন হয়েছে। গ্রীন হাউস বললে কবেই ছুটে যেতাম আমরা...'

'ফগও ছুটে যেত,' কিশোর বলল।

'তা তো বুঝলাম,' ফারিহা বলল। 'কিন্তু কিশোর, ওই লুকানো

হীরাগুলোর ব্যাপারে কি করা যায়? ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে জানিয়ে দেয়া দরকার, তাই না?'

'তিনি নেই, লস অ্যাঞ্জেলেসে গেছেন,' জানাল কিশোর। 'কার্টারদের কথাটা বলার জন্যে তাঁর অফিসে ফোন করেছিলাম। পুলিশ বলতে তো এখানে ফগ, তাকে জানিয়ে কোন লাভই নেই। চোরের কথা শুনে ও তো কার্টারদেরই বের করে দিতে চেয়েছিল।'

'তাহলে তো ক্যাপ্টেনের না আসা পর্যন্ত বসেই থাকতে হয়,' নিরাশ ভঙ্গিতে বলল ফারিহা।

'উঁহু!' মাথা নাড়ল বব। 'পাগল হয়ে গেছে চোরগুলো। কাল রাতে আমরা থাকা সত্ত্বেও যে অবস্থা শুরু করেছিল। আজ পাবে বাড়ি খালি। কোন জায়গা খোঁজা বাকি রাখবে না আর।'

'সারা বাড়ি খোঁজার কোন প্রয়োজন নেই,' কিশোর বলল, 'ওরা জানে সেটা। জিনিসগুলো লুকানো আছে রান্নাঘরের মধ্যে কিংবা তার আশেপাশে কোথাও। নইলে রান্নাঘরের দরজা-জানালার ছিটকিনি খুলে ঢোকার চেষ্টা করবে কেন?'

'হীরাগুলোর কথা নিশ্চয় জানে না কার্টাররা,' মুসা বলল। 'কিন্তু এত বছর ধরে বাড়িটাতে আছে, হীরা লুকানোর মত গোপন কোন জায়গা আছে কিনা সেটা হয়তো জানতে পারে। কোন গুপ্ত-কুঠুরি, বা দেয়াল-আলমারি, বা ওরকম কিছু।'

'তা মন্দ বলোনি,' কিশোর বলল। 'মিসেস কার্টারকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। তবে যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের। দেরি করলে চোরেরা এসে বের করে নিয়ে যাবে।'

'কখন যেতে চাও?' রবিনের কণ্ঠে উত্তেজনা। 'আজ বিকেলে?'

'অসুবিধে কি?' কিশোর বলল। 'হাউস এজেন্টের অফিস থেকে কার্টারদের কথা বলে পেছনের দরজার চাবি নিয়ে নিতে পারি আবার।' ঘড়ি দেখল সে। 'লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। ওঠা যাক এখন। ঠিক তিনটেয় সাইকেল নিয়ে এখানে হাজির থাকবে সবাই।'

হীরা খোঁজার উত্তেজনায় সময়মতই হাজির হয়ে গেল রবিন, মুসা আর ফারিহা। দেরি করল না কেউই। কিশোর আর বব খেয়েদেয়ে রেডিই হয়ে আছে। টিটুকে নিলে চিৎকার-চেঁচামেচি করে জানান দিতে পারে, এই ভয়ে তাকে নিতে চাইল না কিশোর। বেডরুমে আটকে রেখে এসেছে।

সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। প্রথমে হাউস এজেন্টের অফিস থেকে চাবিটা নিয়ে নিল কিশোর। তারপর গ্রীন হাউসের কাছে পৌঁছে ববকে আগে পাঠাল, কেউ আছে কিনা দেখে আসার জন্যে। ফিরে এসে বব জানাল, কেউ নেই। বাড়ির সামনে কোন গাড়ি, সাইকেল বা মোটর সাইকেল কিছু নেই।

'চলো তাহলে,' কিশোর বলল। 'বাড়ির পেছনের ঘন ঝোপে সাইকেলগুলো লুকিয়ে রাখব, যাতে কারও চোখে না পড়ে। কেউ যদি চলে

আসে সাবধান করে দেয়ার জন্যে বাইরে থেকে পালা করে পাহারা দিতে হবে। মুসা, প্রথম তোমার পালা।'

'ঠিক আছে,' সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল মুসা, যদিও সবার সঙ্গে বাড়ির ভেতরে হীরা খুঁজতে যাবার ইচ্ছেটাই তার বেশি ছিল। 'আমাকে সুর করে শিস দিতে শুনলে বুঝবে, কেউ এসেছে।'

ঘন ঝোপের মধ্যে সাইকেলগুলো লুকিয়ে রেখে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল বাকি সবাই। তালা খুলে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। 'রান্নাঘরের সীমার মধ্যে থাকলেই চলবে আমাদের। স্মিথ যে বেডরুমটাতে থাকত সেটা, আর পাশের ছোট বেডরুমটায় দেখা যেতে পারে বড়জোর।'

'এ রকম একটা সাধারণ ঘরে কোথায় হীরাগুলো লুকিয়ে রাখল বলো তো?' অবাক হয়ে ঘরের চারদিকে তাকাচ্ছে ফারিহা। 'ড্রয়ারের পেছনে, আলমারির ওপরে–এ সব জায়গায় থাকলে সহজেই চোখে পড়ে যেত কার্টারদের।'

'তারমানে জায়গাটা খুব ভাল বেছেছে,' কিশোর বলল। 'আলমারির পেছনে দেয়ালের গায়ে গর্ত করে রেখে আবার প্ল্যাস্টার লাগিয়ে দিতে পারে।'

খুঁজতে শুরু করল সবাই মিলে। মাদুরের নিচে, কার্পেটের তলায়, আসবাবপত্রের নিচে–সম্ভাব্য কোন জায়গাতেই খোঁজা বাদ দিল না। চারপাশের দেয়ালে ঠুকে ঠুকে দেখতে লাগল ফাঁপা জায়গা আছে কিনা। রান্নাঘরের এককোণে সিংক, বাসন-পেয়ালা মাজার জায়গা, পানির কল, পাইপ এ সব আছে। স্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় কয়েক দিন ধরে পরিষ্কার করার সুযোগ পায়নি মিসেস কার্টার। ভয়ানক পিচ্ছিল আর নোংরা। সেদিকে আর গেল না কেউ।

ঘণ্টাখানেক ধরে খোঁজাখুঁজি চালাল ওরা। কিছুই পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে চলল।

রাস্তায় দেখা হয়ে গেল ফগের সঙ্গে। ববকে দেখে রেগে আগুন ফগ। ধমক দিয়ে বলল, 'ও, তুই এখনও গ্রীন হিলসেই আছিস! বাড়ি যাসনি!'

জবাব দিল কিশোর, 'না, যায়নি। আমি ওকে আমাদের বাড়িতে থাকতে বলেছি। কেন, আপনার কোন অসুবিধে আছে থাকলে? আরেকটা কথা, কার্টাররা এখন কোথায় আছে জানার কৌতূহল হচ্ছে না আপনার? আপনার অফিসে তো দেখা করেনি।'

'কোথায় আবার যাবে, পালিয়েছে,' ফগ বলল। 'এমন ভাবে ধমকে দিয়েছি, থাকার সাহস কি আর হয়। চোরের মন সব সময়ই দুর্বল থাকে। আমার অফিসে যায়নি, তুমি জানলে কি করে?'

'কার্টার এখন হাসপাতালে,' হাসিমুখে জবাব দিল কিশোর। 'তার স্ত্রী আমাদের বাড়িতে। তাদের ওপর আপনার নিষ্ঠুরতার কথা শুনে আমার চাচী তো রেগে ভোম হয়ে আছে। ক্যাপ্টেন অফিসে এলেই তাঁর কাছে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।'

খবরটা শুনে চমকে গেছে ফগ। খানিকক্ষণ কোন কথা বেরোল না মুখ

দিয়ে। তারপর বলল, 'ঝামেলা!…তা তোমরা এখন এলে কোত্থেকে? গ্রীন হাউসে যাওনি তো? খবরদার, ও বাড়িতে আর ঢুকবে না। ওটা বিক্রি হয়ে গেছে। দুজন ভদ্রলোক কিনেছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। খুব ভাল মানুষ। তাঁদের অনুমতি ছাড়া ও বাড়িতে ঢোকা এখন বেআইনী।'

'খবরটার জন্যে ধন্যবাদ, মিস্টার ফগর্‍্যাম্পারকট।'

কিশোরের বলার ভঙ্গিতে পিত্তি জ্বলে গেল ফগের। কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে সব আক্রোশ গিয়ে পড়ল ববের ওপর। তার সাইকেলের হ্যান্ডেল চেপে ধরল। 'এই, তুই আয় আমার সঙ্গে!'

'না, আমি যাব না!' বলে হ্যাঁচকা টানে হ্যান্ডেলটা ছাড়িয়ে নিয়েই লাফ দিয়ে সাইকেলে চেপে বসল বব। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে।

হাবা হয়ে সেদিকে কয়েকটা সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে ফগ বলল, 'বিচ্ছুগুলোর সঙ্গে থেকে থেকে এত ভাল ছেলেটাও খারাপ হয়ে গেল! আগে আমাকে দেখলেই যে প্যান্ট খারাপ করে ফেলত, সে এখন মুখে মুখে তর্ক করে! কথা না শোনার সাহস দেখায়!…ধরতে পারলেই হয় খালি একবার…'

কারও দিকে আর না তাকিয়ে সাইকেলে চেপে চলে গেল ফগ।

তেরো

কোল-সেলারটার কথা রাতে মিসেস কার্টারের কাছে জানতে পারল কিশোর। মাটির নিচের কয়লা রাখার ঘরটায় ঢুকতে সাহস পায়নি কখনও তারা। নড়বড়ে সিঁড়ি ধসে পড়ে হাত-পা ভাঙার ভয়ে।

তখনই ঠিক করে ফেলল কিশোর, ওখানে খুঁজে দেখতে হবে। খাওয়ার পর গিয়ে ছদ্মবেশ নিতে বসল সে। রাস্তাঘাটে ফগের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে যাতে চিনতে না পারে। চিনলেই সন্দেহ করবে। পিছু নেবে।

বব বলল, সে-ও যাবে সঙ্গে। রাজি হলো না কিশোর। ওই ফগের ভয়েতেই। বলল, 'তোমার চাচার চোখে তুমি পড়ে গেলেই ঝামেলা বাধাবে তোমার চাচা। যে কাজে চলেছি, সেটার সমস্যা হবে। তারচেয়ে বাড়িতেই বসে থাকো। ফিরে আসতে আমার বেশি সময় লাগবে না।'

রাত দশটায় টিটুকে ছাউনিতে আটকে রেখে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল কিশোর। বেডরূমে রাখার সাহস পেল না। তাকে বেশিক্ষণ না দেখলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে টিটু। চাচী দেখতে এলে জেনে যাবে কিশোর ঘরে নেই।

বাড়িতে বসে থেকে কোনমতেই স্বস্তি পাবে না, বুঝতে পারছিল বব। বার বার চোরগুলোর কথা মাথায় আসছিল তার। হীরার খোঁজে এসে থাকলে ওরা মরিয়া। সঙ্গে ছুরি-পিস্তল থাকতে পারে। কিশোরকে দেখলে কি করে বসবে

কে জানে!

সুতরাং মনে মনে একটা পরিকল্পনা করে রেখেছিল বব। কিশোর বেরোতেই বেরিয়ে পড়ল সে-ও। নিঃশব্দে কিশোরের পিছু নিল। সতর্ক রইল, যাতে চাচা বা কিশোর, কারও চোখেই না পড়ে।

বুড়ো মানুষের ছদ্মবেশে টর্চ হাতে এগিয়ে চলেছে কিশোর। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। একটু আগে তুষারপাত শুরু হয়েছে। টর্চের আলো চমকাচ্ছে রাস্তায় পড়ে থাকা তুষারের ওপর। কল্পনাও করেনি, বব পিছু নিয়েছে তার।

ববের কাছেও টর্চ আছে। কিন্তু জ্বালার প্রয়োজন বোধ করছে না। কনকনে বাতাস এসে বাড়ি মারছে গায়ে। ওভারকোটের দু'একটা বোতাম খোলা ছিল, সেগুলো লাগিয়ে দিল বব। আশা করল, এই দুর্যোগের মধ্যে আর ঘর ছেড়ে বেরোবে না তার চাচা। আরাম করে কম্বলের নিচে শুয়ে থাকাটাকেই প্রাধান্য দেবে সে।

গ্রীন হাউসের কাছে পৌঁছে গেল কিশোর। সামনের গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল। বাগানের মাঝখান দিয়ে যাওয়া ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে, বাড়ির পাশ ঘুরে এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের দরজার সামনে। ফিরে তাকিয়ে একবার দেখে নিল কেউ লক্ষ করছে কিনা। চাবিটা সঙ্গেই আছে। ক্লার্ককে আর ফেরত দেয়নি। তালা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। বব তখন একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। কিশোর ভাবছে, লোকগুলো এলে তার মতই টর্চ নিয়ে আসবে। রান্নাঘরে টেবিলের ওপর রাখা একটা কেরোসিনের লণ্ঠন আছে। জ্বালবে কিনা ভেবে, ভাবনাটা নাকচ করে দিল কিশোর। টর্চেই সুবিধে। চট করে নিভিয়ে ফেলা যায়।

কোল-সেলারটা কোনখানে, মিসেস কার্টারের কাছ থেকে জেনে এসেছে সে। বাসন-পেয়ালা মাজার জায়গাটার পাশ কাটিয়ে এল। সামনে একটা দরজা, হলওয়েতে যাওয়ার। দরজা খুলে অন্য পাশে চলে এল সে। লোকগুলোর কাছে চাবি আছে। যে কোন দিক দিয়ে ঢুকতে পারবে। অন্ধকারে কান পেতে রইল শব্দ শোনার জন্যে। কিছুই শোনা গেল না।

জুতো খুলে ফেলল। খালি পায়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। তাতে পায়ের শব্দ হলো না সামান্যতম। কোথাও কোন আলো নেই। যেমন অন্ধকার, তেমনি নীরবতা। সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা নেমে এসে নিশ্চিত হয়ে নিল, কেউ আছে কিনা। নেই। উঠে এসে জুতো পরল আবার। ফিরে এল রান্নাঘরে। রান্নাঘর পেরিয়ে এসে দাঁড়াল ছোট্ট একটা চত্বরে। এখানেই রয়েছে সেলারে নামার মুখ।

ঝোপের আড়ালে বসে তাকিয়ে আছে বব। টর্চ হাতে কিশোরকে একটা ছায়ার মত লাগছে।

বাড়িটা যেমন বড়, গ্রীন হাউসের কয়লা রাখার ঘরটাও তেমনি বিশাল। অনেক বড়, ভারী একটা লোহার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে নিচে নামার গোল মুখটা। সেটা সরিয়ে উঁকি দিল কিশোর। প্রায় খাড়া কাঠের সিঁড়ি নেমে

গেছে নিচে। নড়বড়ে। পা রাখতেই দুলে উঠল। ক্যাঁচকোঁচ, মড়মড়, নানা রকম শব্দ করে ধসে পড়ার হুমকি দিতে লাগল।

নিচে নামার অকারণ ঝুঁকি না নিয়ে ওপর থেকেই টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল কিশোর। পাথরের মেঝে, পাথরের দেয়াল। কয়লাও খুব সামান্যই আছে। এর মধ্যে হীরা লুকালে বহু আগেই খুঁজে বের করে ফেলত চোরেরা। এত ঘোরাঘুরি করা লাগত না।

উঁহু, এখানে থাকবে না! ফিরে এল আবার রান্নাঘরে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল। মনে করার চেষ্টা করল, বিকেল বেলা কোন্ জায়গাটাতে খোঁজা হয়নি।

এই সময় কানে এল খুট করে একটা শব্দ। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে। আবার শোনা গেল শব্দটা। কিসের? কে করছে?

সামনের দরজা খুলে বন্ধ করল নাকি কেউ? হৃৎপিণ্ডের লাফানো বেড়ে গেল ওর। চোরগুলো হলে নিশ্চয় খুঁজতে আসবে রান্নাঘরে। টর্চ নিভিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ মাথার চুলে কিসের যেন ছোঁয়া লাগল। শক্ত হয়ে গেল সে। চুলে মথ বসার মত অনুভূতি। কিন্তু জানুয়ারির এই ঠাণ্ডার মধ্যে তো মথ বেরোনোর কথা না!

আবার লাগল ছোঁয়া, আলতো ভাবে! আস্তে হাত তুলে ছুঁয়ে দেখল জায়গাটা। ভেজা ভেজা লাগল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পানি পড়েছে। পানির ফোঁটা। মাথার ওপর দিয়ে গেছে পাইপ, তার নিচে দাঁড়িয়ে আছে সে। লীক আছে পাইপটাতে।

সামান্য সরে গিয়ে কান পেতে রইল। শোনা গেল না আর কিছু। ভুল শুনল নাকি তখন? আরও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে টর্চ জ্বালল। ওপর দিকে আলো ফেলে দেখল, পাইপের জোড়া দিয়ে পানি বেরোচ্ছে। খুব সামান্য, একটা ফোঁটা জমতেই অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। একা একাই হাসল। স্নায়ু উত্তেজিত থাকলে কত সাধারণ জিনিসই না মানুষকে চমকে দিতে পারে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই হাসিটা মুছে গেল তার। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল জোড়াটার দিকে। আনাড়ি ভাবে লাগানো। তাড়াহুড়ার কাজ। উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করেছে হাত, পাইপের জোড়ার ওপর ফেলা আলোটাও কাঁপছে।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল বেসিনের দিকে। কলটা ছেড়ে দেখল, পানি আসছে না ঠিকমত। পুরোটা খুলে দেয়ার পরও খুব সামান্য বেরোচ্ছে। সিংকটা কেন নোংরা হয়ে আছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না আর। পানি আসে না বলে ব্যবহার করতে পারত না মিসেস কার্টার। বাসন-পেয়ালা মাজার বেদীটার কাছে দ্বিতীয় যে কলটা আছে, সেটা খুলে দিয়ে দেখল, দিব্যি পানি আসে।

মুচকি হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। সরে এল পিচ্ছিল জায়গাটা থেকে। আবার

আলো ফেলল পাইপের জোড়ায়।

চোখের কোণ দিয়ে একটা ছায়ামূর্তি নড়ে উঠতে দেখল সে। কিন্তু কিছু করার আগেই তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল লোকটা। হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিয়ে মুচড়ে দুই হাত পিঠের ওপর নিয়ে এল। ভীষণ শক্তি লোকটার গায়ে। কাবু হয়ে গেল কিশোর।

আরেকটা টর্চ জ্বলে উঠল। আলো এসে পড়ল তার মুখে। ধস্তাধস্তিতে তার পরচুলা সরে গেছে। টান দিয়ে সেটা খুলে নিল লোকটা। আরও দু'চার টানে খুলে নিল রবারের নাক, আলগা দাঁত। অস্ফুট শব্দ করে উঠল লোকটা। সঙ্গীর উদ্দেশ্যে বলল, 'আরে, এ তো সেই মোটকা ছেলেটা! এই, তুমি এখানে কি করছ? জলদি বলো!'

আলো ফেলেছে যে লোকটা, তার একহাতে টর্চ, আরেক হাতে পিস্তল। চোখে আলো পড়ায় অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কিশোর। শুরু করে দিল অভিনয়। চিৎকার করে উঠল, 'আমাকে ছাড়ুন! ছেড়ে দিন! এমনিই ঢুকেছিলাম!'

'এমনি, না?' কানের কাছে কর্কশ কণ্ঠে বলল দ্বিতীয় লোকটা, যে তার হাত মুচড়ে ধরে রেখেছে। 'অন্ধকার পোড়ো বাড়িতে রাত দুপুরে এমনি এমনি এসেছে! এ কথা বিশ্বাস করতে বলো আমাদের? ছাগল পেয়েছ!'

চোদ্দ

কিশোরের চিৎকার শুনতে পেল বব। ঝোপের মধ্যে বসে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার।

'ধরে ফেলেছে ওকে!' ভাবতে গিয়ে হাঁটু কাঁপতে শুরু করল ববের। 'কি করব আমি? ভেতরে ঢুকলে যদি আমাকেও ধরে!'

কিন্তু তাই বলে বসে থাকল না সে। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে পা টিপে টিপে এগোল রান্নাঘরের দিকে। ভেতরে আঁউ করে আর্তনাদ করে উঠল একটা অপরিচিত কণ্ঠ। বব জানে না, তার হাঁটুর নিচে জুতোর গোড়ালি দিয়ে লাথি মেরেছে কিশোর। পরক্ষণে শোনা গেল কিশোরের চিৎকার। তাকে ঘুসি মেরেছে লোকটা।

'ছাড়ো! ছাড়ো আমাকে!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'দৈত্য কোথাকার!'

কিশোরকে সাহায্য করতে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল বব। কিন্তু দুজনে একসঙ্গে ধরা পড়ে লাভটা কি? বেচারা কিশোর! লোকগুলো কি বলে শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইল বব।

'আলমারিতে ভরে রাখো ওকে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল একজন। 'সাহস দেখেছ? পিস্তলকেও ভয় পায় না! ভাল কথায় যেতে না চাইলে দাও মাথায় একখান বাড়ি মেরে।'

'দেখো, মেরে ফেলো না আবার!' সাবধান করল তার সঙ্গী। 'আরেকবার জেলে যেতে চাই না আমি। এবার গেলে সারাজীবন পচতে হবে।'

কিশোরকে আলমারিতে ঢোকানোর ধুড়ুম-ধাড়ুম শব্দ শুনতে পেল বব জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে। ওটার মধ্যে এখনও কার্টারিদের ঝাড়ু, কেটলি, ব্রাশ এ সব রয়ে গেছে।

তারপর নীরবতা। কিশোরের তরফ থেকে সামান্যতম শব্দও নেই আর।

'দরজাটা আটকে দাও,' কিশোরের মাথায় বাড়ি মারতে বলেছিল যে লোকটা, সে বলল। 'অনেকক্ষণ বেহুঁশ থাকবে।...উফ্, একেবারে বিচ্ছু! লাথি মেরে হাঁটুটাই ভেঙে দিয়েছে আমার!...তাড়াতাড়ি করো। হীরাগুলো খুঁজে বের করে আজকেই পালাতে হবে। বোঝা যাচ্ছে, জানাজানি হয়ে গেছে। কাল পুলিশ এসে বাড়ি ঘেরাও করবে, আমি শিওর।'

বুকের খাঁচায় এত জোরে জোরে বাড়ি মারছে ববের হৃৎপিণ্ড, তার মনে হচ্ছে ঘরের ভেতরে লোকগুলোও শুনতে পাবে সে-শব্দ। জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ঘরের মধ্যে আলোর নড়াচড়া। হীরা খুঁজছে লোকগুলো। কিশোরের আর কোন সাড়া নেই। একটা গোঙানিও না। শঙ্কিত হয়ে উঠল বব।

কাউকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসা দরকার। মুসাদের আনতে যেতে পারে, কিন্তু আসতে আসতে যদি হীরা নিয়ে পালিয়ে যায় লোকগুলো? তারচেয়ে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল বব। রাস্তা দিয়ে কোন লোক গেলে তাকে ধরে নিয়ে আসবে সাহায্যের জন্যে।

তুষারপাতের মধ্যে মাথা নিচু করে গেটের দিকে দৌড় দিল সে। তুষার পড়া খানিকক্ষণ বন্ধ ছিল। শুরু হয়েছে আবার। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার পরোয়া না করে অপেক্ষা করতে লাগল সে। কাঁপুনি উঠে গেছে শরীরে। তবে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হলো না তাকে। রাস্তা দিয়ে একজন লোককে আসতে দেখল। তাড়াহুড়ো করে হেঁটে আসছে।

দৌড়ে গিয়ে তার গতিরোধ করল বব। অনুরোধ করে বলল, 'প্লীজ, আমাকে সাহায্য করুন। আমার বন্ধুকে খালি বাড়ির মধ্যে আলমারিতে আটকে রেখেছে দুজন লোক। মারধর করেছে তাকে।'

শুনে ভয় পেয়ে গেল লোকটা। 'তাই নাকি! তাহলে তো পুলিশকে জানাতে হয়।'

'না না!' মরিয়া হয়ে বলল বব। পুলিশ মানেই তো তার চাচা ফগ। 'পুলিশ লাগবে না! আপনি এলেই হবে...'

'আমি এখন যেতে পারব না। একটা ফোন করে দেব থানায়,' বলে তাড়াহুড়া করে চলে গেল লোকটা।

মাথা গরম হয়ে গেল ববের। আর যাকেই হোক, এ মুহূর্তে এখানে তার চাচাকে অন্তত দেখতে চায় না সে। কি করবে ঠিক করতে না পেরে আবার রান্নাঘরের দিকে দৌড় দিল। তার পায়ের শব্দ ঢেকে দিল রাস্তায় পড়ে থাকা তুষার। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিল। কিশোরের কোন সাড়া নেই।

লোকগুলো আছে। ছোট বেডরুমটায় ওদের টর্চের আলো নড়তে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

এই সুযোগে ঘরে ঢুকে আলমারির দরজা খুলে দেয়ার কথা ভাবল সে। উঁহু, লাভ হবে না। নিঃশব্দে একা কাজটা সারতে পারবে না সে। কিশোরের ভারী শরীর টেনে সরিয়ে আনতে পারবে না। এবার ভালয় ভালয় ফিরে গেলে ওকে ওজন কমানোর পরামর্শ দিতে হবে। হালকা থাকা ভাল। হালকা মানুষের সমস্যা কম।

কি করা যায় ভাবছে সে, আচমকা ধড়াস করে এক লাফ মারল তার হৃৎপিণ্ড। তার মনে হলো, সে বেহুঁশ হয়ে যাবে। পায়ের সঙ্গে ঘষা খেল একটা গরম শরীর। হাতের তালুতে লাগল ভেজা জিভ। নিচের দিকে তাকিয়ে তাজ্জব হয়ে গেল বব। 'টিটু, তুই! আরে তুই কি করে এলি এখানে?'

জবাবে লেজ নাড়তে লাগল কেবল টিটু। কি ভাবে এসেছে, ভাল করেই জানে। কিন্তু মুখে ভাষা নেই বলে বলতে পারল না। লাফ দিয়ে একটা বাক্সের ওপর উঠেছিল। দেখে, জানালাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। ছিটকিনি দিতে ভুলে গিয়েছিল কিশোর। ওটা ঠেলে খুলে বাইরে লাফ দিয়ে নামতে কষ্ট হয়নি টিটুর। তারপর কিশোরের গন্ধ শুঁকে শুঁকে সহজেই এসে হাজির হয়েছে এ-বাড়িতে।

এসেছে, ভাল করেছে–ভরসা পেল বব। চিৎকার করল না বুদ্ধিমান কুকুরটা। বিপদের গন্ধ পেয়ে গেছে। ববের দুই হাঁটুতে পা তুলে দিয়ে মৃদু কুঁই কুঁই শব্দ করে যেন জানতে চাইল: ব্যাপার কি? কিশোর কোথায়?

ঘরের ভেতর লোকগুলোর সাড়া পেয়ে কান খাড়া করে ফেলল সে। সোজা দৌড় দিল খোলা দরজার দিকে। গন্ধ পেয়ে গেছে কিশোরেরও। ঘরে ঢুকে আলমারির দরজায় আঁচড়ানো শুরু করল।

শব্দ শুনে বেডরুম থেকে ছুটে এল লোকগুলো। টর্চের আলোয় কুকুরটাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। একটা মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল ওরা। তারপর দৌড়ে গেল একজন টিটুকে লাথি মারতে। নির্দ্বিধায় তার পায়ে কামড়ে দিল টিটু। আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। দ্বিতীয়জন পিস্তল বের করল। এ সব অস্ত্র চেনা আছে টিটুর। লাফিয়ে উঠে তার হাত কামড়ে ধরল। পিস্তল না ফেলা পর্যন্ত ছাড়ল না। তারপর একবার এর গায়ে একবার ওর গায়ে গিয়ে পড়তে লাগল সে। নাচানাচি, হাঁকডাক, কামড়ে দেয়া, সমানে চলতে লাগল। অস্থির করে দিল দুই চোরকে।

টিকতে না পেরে হলে ছুটে পালাল একজন। পিছু নিল তার সঙ্গী। পেছনে পেছনে তাড়া করে গেল টিটু। সিঁড়িতে ওদের ছুটে নামার শব্দ এখান থেকেও শুনতে পেল বব। একটা মুহূর্তও আর দেরি করল না সে। ছুটে এসে আলমারির বাইরের দিকের ছিটকানি নামিয়ে দরজা খুলে দিল। কিশোরকে ডাকল, 'কিশোর, জলদি করো! বেরিয়ে এসো!'

বালতি, কেটলি, ঝাড়ু, ব্রাশের ওপর নেতিয়ে পড়ে আছে কিশোর। কোনমতে মাথা তুলে বলল, 'বব!...কি হয়েছে?'

'কিশোর, সাংঘাতিক চোট লেগেছে তো তোমার মাথায়!' কিশোরের কপালের একপাশ ফুলে গোলআলুর মত হয়ে আছে। রক্ত বেরোচ্ছে না। তবে বেগুনী হয়ে গেছে জায়গাটা।–হাত ধরে টান দিল তাকে বব। 'ওঠো! বেরোও!'

অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল কিশোর। পিস্তলের বাঁটের বাড়ি খেয়ে ঘোলাটে হয়ে গেছে মাথার ভেতরটা। উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এল বব।

'আহ্, আমাকে একটু বসতে দাও,' কিশোর বলল। 'ঠাণ্ডা বাতাসে ভাল লাগবে। মাথার মধ্যে যেন কেমন···কি হয়েছিল আমার? কিছুই মনে করতে পারছি না। বব, এখানে কি করছ তুমি? ওটা কি? টিটুর ডাক না?'

'কিশোর, কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামিও না এখন,' একটা ঝোপের কিনারে কিশোরকে নিয়ে বসে পড়ল বব। 'তোমার মাথায় যারা বাড়ি মেরেছিল, তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছে টিটু। তুমি এখানে চুপ করে বসে থাকো। আমি গিয়ে দেখে আসি কি ঘটছে।'

সাবধানে আবার রান্নাঘরের কাছে ফিরে এল বব। কিন্তু ঘরে ঢোকার আগেই দেখতে পেল, বাড়ির অন্য পাশের কোণ ঘুরে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে একটা লণ্ঠন। তাকিয়ে রইল সে। এত রাতে আবার কে এল?

হঠাৎ গর্জন করে উঠল একটা ভারী কণ্ঠ, 'ঝামেলা! বব, এখানে কি করছিস? কে একটা লোক ফোন করে আমাকে জানাল, একটা ছেলে বিপদে পড়েছে এখানে, সাহায্য দরকার। আমার সঙ্গে রসিকতা করিসনি তো?···তাহলে···'

শোনার জন্যে আর দাঁড়াল না বব। কোন দিকে না তাকিয়ে একদৌড়ে সোজা রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। ফগও এসে ঢুকল তার পেছন পেছন। কোন সন্দেহ রইল না আর তার, এই তুষারপাতের মধ্যে তার সঙ্গে মজা করার জন্যেই এ কাণ্ড করেছে বব।

এ সময় ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো টিটু। ফগের গলা শুনে দেখতে এসেছে। ফগকে দেখে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল তার পায়ের কাছে। প্যান্টের ওপর দিয়ে গোড়ালিতে কামড় বসানোর চেষ্টা করতে লাগল।

'কি ঝামেলা! কুত্তাটাও আছে, তারমানে ওই মোটকা বিচ্ছুটাও···' বিকট গর্জন করে উঠল ফগ। 'এই কুত্তা, ভাগ, ভাগ! সর্, যা! এই বব, সরা না ওকে!–মাথার একটা চুলও আস্ত রাখব না কিন্তু। এই কুত্তা, যাবি?'

কিন্তু টিটু পেয়েছে আজ জন্মের সুযোগ। ডেকে ফেরানোর জন্যে কিংবা শত্রুকে কামড়াতে বাধা দেয়ার জন্যে কিশোর নেই। ফগকে সারা রান্নাঘরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল সে। আর কোন উপায় না দেখে ঝাড়ু-ব্রাশ রাখার যে বিশাল আলমারিটার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল কিশোরকে, সেটার দিকে দৌড় দিল ফগ। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। চোখের কোণ দিয়ে দরজার কাছে নড়াচড়া দেখে ফিরে তাকাল বব। সেই দুটো লোক উঁকি দিচ্ছে। ঘাবড়ে গিয়ে চট করে এককোণে লুকিয়ে পড়ল সে। তাকে দেখতে পেল না ওরা। এগিয়ে

গিয়ে আলমারিতে টর্চের আলো ফেলল একজন। ফগকে দেখল। গায়ের ওপর গিয়ে উঠেছে কুকুরটা।

'ওই দেখো, পুলিশ!' চিৎকার করে উঠল টর্চধারী। এক ঠেলা মেরে লাগিয়ে দিল আলমারির দরজা। একেবারে ছিটকানি তুলে দিয়ে পুলিশ আর কুকুর–দুজনের হাত থেকেই রেহাই পেল। কাঁপা গলায় বলল, 'মাথায় কিছু ঢুকছে না আমার। ওই ছেলেটা গেল কোথায়? আলমারিতে যাকে ভরে রেখেছিলাম? ভুতুড়ে কাণ্ড নাকিরে বাবা!'

'আমার মনে হয় পুলিশটার নিচে চাপা পড়েছে ছেলেটা,' দ্বিতীয় লোকটা বলল। 'আর কুত্তাটাও একটা কুত্তা বটে! পুলিশটাকে পর্যন্ত ছাড়েনি! সাইজে ছোট হলে কি হয়, বাঘের বাচ্চা!'

'ঠিকই বলেছ। কামড়ে কামড়ে আমার পা'টার কিছু রাখেনি আর! জলদি ওষুধ না লাগালে ইনফেকশন হয়ে মরব। পিস্তলটাও যে কোথায় পড়ল! খুঁজে বের করে দেব নাকি গুলি মেরে?'

'থাক, আর গোলাগুলি করে লোক জানানোর দরকার নেই। বরং আলমারির মধ্যে পুলিশটাকে সারারাত পাহারা দিক কুত্তাটা। আমাদের সুবিধে...' টর্চের আলো ঘোরাতে গিয়ে আলো পড়ল ববের ওপর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল দ্বিতীয় লোকটা, 'আরি, ওটা কি!'

বব বুঝল, বাঁচতে হলে চালাকি করা দরকার। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে রাখা সমস্ত কেটলি, হাঁড়ি-পাতিল ঠেলে ফেলে দিতে লাগল মেঝেতে। ঝনঝন শব্দ করতে লাগল ধাতব জিনিসগুলো। বিকট শব্দ চমকে দিল লোক দুটোকে। ওরা কিছু বুঝতে পারার আগেই বিচিত্র ভঙ্গিতে ব্যাঙের মত লাফানো শুরু করল। সেই সঙ্গে গোঙাতে লাগল। ভয়াবহ শব্দ। সিনেমায় ভূতেরা যে রকম করে চেঁচায় তেমন করে চেঁচিয়ে বলল, 'দাঁড়াও! আমি আসছি! আমি আসছি!'

ষোলোকলা পূর্ণ হলো। ভূত ভাবল, না কি ভাবল লোকগুলো, ওরাই জানে। প্রথমে কুকুর, তারপর পুলিশ, সবশেষে এই অদ্ভুত প্রাণীটা–একের পর এক এই চমক সহ্য করার মত অবস্থা রইল না আর ওদের। আতঙ্কিত হয়ে দরজার দিকে দিল দৌড়। হাঁড়ি-পাতিল পায়ে বেধে শব্দ হতে লাগল ভীষণ ভাবে।

দরজার দিকে তাকিয়ে আছে বব। কল্পনাই করতে পারেনি, ওর এই চালাকি কাজে লাগবে। কানে এল মড়মড়, ক্যাঁচকোঁচ, নানা রকম শব্দ; সেই সঙ্গে রাগত স্বরে কথা।

'আবার কি হলো!' কৌতূহল সামলাতে না পেরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে।

ঘটনাটা কি ঘটেছে, অনুমান করতে পারল। কোল-সেলারের দরজা খুলে লাগাতে ভুলে গিয়েছিল কিশোর। অন্ধকারে না দেখে দৌড়াতে গিয়ে তার মধ্যে পড়ে গেছে লোকগুলো। সঙ্গীকে পড়তে দেখে কি হয়েছে দেখার জন্যে এগিয়েছিল বোধহয় আরেকজন, সে-ও পড়েছে। তা যে ভাবেই পড়ুক–ভাবছে

বব—পড়েছে যখন, উঠে আসার আগেই একটা ব্যবস্থা করে ফেলা দরকার।

ভারী ঢাকনাটার কাছে দৌড়ে এসে দাঁড়াল সে। টেনে নিয়ে চলল গর্তের মুখের কাছে। কি হচ্ছে, টর্চ জ্বেলে দেখতে চাইল দুই চোর। ওদের আটকে ফেলা হচ্ছে বুঝে চিৎকার দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে গেল। দুজনে একসঙ্গে। তাড়াহুড়ো করে। কিন্তু পুরানো সিঁড়ি এই ধকল সইতে পারল না। ভেঙে পড়ে গেল। চিৎকার করে উঠল একজন, 'উফ্, গেছেরে, গেছে, আমার পা'টা শেষ!'

বব বুঝল, অন্ধকারে না দেখে ওর মধ্যে পড়েনি দুই চোর। লুকানোর জায়গা দেখে লুকাতে গিয়েছিল, সব গোলমাল মিটে গেলে রাতেই আবার উঠে এসে হীরাগুলো খোঁজার ইচ্ছে ছিল বোধহয়। কিন্তু তাদের সেই ইচ্ছে আর পূরণ করতে দিল না বব। টেনেটুনে পুরোপুরি লাগিয়ে দিল ঢাকনাটা। নিচ থেকে ঠেলে যাতে তুলতে না পারে ওরা, সেজন্যে ভারী আর কোন জিনিস ঢাকনার ওপর চাপিয়ে দেয়া যায় কিনা দেখতে লাগল বব। একটা ডাস্টবিন খুঁজে পেয়ে টেনে নিয়ে এসে ফেলল ঢাকনার ওপর। তার ভেতরে এনে ভরতে লাগল বড় বড় পাথর। কাজ যখন শেষ হলো, পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে সে; এত ঠাণ্ডার মধ্যেও দরদর করে ঘামছে। কিন্তু হিরো হওয়ার একটা নেশা আছে। সেই নেশায় পেয়েছে আজ ববকে।

'কি সব ঘটনাই না ঘটছে আজ রাতে!' ভাবল সে। 'দুই চোর আটকা পড়েছে কোল-সেলারে, আর চাচা টিটুর সঙ্গে আটকা পড়েছে আলমারির মধ্যে। ইস্, কি সাংঘাতিক! সবাইকে নিয়ে যদি দেখা যেত...' কিশোরের কথা মনে পড়ল তার। কি করছে ও? তাড়াতাড়ি দৌড় দিল ঝোপের দিকে।

ওদিকে, চিৎকার-চেঁচামেচি কিশোরের কানেও আসছিল। মাথার ঘোরটা কাটেনি বলে বুঝতে পারছিল না, উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে যাবে, না যেখানে আছে সেখানেই বসে থাকবে।

'এই যে, কিশোর!' ডাক শুনে মুখ তুলে তাকাল সে। বব এসেছে। 'চলো, আমাদের কাজ শেষ। না না, কোন প্রশ্ন কোরো না এখন। আজকে তোমার বোঝার মত অবস্থা নেই। কাল সব জানতে পারবে।'

ঘোরের মধ্যে থাকা কিশোরকে ধরে ধরে নিয়ে বাড়ি রওনা হলো বব। কিছু জানার বা বোঝার ইচ্ছেও নেই এখন কিশোরের ঘোলাটে মগজের। একটা কাজই করতে চায় সে—বাড়ি গিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে।

পনেরো

কিশোরের ঘরেই সে-রাতটা কাটাল বব, রাতে উঠে যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয় কিশোরের, এ জন্যে। পরনে যা আছে, সেই পোশাকেই গুটিসুটি হয়ে পড়ে রইল একটা আর্ম-চেয়ারে। ভাবতে লাগল রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর

কথা। তার চাচা আলমারির মধ্যে, সঙ্গে রয়েছে টিটু, কি দারুণ ব্যাপার!

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সে। কিশোরের মাথার যন্ত্রণা খানিকটা কমতে সে-ও গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেল। পরদিন সকাল সাড়ে-সাতটায় ঝরঝরে শরীর নিয়ে ঘুম ভাঙল তার। দেখে, আর্ম-চেয়ারে কুঁকড়িমুকড়ি হয়ে ঘুমিয়ে আছে বব। আগের সন্ধ্যার কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করল। কি ঘটেছিল?

ধীরে ধীরে মনে পড়তে লাগল সব কথা। গ্রীন হাউসের রান্নাঘরে দুজন লোক পেছন থেকে এসে ধরেছিল তাকে। পিস্তলের বাঁট দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ফেলেছিল। কিন্তু তারপর? তারপরের ঘটনাগুলো আর স্পষ্ট নয়। আস্তে করে হাত উঠে গেল কপালের একপাশে, যেখানে বাড়ি মারা হয়েছিল তাকে। সব জানতে হলে ববকে জিজ্ঞেস করা দরকার। তাকে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল, 'বব! এই বব, ওঠো! সকাল হয়ে গেছে।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বব। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে এখন?'

'ভাল,' বলে নিজের বিছানায় গিয়ে বসল কিশোর। 'বব, কাল রাতে আমি বাড়ি ফিরলাম কি করে? কি হয়েছিল? তোমাকে তো নিয়ে যাইনি গ্রীন হাউসে...তাহলে?'

'তুমি আমাকে যেতে মানা করলেও চুপি চুপি তোমার পিছু নিয়ে চলে গিয়েছিলাম,' জবাব দিল বব। 'তারপর যা সব কাণ্ড ঘটল না...'

'সংক্ষেপে বলো,' কিশোর বলল। 'অত বিস্তারিত শোনার সময় নেই এখন। ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে ফোন করতে হবে।'

'তা করা যাবে,' শান্তকণ্ঠে বলল বব। 'কোন তাড়াহুড়া নেই। সব ক'টাকে খাঁচায় আটকে রেখে এসেছি আমি।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছ কেন? বলো না, কি হয়েছে!'

'প্রথমেই ধরো চাচার কথা,' বব বলল। 'আলমারির মধ্যে আটকে রয়েছে, তুমি যেটাতে ছিলে। তার সঙ্গে রয়েছে টিটু। দুই চোর আটকা পড়েছে কোল-সেলারের মধ্যে। ভয় দেখিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলাম ওদের, গিয়ে ঢুকল সেলারে। বেশি চালাকি করতে গিয়ে নিজেদের বন্দিত্ব নিজেরাই বেছে নিল। সুযোগ বুঝে ঢাকনাটা লাগিয়ে দিয়েছি আমি। তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছি পাথরে ভরা ডাস্টবিন। নিচ থেকে ঠেলে খুলতে পারবে না ওরা কোন ভাবেই। মুখের কাছেই আসতে পারবে না। সিঁড়ি ভেঙে ফেলেছে।'

এতটা অবাক হলো কিশোর, কয়েক সেকেন্ড কোন কথা বেরোল না মুখ দিয়ে। তাকিয়ে রয়েছে ববের দিকে। বিশ্বাস করতে পারছে না ওর কথা। 'সত্যি বলছ?' অবশেষে কথা বলল সে। 'তুমি আমার পিছু নিয়েছিলে কেন?'

'আমার ভয় লাগছিল, চোরগুলো তোমার ক্ষতি করতে পারে,' বব বলল। 'তাই তোমার পিছে পিছে গিয়েছিলাম। ছাউনি থেকে কিভাবে যেন টিটুও বেরিয়ে গিয়েছিল। হাজির হয়েছিল গিয়ে গ্রীন হাউসে। দুই চোর আর চাচাকে

তাড়া করে বেড়িয়েছে।'

'বব···,' কিশোর বলল। 'কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব!···আমি তো সব ভণ্ডুল করে দিয়েছিলাম, তুমি সেগুলো গুছিয়েছ। ইস্, কি মজাটাই না তুমি পেয়েছিলে!'

'তা অবশ্য পেয়েছি,' বব বলল। 'তোমাকে আলমারি থেকে বের করে এনে ঝোপের পাশে বসিয়ে রেখেছিলাম। তোমার অবস্থা খুব খারাপ মনে হচ্ছিল তখন। ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আমি। তারপর হঠাৎ করেই ভয়টা কেটে গেল···তারপর···যেন খেপামিতে পেয়ে বসল···হাঁড়ি-পাতিল, কেটলি যা ছিল তাকের ওপর, সব ফেলে দিতে লাগলাম। এত শব্দ হচ্ছিল, ভয়ে আমিই কাবু হয়ে যাচ্ছিলাম, লোকগুলোকে আর কি দোষ দেব। তার ওপর ওদের ভয় দেখানোর জন্যে শুরু করলাম বিকট গলায় চিৎকার-চেঁচামেচি,' হাসতে শুরু করল বব। 'এখন আমারই বিশ্বাস হচ্ছে না, এ সব কাণ্ড করেছি! আর অস্ত্রধারী মানুষও যে ভূতের ভয়ে এ ভাবে কাবু হয়ে যায়, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।'

'হুঁ,' বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল আবার কিশোর, 'অনেক কাজ বাকি এখনও।···টিটুর সঙ্গে কি ভাবে এক আলমারিতে রাত কাটিয়েছে আমাদের মহামান্য ফগর্‌্যাম্পারকট, দেখার জন্যে তর সইছে না আর। টিটুও নিশ্চয় জন্মের আনন্দ পেয়েছে কাল রাতে।'

ব্যস্ততা শুরু হলো কিশোরের। সুস্থ হয়ে গেছে। মাথার ফোলাটা আছে এখনও। তবে ব্যথা আর তেমন করছে না। ক্যাপ্টেনের অফিসে টেলিফোন করল। যাক, একটা বিরাট স্বস্তি। তিনি এসেছেন।

'কিশোর,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'এত সকালে? কি ব্যাপার?'

'অনেক কথা, স্যার,' উত্তেজিত স্বরে বলল কিশোর। 'বিশ বছর আগে একটা হীরা চুরির ঘটনা ঘটেছিল, গ্রীনহিলসের আইভি নামে একটা বাড়ির ছেলে হিরাম গর্ডন ছিল সেই চুরির সঙ্গে জড়িত। আমার মনে হয়, পুরানো পুলিশ রেকর্ড ঘাঁটলেই পেয়ে যাবেন···'

'ঘাঁটার দরকার নেই,' ক্যাপ্টেন রবার্টসন বললেন। 'পরিষ্কার মনে আছে আমার। ওই কেসের তদন্তকারী অফিসার আমিই ছিলাম। হিরামের জেল হয়েছিল। জেলখানায় মারা গিয়েছিল সে। তার দুই সঙ্গীর একজন জেলে গিয়েছিল তার সঙ্গে, আরেকজন পালিয়েছিল দেশ ছেড়ে। জেলে গিয়েছিল যে লোকটা, কয়েক মাস আগে ছাড়া পেয়েছে সে। কিছুদিন তার ওপর নজর রাখা হয়েছে। মনে করা হয়েছে, হীরাগুলো কোথায় আছে, জানে সে, বের করার চেষ্টা করবে। কিন্তু কিছুই করল না। একেবারে সাদাসিধা ভালমানুষ হয়ে গেল। নজর রাখা বাদ দিল পুলিশ। অনেক পুরানো কেস এটা। তুমি জানলে কি করে?'

'জেনেছি, কারণ, কেসটা আবার নতুন হয়েছে,' কিশোর বলল। 'গ্রীনহিলসে আবার ফেরত এসেছে সেই দুই চোর। বর্তমানের গ্রীন হাউস, যেটার পুরানো নাম ছিল আইভি, সেটাতে গিয়ে···'

'কিশোর!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ। 'কোথায় ওরা?'

'এ মুহূর্তে গ্রীন হাউসের কোল-সেলারে বন্দি,' হেসে বলল কিশোর। 'কাজটা কে করেছে জানেন? শুনলে অবাক হবেন—মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটের ভাতিজা ববর‍্যাম্পারকট।'

'তাই নাকি!' কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল সত্যি অবাক হয়েছেন ক্যাপ্টেন। 'ফগর‍্যাম্পারকটের কি খবর? সে জানে নাকি?'

'শুরুতে জানত। কিন্তু শেষ দিকে খেই হারিয়ে ফেলেছিল। ভুল পথে চালিত হয়ে চোরের পক্ষেই চলে গিয়েছিল। সে এখন গ্রীন হাউসের রান্নাঘরে একটা আলমারিতে বন্দি। তার সঙ্গে রয়েছে টিটু। সারারাত এক জায়গায় রাত কাটিয়েছে দুজনে।'

স্তব্ধ নীরবতা। অনেকক্ষণ পর কথা বললেন ক্যাপ্টেন, 'কিশোর, এ সব সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ, স্যার, সব সত্যি,' কিশোর বলল। 'আপনি কি আসবেন, স্যার? সবাই মিলে আমরা গিয়ে উদ্ধার করতে পারি বিভিন্ন জায়গায় আটকে থাকা লোকগুলোকে।'

'আসছি। বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব,' ক্যাপ্টেন জানালেন। 'তোমরা গ্রীন হাউসে চলে যাও, আমি ওখানেই আসছি।'

ফোন রেখে ববের দিকে ফিরল কিশোর। ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত কথা শুনেছে বব।

'রবিন আর মুসাকে ফোন করো, বব,' কিশোর বলল। 'বলো, এখনই গ্রীন হাউসে রওনা হয়ে যেতে। যদি নাস্তা করতে বসে থাকে, খাবার ফেলেই চলে যেতে বলো। বলে দিও, নইলে মিস করবে। আমি টিটুর জন্যে কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে নিই।'

পনেরো মিনিটের মধ্যেই গ্রীন হাউসের ড্রাইভওয়েতে ঢুকে দাঁড়াল মুসা, রবিন, ফারিহা আর বব। কিশোর দাঁড়িয়ে রইল গেটের কাছে, ক্যাপ্টেনের জন্যে। পাঁচ মিনিট পর দুটো পুলিশের গাড়ি আসতে দেখা গেল। গেটের কাছে এসে থামতেই একটা থেকে লাফ দিয়ে নামলেন ক্যাপ্টেন রবার্টসন। দুটো গাড়ি থেকেই নামল আরও কয়েকজন ইউনিফর্ম পরা পুলিশ অফিসার।

কিশোরের কাছে এগিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। তার কাঁধে চাপড় দিয়ে বললেন, 'চলো, কোথায় যেতে হবে।'

'আগে মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটকে মুক্ত করা দরকার,' কিশোর বলল। 'টিটুকেও। মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট নিশ্চয় রাগে এখন অন্ধ হয়ে আছে।'

'থাকুক,' হাঁটতে হাঁটতে বললেন ক্যাপ্টেন। 'আরে, ফারিহা, তুমিও এসে গেছ। সবাই আছ দেখছি। খুশি হলাম।'

রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সবাই। ঠেলা দিয়ে দরজা খুলল কিশোর। বন্ধ আলমারি থেকে কুকুরের চিৎকার শোনা গেল। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিল কিশোর। লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল টিটু। ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ের ওপর। মুক্তির আনন্দে অস্থির।

'চুপ, টিটু, থাম! আরে, আস্তে!' টিটুকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল কিশোর।

আলমারিতে জিনিসপত্র পড়ার শব্দ হলো। বেরিয়ে এল ফগ। মুখ দেখে মনে হলো, প্রচণ্ড রাগে বিস্ফোরিত হয়ে যাবে যে কোন মুহূর্তে। ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে এগিয়ে আসতে শুরু করল। যেন চিবিয়ে খাবে আজ।

'সব শয়তানির মূলে হচ্ছ তুমি, মোটকা বিচ্ছু কোথাকার!' গর্জন করে উঠল ফগ। 'আর, বর, তোকে আমি এমন শিক্ষা দেব...' ক্যাপ্টেনের ওপর চোখ পড়তে হোঁচট খেয়ে থেমে গেল যেন। 'সরি, স্যার, আপনাকে দেখতে পাইনি! কিশোর পাশার বিরুদ্ধে আমার একটা অভিযোগ আছে, স্যার। সব সময় পুলিশের কাজে নাক গলানো তার স্বভাব। কেসটা আমি শেষ করে ফেলেছি, এ সময় অহেতুক এর মধ্যে ঢুকে পড়ে...'

'হয়েছে, থামো এখন!' বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাকি লোকগুলো কোথায়?'

অবাক মনে হলো ফগকে। আরও লোক? কি বলছেন ক্যাপ্টেন? কিশোরকে অনুসরণ করে সবার সঙ্গে ফগও বেরিয়ে এল চত্বরে। কোল-সেলারের কাছে আসতেই নিচ থেকে শোনা গেল একটা লোকের কণ্ঠ. চিৎকার করে বলল, 'আমাদের বের করুন! আমার গোড়ালি মচকে গেছে! ব্যথা আর সহ্য করতে পারছি না! প্লীজ, বের করুন জলদি!'

ডাস্টবিন ভর্তি পাথরের দিকে তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে আছে ফগ। একজন পুলিশম্যান গিয়ে টান দিয়ে ডাস্টবিনটা সরিয়ে আনল। ঢাকনা সরাল আরেকজন। নিচের দিকে তাকিয়ে ডাক দিল, 'অ্যাই, উঠে এসো। আমরা জানি, বিশ বছর আগে চুরি করা হীরাগুলো বের করে নিতে এসেছিলে তোমরা। কোন রকম চালাকি করবে না।'

চালাকি তো দূরের কথা, দড়ি ফেলে ওদের তুলে আনতে হলো নিচ থেকে। সিঁড়িটা দুই টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে ফগ। কি যে ঘটছে, কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

'আমরা তো কোন অন্যায় করিনি,' ক্যাপ্টেনের ধমক খেয়ে বলল এক চোর। 'পুরানো জায়গাটা দেখতে এসেছিলাম। বৃদ্ধা মিসেস গর্ডনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।'

'বোকা বানানোর চেষ্টা কোরো না আমাদেরকে,' কঠিন স্বরে বললেন ক্যাপ্টেন। 'এ রকম একটা পোড়ো খালি বাড়িতে একজন বৃদ্ধা একা বাস করতে পারেন নাকি?' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। 'কিশোর, বসার জায়গা আছে? কোথাও বসে কথা বলতে পারলে ভাল হত।'

'কথা বলার তো কিছু নেই, স্যার,' বাধা দিয়ে বলল ফগ। 'সব কিছুর সমাধান করেই রেখেছি আমি। এই লোকগুলো আমাকে কয়েকটা মেসেজ পাঠিয়েছিল—এ বাড়িতে একজন দেশদ্রোহী লুকিয়ে আছে জানিয়ে—আমি এসে...'

তাকে শেষ করতে দিল না কিশোর। ক্যাপ্টেনকে বলল, 'স্যার, ভেতরে চলুন, বসেই কথা বলা যাক। কিছু কিছু কাজ এখনও বাকি রয়ে গেছে। রান্নাঘরেই ঢুকি, কি বলেন, স্যার?'

'চলো,' কিশোরকে আগে আগে হাঁটতে দিয়ে পেছনে এগোলেন ক্যাপ্টেন। ফগ সহ বাকি সবাই এক সারিতে ঘরে ঢুকল। পুরানো একটা আর্ম-চেয়ারে বসলেন ক্যাপ্টেন।

'হীরার কথা তো ফোনেই বলেছি, স্যার,' কিশোর বলল। 'হিরামের সঙ্গে যে লোক জেলে গিয়েছিল, সে বেরিয়ে আসার পর বার্মায় যোগাযোগ করল তার পালিয়ে যাওয়া দোস্তের সঙ্গে। এ বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হীরাগুলো উদ্ধারের সিদ্ধান্ত নিল দুজনে। কিন্তু বাড়িতে কেয়ারটেকার দেখে দমে যায়। কার্টাররা থাকাতে ওদের খুঁজতে অসুবিধে হয়। তাই একটা ফন্দি করে ওদের বের করানোর চেষ্টা চালায়। ওরা জেনে যায়, মিস্টার কার্টারের একটা খারাপ অতীত আছে...'

'আর সে-জন্যেই ওদেরকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলি আমি!' ফগ বলে উঠল। 'ওর মত দেশদ্রোহীর...'

'তুমি থামো!' ধমক দিলেন ক্যাপ্টেন রবার্টসন। 'কিশোর, বলো। তারপর?'

'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটকে দিয়ে চোরেরা যা করাতে চেয়েছে, তিনি ঠিক তা-ই করেছেন,' কিশোর বলল। 'পুলিশকে দিয়ে কার্টারদের বের করাতে চেয়েছিল ওরা। উড়ো মেসেজ পাঠানো শুরু করল। শুরুতে খুব অবাক লাগছিল আমার, কাউকে দেখা যায় না, কিছু না, কে, কিভাবে এসে রেখে যায় ওগুলো? পরে চিন্তা করে বুঝতে পারলাম, ঘরের মধ্যেই ইঁদুর আছে–মিসেস বেক। আমি শিওর, ও ছাড়া আর কেউ করেনি অকাজগুলো। চোরের কাছ থেকে টাকা খেয়ে নিজেই মেসেজ সাজিয়ে খামে ভরে এখানে-ওখানে রেখে দিত। তারপর তুলে দিত ফগর‍্যাম্পারকটের হাতে...'

'ঝামেলা!' ফগের গোলআলুর মত চোখ দেখে মনে হচ্ছে কোটরে থাকতে চাইছে না আর, ঠেলে বেরিয়ে আসবে, এতটাই অবাক। দাঁতে দাঁত চাপল সে, 'বাড়ি গিয়ে নিই আগে, ওর কাপ-পিরিচ কেনা, ফুল গোণা আমি ঘোচাব...'

ফগের কথায় কান দিল না কেউ।

কিশোর বলল, 'মেসেজগুলোর খবর আমাদেরকে ফগর‍্যাম্পারকটই দিয়েছেন। মনে করেছেন, তাঁকে খেপানোর জন্যে আমরাই পাঠিয়েছি ওসব। রেগেমেগে আমাদের শাসাতে এসে মেসেজগুলো আমাদের কাছে ফেলে যান,' ফগের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল কিশোর। 'আর এ ভাবেই রহস্যটার কথা জেনে যাই আমরা। খুঁজতে খুঁজতে এ বাড়িটা বের করি। হীরার কথা জানতে পারি। তারপর আসি হীরা খুঁজতে।

'কিন্তু অনেক খুঁজেও কোথায় আছে বুঝতে পারিনি প্রথমে। শেষে কাল রাতে আবার আসি খুঁজতে। অনুমান করতে পেরেছিলাম, চোরেরাও আসবে

হীরাগুলো বের করে নিয়ে যেতে,' দুই চোরের দিকে তাকাল সে। জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে লোকগুলো। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, ধরে চিবিয়ে খেতে পারলে খুশি হত।

'যাই হোক,' কিশোর বলল, 'কথা সংক্ষেপ করি। রাতে আমি এলাম। চোরেরাও এল। বব এল। টিটুও এল। আমাকে আলমারিতে বন্দি করল চোরেরা। টিটু এসে ওদের তাড়িয়ে বের করে নিয়ে গেল। আমাকে বের করল বব। পরে ওদেরকেও কোল-সেলারে আটকে ফেলল।'

'হুঁ,' মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন। 'কিন্তু ফগর‍্যাম্পারকট আলমারিতে গেল কিভাবে?'

চোখ পাকিয়ে ববের দিকে তাকাল ফগ।

এত লোকের সামনেও কুঁকড়ে গেল বব। তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, আমি চাচাকে আটক করিনি, স্যার। টিটু তাকে তাড়িয়ে নিয়ে আলমারিতে ঢুকিয়ে ফেলল। দরজা আটকে দিল ওরা,' দুই চোরকে দেখাল সে।

কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন, 'হীরাগুলো কোনখানে আছে, কোন ইঙ্গিত দিয়েছে ওরা?'

'না, স্যার।'

কিশোরের জবাব শুনে মনে হলো, ঘরের সবাইই খুব হতাশ হয়েছে।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'তারমানে কেসের সমাধান হলো না পুরোপুরি। তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারছ, কোথায় আছে?'

'তা পারছি, স্যার,' নাটকীয় ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'তবে চোখে দেখিনি এখনও।'

ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে দুই চোর। ফগের মুখ দেখে মনে হচ্ছে, এ পৃথিবীতে জন্মানোর জন্যে আফসোস হচ্ছে তার।

'সত্যি তুমি জানো?' আবার জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'জানি,' জবাব দিল কিশোর। 'একজন ফিটার মিস্ত্রি পেলে সেগুলো বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারি।'

'ফিটার মিস্ত্রী কেন?'

'আসুন, স্যার, সিংকের কাছে। দেখাচ্ছি।'

দুই চোরকে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল পুলিশ অফিসারেরা। কিশোরের সঙ্গে পিচ্ছিল জায়গাটাতে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। হুড়াহুড়ি করে এল বব, মুসা, রবিন, ফারিহা আর টিটু। ঘিরে দাঁড়াল কিশোরকে। ফগও পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেনের পেছনে।

সিংকের কাছের ছোট পাকা চত্বরটার ওপরে ছাত খুব নিচু। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। পাইপের জোড়াটায় আঙুল রাখল কিশোর। এক ফোঁটা ঠাণ্ডা পানি তার আঙুল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

'সিংকের কল খুললে পানি বেরোয় না ঠিকমত,' কিশোর বলল। 'এর কারণ, পাইপ ভরে ফেলা হয়েছে হীরা দিয়ে। পানি চলাচল করতে পারে না।

সে-জন্যে। তাড়াহুড়ো করে পাইপের জোড়া খুলে ওখানে হীরাগুলো লুকিয়ে ফেলেছিল হিরাম, জেল থেকে বেরিয়ে এসে খুলে নিত আবার। তার কপাল খারাপ…যাই হোক, ঘরের কোন জায়গা খোঁজা বাদ রাখিনি আমরা। কেবল এই একটা জায়গা বাদে। খুললেই পাওয়া যাবে হীরাগুলো, কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'ঝামেলা!' বিড়বিড় করল ফগ। 'পানির পাইপে হীরা লুকানো…এত বছর পুলিশের চাকরি করলাম, জন্মে শুনিনি এ রকম কথা!'

ঘরের দিকে ফিরে তাকালেন ক্যাপ্টেন। তাঁর একজন লোককে বললেন, 'গাড়ি থেকে হ্যাক-স'টা নিয়ে এসো তো।'

লোহাকাটা করাত নিয়ে হাজির হলো পুলিশম্যান। গোড়ার দিকে যে জায়গাটা দেখিয়ে দিল কিশোর, সেখানে কাটতে শুরু করল। কেটে আলাদা করে ফেলল পাইপটা। পানির চাবি আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জমে থাকা কয়েক ফোঁটা পানি বেরোল কেবল।

টান দিয়ে পাইপের ওপরের অংশটা বাঁকা করল কিশোর। কাটা মুখটা সরে আসতেই ঝরঝর করে কয়েকটা হীরা পড়ল তার ভেতর থেকে। বাকিগুলো আটকে রইল।

পুরো পাইপটাই কেটে আলাদা করে খুলে নিয়ে আসা হলো। হীরাগুলো সব বের করতে আর অসুবিধে হলো না।

'ওস্তাদ গোয়েন্দা তোমরা, কিশোর,' প্রশংসা করলেন ক্যাপ্টেন। ফগের দিকে তাকালেন, 'কি বলো, ফগর‍্যাম্পারকট?'

জবাব দিল না ফগ। সারারাত আলমারিতে থেকে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। রুমাল বের করে নাক ঝাড়ল সশব্দে। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সরি, স্যার!'

ববের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, 'যে কাজ তুমি করেছ, বব, তারজন্যে তোমার একটা পুরস্কার পাওয়া দরকার। কি চাও, বলো?'

খুশিতে দম আটকে যাওয়ার জোগাড় হলো ববের। অনেক চেষ্টার পর কোনমতে বের করল, 'আ-আমি পু-পু-পুলিশের সার্জেন্ট হতে চাই, স্যা-স্যা-স্যার!'

'খুব ভাল কথা,' ববের চাহিদা শুনে খুশি হলেন ক্যাপ্টেন। 'বয়েস হোক, আমি নিজে তোমাকে পুলিশে ঢোকানোর সুপারিশ করব। ও খুব ভাল পুলিশ অফিসার হতে পারবে, গোয়েন্দা বিভাগের, কি বলো, ফগর‍্যাম্পারকট?'

'আহ্, ঝামেলা!' বলে হ্যাঁচচো করে উঠল ফগ। রুমাল দিয়ে নাক মুছে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল। 'সরি, স্যার!'

***
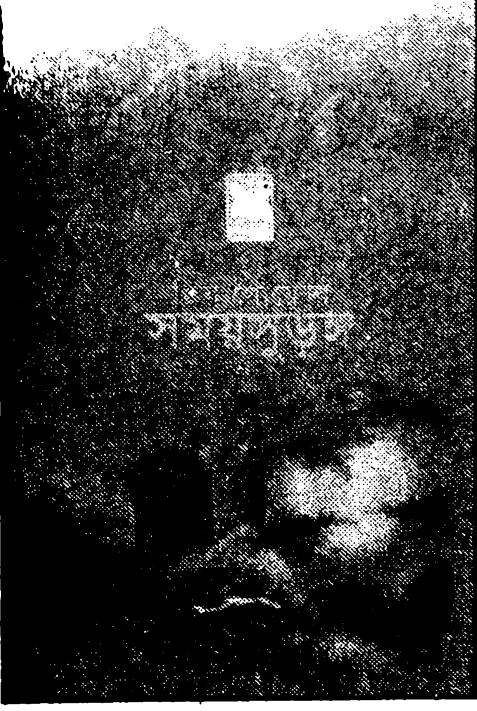
সময়সুড়ঙ্গ

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল কিশোর, 'সর্বনাশ! ঠিক পাঁচটায় যেতে বলে দিয়েছে চাচী!'

একটা মুহূর্তও আর দাঁড়াল না। মলের করিডর ধরে ছুটল। অবাক হয়ে সামনে থেকে ছিটকে সরে যেতে শুরু করল বাজার করতে আসা লোকজন। উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল তাদের।

'আরে আস্তে! আস্তে!' পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল মুসা। লোকজনের ভিড় ঠেলে পেছন থেকে পাশে আসতে পারছে না।

'সময়মত বাড়ি যেতে না পারলে চাচী আজ আর আমাকে আস্ত রাখবে না!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'ঠিক পাঁচটায় জন্মদিনের কেক কাটবে আমার।'

'তোমার জন্মদিন! কই বলনি তো?'

'এ সব ফালতু কথা মনে থাকে নাকি ছাই···'

'জন্মদিন ফালতু হলো?'

'জন্মদিনটা ফালতু নয়, তবে অনুষ্ঠান করাটা ফালতু। স্রেফ ন্যাকামি মনে হয় আমার। চাচারও বিশেষ পছন্দ না ব্যাপারটা। মেরিচাচীরও তেমন ছিল না, কিন্তু হঠাৎ করে কি যে খেয়াল চাপল মাথায়···'

'কিন্তু আমার জন্মদিনটা আজকে হয়ে গেলে ভাল হত,' আফসোস করে বলল মুসা। 'টেলিস্কোপটার জন্যে বায়না ধরতে পারতাম।'

একটা টেলিস্কোপ দেখতে মলে এসেছিল দুজনে। বড় একটা মীডি টেলিস্কোপ, ৪.৫ ইঞ্চি লেন্স, এফ-৮, মোটর সংযুক্ত ইকোএটারিয়াল মাউন্ট। দারুণ জিনিস। চোখ লেগে গেছে মুসার। মাঝে মাঝেই নানা রকম বাতিকে ধরে মুসাকে, তবে থাকে না বেশিদিন। একটা গিয়ে আরেকটা ধরে। এবার ধরেছে সাইন্স ফিকশনের বাতিকে। সাইন্স ফিকশন এক্সপার্ট হতে চায়। মহাকাশ দেখার জন্যে টেলিস্কোপটা তার দরকার।

মলের পার্কিং লটে বেরিয়ে দ্রুতহাতে সাইকেলটার তালা খুলে নিল কিশোর। মুসার দিকে তাকাল, 'সরি, ভাই, আগে দাওয়াত দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। যাবে নাকি কেক খেতে?'

'কিন্তু উপহার ছাড়া···'

'দুত্তোর! রাখো তোমার উপহার! এটা আরেকটা ফালতু ন্যাকামি মনে হয় আমার। জন্মদিনের দাওয়াত মানেই উপহার। কেন, খালিহাতে গেলে আনন্দ

কিছু কম হয়? বরং বিড়ম্বনা কমে।'
'হয়েছে, হয়েছে, লেকচার থামাও। কিন্তু আমি একা যাব? রবিন...'
'বাড়ি গিয়ে একটা ফোন করে দেব। রবিন আর জিনা দুজনকেই। আর কাউকে বলব না। বেশি ঝামেলা করতে ইচ্ছে করছে না।'
'সময়মত যদি আসতে না পারে?'
'দেরি করে আসবে। কয়েক মিনিট পরে এসে কেক খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'
'জলদি চলো, কেকের কথা শুনেই পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে।'

স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছে তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপের বেড়ায় সাইকেল দুটো ঠেস দিয়ে রাখল দুজনে। দরজা দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে এল একটা বিরাট কুকুর। ঝাঁপিয়ে পড়ল কিশোরের গায়ে। ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল কিশোর।
'আরি, রাফি, তুই!'
জবাবে কিশোরের কাঁধে পা দুটো তুলে দিয়ে গাল চাটতে শুরু করল রাফিয়ান।
'আরে থাম থাম, গন্ধ করে দিলি তো গালটা! তোর নিঃশ্বাসে বেজায় গন্ধ লাগছে আজকে!'
'পেট খালি, অনেকক্ষণ খায়নি তো,' হাসিমুখে দরজার কাছ থেকে জবাব দিল জিনা।
'তুমিও এসেছ!'
'শুধু আমি না। রবিনও,' জিনা বলল। 'একটু আগে মেরিআন্টি ফোন করে খবরটা জানালেন। তুমি ভুলে গেলে কি হবে, তিনি ভোলেননি।'
তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল রবিনের হাসিমুখ।
'ভুলবেন আর কি করে?' কিশোর বলল। 'আয়োজনটা যে তাঁরই। যাকগে, তোমরা আসাতে খুশি হয়েছি। কষ্ট করে আর ফোনটা করতে হলো না আমাকে। আর কাউকে দাওয়াত দিয়েছে নাকি চাচী? জানো?'
দরজার বাইরে বেরিয়ে এল জিনা আর রবিন।
'না, আর কাউকে বলেননি,' রবিন জানাল। 'তুমি যে খেপে যাবে, জানেন। মুসাদের বাড়িতেও করেছিলেন, পাননি। তোমার সঙ্গেই কোথাও বেরিয়েছে অনুমান করেছিলাম আমরা,' জিনার দিকে তাকাল সে একবার। 'সে-জন্যেই ওঅর্কশপে অপেক্ষা করছিলাম।'
বারান্দা থেকে ডাক শোনা গেল মেরিচাচীর, 'কথা বলে কে রে! কিশোর, এলি নাকি?'
'হ্যাঁ, চাচী।'
'কোথায় গিয়েছিলি? আমি তো ভাবলাম গেলই বুঝি আজ আমার এত সাধের কেক বানানো। সেই কখন থেকে এসে বসে আছে জিনারা। জলদি আয়। মাত্র দেড় মিনিট আছে আর।'

*

'পঞ্চাশ ডলারের কম হবে না দাম,' ক্যামেরাটা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে বলল মুসা।

অনুষ্ঠানের পর তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে এসে বসেছে ওরা। জঞ্জালের নিচে মোবাইল হোম, তার মধ্যে গোপন আস্তানা। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকেছে। একটা লোহার মোটা পাইপ। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। সুতরাং ওদের সঙ্গে রাফিয়ানের ঢুকতেও অসুবিধে হয়নি।

'হুঁ,' ক্যামেরাটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'এখন মনে হচ্ছে জন্মদিন করে ভালই হয়েছে। এ রকম একটা জিনিস পেয়ে গেলাম।'

রবিন বলল, 'এক্স থাউজ্যান্ড। সত্যি ভাল। প্রফেশনালদের জিনিস।'

ক্যামেরাটা ফিরিয়ে দিল মুসা। স্ট্র্যাপে ভরে রাখতে রাখতে কিশোর বলল, 'একেবারে সময়মত পেয়ে গেলাম জিনিসটা। ভাবতেই পারিনি আজকে পাব...কাকতালীয় ব্যাপার।'

'প্লীজ,' তাড়াতাড়ি হাতজোড় করল মুসা, 'তোমার দুর্বোধ্য গ্রীক ভাষায় বড্ড আতঙ্ক আমার। যদি বলতেই হয় খোলামেলাভাবে বলো, যাতে রাফিও বোঝে।'

'খুফ!' নিজের নাম শুনে সচকিত হলো রাফিয়ান। ঘাড় কাত করে বিজ্ঞের ভঙ্গিতে তাকাল কিশোরের দিকে।

হেসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল জিনা। 'তুই বুঝে কি করবি? তোর কি আর হাত আছে? ক্যামেরা ব্যবহার করতে পারবি না।'

ক্যামেরাটা টেবিলে রাখল কিশোর। সবার মুখের দিকে তাকাল এক এক করে। 'গতরাতের সাইন্স ফিকশন ছবিটার পর টিভিতে মহাকাশের ওপর আলোচনাটা শুনেছিলে?'

মুসা বলল, 'আমি শুনেছি।'

জিনা আর রবিন চুপ করে রইল। তারমানে ওরা টেলিভিশন খোলেনি, কিংবা খুললেও ওই চ্যানেল দেখেনি।

'ইউ এফ ও-র কথা বলল যে শুনেছ?'

'ভাল মত,' জবাব দিল মুসা। 'আমার অবশ্য কিছুদিন থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল, রকি বীচের আশেপাশে ফ্লাইং সসার নামে। কিছু কিছু আলামত চোখেও পড়েছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না, ইনডিয়ানদের পুরানো গোরস্থানের ওপাশে লেকের কাছে কি করতে গেল ওরা? শহরে নামতে পারত। মেয়রের সঙ্গে দেখা করে বলতে পারত, আমরা ভিনগ্রহ থেকে এসেছি, তোমাদের দেশে বেড়াতে।'

'যত সহজে বলছ, ব্যাপারটা অত সোজা না,' কিশোর বলল। 'অন্য গ্রহ থেকে এসে কি করে বুঝবে পৃথিবীর মানুষ বন্ধুভাবাপন্ন কিনা? সহজে মেনে নেবে কিনা? নিরাপদ জায়গায় ওঠানামা করে আগে তাই বুঝে নিতে চেয়েছে পারিপার্শ্বিক অবস্থা। কি কি প্রাণী আছে, এখানকার বুদ্ধিমান প্রাণীরা কেমন, ইত্যাদি। আমার বিশ্বাস, মাদার শিপটা আকাশের অনেক ওপরে রেখে সম্ভবত

ছোট আকাশযান নিয়ে নেমে আসে ওরা। বড় জাহাজ কিনার থেকে অনেক দূরে ভিড়িয়ে যেমন করে বোট নিয়ে অজানা দ্বীপে নামত আগের দিনের নাবিকেরা, ভিনগ্রহবাসীরাও ছোট ছোট যান নিয়ে নেমে আসছে গবেষণা চালাতে।'

'তা তো বুঝলাম,' আর ধৈর্য রাখতে পারল না রবিন, 'কিন্তু এর সঙ্গে তোমার কাকতালীয় ব্যাপারের কি সম্পর্ক?'

'এখনও বুঝলে না? খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করেছি, ইউ এফ ও দেখতে যাব। ক্যামেরাটা পেয়ে যাওয়ায় খুব ভাল হলো। যদি সত্যি নামে, ছবি তুলে নিয়ে আসব।'

'অ, তাই বলো,' এতক্ষণে আগ্রহ দেখা গেল জিনার মধ্যে। 'কিন্তু টিভিতে আলোচনাটা আরও অনেকেই শুনেছে। তারাও যদি যায়? গিয়ে ভিড় করে?'

'গেলে যাবে।'

'আমার মনে হয় না, যেতে চাইবে,' মুসা বলল। 'ইউ এফ ও-তে ইদানীং আর অত আগ্রহ নেই লোকের। ওগুলোকে ভূতপ্রেতের মত অবাস্তব ধরে নিয়েছে। ভাবে, সাইন্স ফিকশন লেখকদের কল্পিত কাহিনী। বিজ্ঞানীরাও বেশির ভাগই ঠোঁট ওল্টান, হাতে গোণা কিছু মহাকাশ বিজ্ঞানী বাদে। যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের ধারণা, মহাকাশে অবশ্যই বুদ্ধিমান প্রাণী রয়েছে। মহাকাশযান নিয়ে গ্রহ-গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়ায় তারা।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'তোমার মত বাস্তববাদী যে ইউ এফ ও-তে বিশ্বাস করবে, ভাবতে পারিনি।'

'ভূতপ্রেতে বিশ্বাস নেই আমার, ঠিক,' জবাব দিল কিশোর, 'কিন্তু মহাকাশটা তো আর কল্পিত নয়। সৌরজগতেরও অভাব নেই সেখানে। আমাদের সৌরজগতে যদি প্রাণী থাকতে পারে, অন্যখানে থাকবে না কেন? না বিশ্বাস করাটাই বরং এক ধরনের উন্নাসিকতা। ভূতপ্রেতে বিশ্বাস নেই আমার, এ কথাও কিন্তু কখনও বলিনি—বলেছি, বিশ্বাস করব, যদি সত্যি সত্যি চোখে দেখতে পাই। না দেখলে করব কেন? অন্যের মুখে ঝাল খেতে যাওয়ার কোন মানে নেই।'

'দেখলেও তো তুমি তখন আবার অন্য ব্যাখ্যা খুঁজে বেড়াবে,' টিপ্পনি কাটল মুসা।

'বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা তো খুঁজে বেড়াবই। ব্যাখ্যাগুলো যদি সত্যি সত্যি অতিপ্রাকৃত ব্যাপার-স্যাপারের দিকে ইঙ্গিত করে, বিশ্বাস না করে উপায় কি? আমার বক্তব্য পরিষ্কার: ভুতুড়ে কাণ্ড যেটা প্রমাণিত হবে—প্রমাণটা অন্য কাউকে দিয়ে নয়, আমার নিজেকে দিয়ে—এবং নিজের চোখে দেখতে পাব, সেটা নিশ্চয় বিশ্বাস করব।'

'চোখের ভুল হয় অনেক সময়,' জিনা বলল।

'তা তো হয়ই। অনেক সময় নয়, বেশির ভাগ সময়। বিশ্বাস করার আগে চোখের ভুল কিনা যাচাই করে দেখে শিওর হয়ে নেব। যাই হোক, ভূতের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব এই ইউ এফ ও। আরও নিশ্চিত হয়ে যাব, ছবি

তুলতে পারলে।' বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর, 'চলো না, আজই যাই।'

'হুঁ, এক্স ফাইলের মোল্ডার তাহলে তোমার মগজেও ঢুকে গেছে,' মাথা দোলাল রবিন, 'অব্যাখ্যাত রহস্য।...কিন্তু আজ যদি না নামে?'

'আজ না নামলে অন্যদিন নামবে, যদি মাদার শিপটা চলে গিয়ে না থাকে। তাহলে অন্যদিন যাব। যেতেই থাকব, যতদিন না চোখে পড়ে এবং লেকের ওপরের আকাশে ইউ এফ ও দেখা যায় এই গুজব বন্ধ না হয়। টিভিতে বলেছে, গত কিছুদিন ধরে অনেকেই নাকি রহস্যময় আলো ঘোরাফেরা করতে দেখেছে রাতের আকাশে, ছুটে যেতে দেখেছে লেকের দিকে...'

'আমিও দেখেছি,' মুসা বলল। 'উজ্জ্বল আলো ছুটে গিয়ে ভেসে রইল খানিকক্ষণ লেকের ওপর। যেন ঝুলে রইল। তারপর নিভে গেল। এ রকম আলো আর কখনও দেখিনি আমি। যেমন দ্রুতগতি, তেমনি উজ্জ্বল।'

'কিছু তো একটা নিশ্চয় দেখা যাচ্ছে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'নইলে টিভিওলারা মেতে উঠবে কেন?'

দুই

লেকের কাছটায় জলাভূমির পচা গ্যাসের গন্ধে ভরা। সর্বক্ষণ বিরক্ত করছে এক ধরনের ছোট ছোট পোকা। হাত দিয়ে ভুরুর ওপর থেকে সরিয়ে ঘড়ি দেখল কিশোর।

এগারোটা পঁয়তাল্লিশ। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।

মুসারা কি এসে ফিরে গেল? উঁহু, তা যাবে না। ওর জন্যে অপেক্ষা করবে। ওরা এসেছিল জন্মদিনের দাওয়াত পেয়ে। রাতে ফিরতে দেরি হবে, বাড়িতে বলে আসেনি। তাই মুসা, জিনা, রবিন তিনজনেই যার যার বাড়িতে ফিরে গেছে বলে আসার জন্যে। আসতে কি দিল না ওদের?

কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে লেকটা। NASA-র আরেকটা গবেষণাগার তৈরি হবে। সে-জন্যেই এত সতর্কতা। রকি বীচের ছেলেমেয়েদের ধারণা, ওই 'নাসা'র আগমনের কারণেই আজকাল রহস্যময় মহাকাশযানের আনাগোনা বেড়ে গেছে এদিকটায়। যেখানেই নাসা, সেখানেই মহাকাশযান–কথাটা তো এখন অনেকটা প্রবাদের মতই হয়ে গেছে। যতই বেড়া দেয়া হোক, কঠোর প্রহরা থাক, ছোটদের ঠেকাতে পারে না। আগে আসত স্রেফ হাওয়া খেতে–কালেভদ্রে, ইদানীং আসে ইউ এফ ও দেখতে–এবং প্রায়ই। বেড়ার বাইরের বনের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে দেখার লোভে।

এমনিতে জায়গাটা তেমন গরম না। কিন্তু আজ গরম লাগছে।

ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে। ভয়ানক অত্যাচার করছে মশার

ঝাঁক, জলাভূমির খুদে মাছি, নানা রকম কিলবিলে পোকা-মাকড়, জলাভূমিটা যাদের স্বর্গরাজ্য। সন্ধ্যার পর থেকে একআধ ডিগ্রির বেশি নামেনি তাপমাত্রা। বাতাস গরম। সেই সঙ্গে আর্দ্রতা, ঘাম বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে আঠা হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মুসারা এখনও আসছে না কেন? এসে কি অন্য কোথাও বসে আছে?

সন্দেহ নিরসনের জন্যে মুসা আর রবিনের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল সে। জবাব পেল না।

দূর! যখন আসে আসুক। ঝোপের মধ্যে বসে আর মশার কামড় খেতে ইচ্ছে করল না। উঠে পড়ল। সাবধানে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল প্রহরী আছে কিনা। তারপর কাঁটাতারের নিচের দিকটা উঁচু করে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল বেড়ার অন্যপাশে। এখানে ঢোকাটা বেআইনী। কেয়ার করল না সে। ইউ এফ ও দেখাটাই আসল।

বেড়ার কাছ থেকে একটা পায়েচলা পথ চলে গেছে বনের ভেতর দিয়ে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পথটা। এগিয়ে চলল ওটা ধরে। মিনিট দুই হাঁটতে শেষ হয়ে গেল গাছপালা। খাড়া, একটা পাথুরে অঞ্চলে ঝপ করে নেমে গেছে এখন পথটা। নিচে লেকের চকচকে কালো পানি। দূর থেকে লাগছে আয়নার মত মসৃণ।

রাস্তা ধরে নামতে শুরু করল সে। নিচের দিকটায় কাদা। পা পিছলানোর ভয় আছে। পা ফেলতে সাবধান হলো। বেশ কঠিন হলো এগোনো। সতর্ক থাকার পরেও শেষ রক্ষা করতে পারল না। ঠিকই পা পিছলাল। সড়াৎ করে নেমে চলে গেল অনেকখানি। দুই পাশে বেরিয়ে থাকা শিকড় থাবা দিয়ে ধরে ঠেকানোর চেষ্টা করল।

পাহাড়ের গোড়ায় বেরিয়ে থাকা একটা বড় পাথরের সঙ্গে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে থামল। পাথরে বাড়ি খেল খাপে ভরা ক্যামেরাটা। স্যান্ডেল তো আঠাল কাদায় মাখামাখি হলোই, গোড়ালি পর্যন্ত উঠে এল কাদা। জিনসের পেছনে কাদার চড়া পড়ে গেল। বাকি অংশেরও খুব কম জায়গাই আছে কাদা না লাগা। ধোয়ার সময় মেরিচাচীর মুখের অবস্থাটা কি হবে ভেবে হাসি পেল তার।

কাপড়-চোপড়, স্যান্ডেল, ঘড়ি—কোন কিছু নিয়েই মাথা ঘামাল না সে। খাপ থেকে ক্যামেরাটা খুলে দেখতে লাগল। এটার কোন ক্ষতি হলে এখন ভীষণ দুঃখ পাবে।

এমনিতে তো ভালই দেখা যাচ্ছে। যান্ত্রিক কোন ত্রুটি হয়েছে কিনা সেটা ছবি না তুললে বোঝা যাবে না।

লেকটার দিকে তাকাল। চওড়ায় আধমাইল। লম্বায় দ্বিগুণের বেশি। আকৃতি ডিমের মত। লেকটা মানুষের তৈরি নয়। ভৌগোলিকদের ধারণা, বহুকাল আগে উল্কাপাতে জন্ম হয়েছিল এটার।

বছরের এ সময়টায় পানিতে টইটম্বুর থাকে লেক। কিনারে জন্মায় প্রচুর জলজ আগাছা আর নলখাগড়া। দিনের বেলা নানা রঙের ফড়িঙ ওড়ে, মনের

আনন্দে ডানা নাচায় প্রজাপতি। রাতে এখন নেই ওরা। প্রচুর ঝিঁঝি আছে। ডেকে ডেকে কান ঝালাপালা করছে। আজ পূর্ণিমা। ভরা চাঁদের রূপালী আলোয় নিখুঁত একটা বিশাল আয়নার মত লাগছে লেকটাকে। হঠাৎ করেই কেমন অপার্থিব লাগল দৃশ্যটা কিশোরের কাছে। মনে হলো, জায়গাটা যেন পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনখানে। ইউ এফ ও দেখতে এসেছে বলেই বোধহয় এমন চিন্তা ঠাঁই পাচ্ছে মনে।

ক্যামেরাটা নিয়ে স্বস্তি পাচ্ছে না সে। ঠিক আছে তো!

পৃথিবীর জন্মের শুরু থেকেই নাকি ভিনগ্রহবাসীরা নেমেছে এখানে–বইপত্র আর কিংবদন্তী বলে। আগেকার দিনে নাকি অনেকে চাক্ষুস দেখেছে ওদে। ওদের মূর্তি বানিয়ে রেখেছে, গুহার দেয়ালে ছবি এঁকে রেখেছে। ক্যামেরা আবিষ্কার হওয়ার পর ইউ এফ ও-র বেশ কিছু ছবি তোলা হয়েছে। তবে কোনটাই তেমন স্পষ্ট নয়। একেবারে কাছে থেকে কেউ তুলতে পারেনি। হাতে যে ক্যামেরা ছিল না তা নয়, কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে তাড়াহুড়ায় ছবি তুলতে ভুলে গেছে, কিংবা বিমূঢ় হয়ে উল্টোপাল্টা ক্যামেরা ব্যবহার করেছে, যার ফলে ছবি আর ওঠেনি ঠিকমত। সে-ধরনের ভুল করতে চায় না সে। কিন্তু ক্যামেরা নিয়েই যে এখন সন্দেহ!

চোখের সামনে তুলে আনল ক্যামেরাটা। লক্ষ্য স্থির করল লেকের ওপর। টিপে দিল শাটার।

ক্লিক করে শব্দটা হলো ঠিকই, কিন্তু আলো জ্বলল না। ঝিক করে উঠল না ফ্ল্যাশের তীব্র নীলচে-সাদা আলো।

ফ্ল্যাশটা গেল নাকি!

ক্যামেরাটা চোখের যতটা সামনে আনলে পরিষ্কার দেখা যায়, ততটা সামনে নিয়ে এল। শত্রুতা শুরু করল চাঁদের আলো। এক টুকরো কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল চাঁদ।

ধ্যাত্তুরি! নিজের ওপরই প্রচণ্ড বিরক্ত হলো সে। নামার সময় আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তাহলে পা-ও পিছলাত না, ক্যামেরাটাও নষ্ট হতো না।

আবছা অন্ধকারে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে ক্যামেরার গোলমালটা কোনখানে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। ব্যাটারি খুলে নিয়ে আবার ভরল। ফিল্ম কার্ট্রিজটা ঘোরাল একপাক। আবার টিপল শাটার। জ্বলল না ফ্ল্যাশ। নাহ্, গেলই বোধহয়!

টিপে চলল শাটারের সুইচ।

ক্লিক! ক্লিক! ক্লিক! শব্দ হচ্ছে ঠিকই। আলো জ্বলার নাম নেই। তারমানে বাল্বটা গেছে।

চোখের সামনে থেকে ক্যামেরাটা সরিয়ে নিল। বড়ই হতাশ। ইউ এফ ও নামলেও আর হয়তো ছবি তুলতে পারবে না এখন। অন্যদের ভাগ্যে যা ঘটেছে, তার ভাগ্যেও তাই। কেমন কাকতালীয় মনে হলো ব্যাপারটা।

ক্যামেরায় চোখ ছিল বলেই বিচিত্র আলোটা এতক্ষণ চোখে পড়েনি তার।

বিচিত্র নীলচে কাঁপা কাঁপা আলোর আভা ছড়িয়ে পড়েছে লেকের পানিতে। মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকাল সে। চাঁদ ঢেকে দেয়া মেঘের স্তরটা কেমন কুঁকড়ে-বুকড়ে গেছে। তাতে অন্য এক ধরনের আলোর প্রতিফলন, চাঁদের আলো নয়। চাঁদের চেয়ে অনেক কাছাকাছি, অনেক বেশি উজ্জ্বল–ফ্লোরেসেন্ট আলোর মত নীলচে-সাদা।

বরফের মূর্তির মত জমে গিয়ে তাকিয়ে রইল সে। দেখতে দেখতে মেঘের টুকরোটাকে শুষে নিল যেন সেই বিচিত্র আলো। অদ্ভুত একটা শাঙ্কব আকৃতির জিনিসের পেটের মধ্যে গলগল করে ঢুকে যাচ্ছে যেন মেঘের স্তরটা।

বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা খামচে ধরল যেন কেউ। কিসের দিকে তাকিয়ে আছে? ইউ এফ ও! নাকি কোন ধরনের ভয়ঙ্কর টর্নেডো? কিন্তু টর্নেডোর আলো থাকে না। ছবি তোলার কথা মাথা থেকে উধাও হয়ে যায়নি তার। শক্ত হাতে চেপে ধরল ক্যামেরাটা। উজ্জ্বল জিনিসটাকে নিশানা করল সে। শাটার বাটনে চেপে বসতে শুরু করল আঙুল। ভিনগ্রহবাসীর মুখটা উঁকি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিপে দেবে। যে রকম আলো দেখা যাচ্ছে, ভাগ্য ভাল হলে ফ্ল্যাশ ছাড়াও ছবি উঠে যেতে পারে।

ভিউফাইন্ডারের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে আছে সে। নিঃশ্বাস বন্ধ।

হঠাৎ তীব্র আলোর ঝলকানি। কয়েক হাজার ফ্ল্যাশ মিলেও এত উজ্জ্বল আলো তৈরি করতে পারত না। এমন আলো আর কখনও দেখেনি সে। আলোটা ঠিক কোনখান থেকে এল তা-ও স্থির করতে পারল না।

তারপর সব অন্ধকার।

তিন

বিছানায় শুয়ে আছে বুঝতে পারল সে। কি ঘটেছিল? মনে করার চেষ্টা করল। মাথার মধ্যে ঘোরটা কাটেনি পুরোপুরি। নাইটস্ট্যান্ডে রাখা ল্যাম্পটা জ্বালার জন্যে সুইচ হাতড়াতে লাগল। ক'টা বাজে? লেকের পাড়ের পুরো ঘটনাটা কি কল্পনা ছিল?

চোখ মেলে অবাক হয়ে দেখল আলোটা জ্বলছে। আরও অবাক হলো যখন দেখতে পেল বিছানাটা তার নিজের নয়। অন্য কারও বিছানায় শুয়ে আছে। এটার চাদর অনেক বেশি পরিষ্কার। ওর নিজেরটার মত এলোমেলো আর অগোছাল নয় মোটেও।

মেরিচাচীকে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। কাঁদছেন।

'ওর কিছু হয়নি! কিছু হয়নি!' বিলাপের সুরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন তিনি। 'কিচ্ছু হয়নি আমার ছেলের!'

'না হলেই ভাল,' নিশ্চিত হতে পারছেন না রাশেদ পাশা। ছোট্ট ঘরটায়

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছেন গম্ভীর মুখে। 'কিন্তু, মেরি…' চুপ হয়ে গেলেন। কথাটা শেষ করলেন না। তবে কণ্ঠে অনিশ্চয়তার সুরটা স্পষ্ট।

ফিরে তাকাল কিশোর। চাচার চোখেও পানি দেখতে পেল। যেটা বড়ই দুর্লভ। রাশেদ পাশা কাঁদছেন, এটা সচরাচর চোখে পড়ে না।

ঘটনাটা কি?

চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারল, হাসপাতালের কেবিনে রয়েছে।

দুজন পুলিশ অফিসারকে চোখে পড়ল। দরজার কাছে দাঁড়ানো। ডিটেকটিভ। ব্যাজ দেখে বোঝা যায়, দুজনেরই পদবী লেফটেন্যান্ট। খুব সিরিয়াস কিছু না ঘটলে ডিটেকটিভরা আসে না। ধূসর চুলওয়ালা মহিলা-ডাক্তারের সঙ্গে ফিসফাস করে কথা বলছে ওরা।

আগের সন্ধ্যার ঘটনাগুলো কল্পনায় ছায়াছবির মত ফুটতে শুরু করল তার মনে। বিনা অনুমতিতে অবৈধ ভাবে প্রবেশ করেছিল 'নাসা'র বেড়া দেয়া সীমানার মধ্যে। নিশ্চয় জেনে গেছে পুলিশ। বেআইনী কাজ করেছে সে। সেজন্যেই এসেছে ওরা।

'চাচী,' বলতে গিয়ে বুঝতে পারল কিশোর, কি সাংঘাতিক দুর্বল হয়ে গেছে তার কণ্ঠ, 'পুলিশ কেন?'

তার কপালে চুমু খেলেন মেরিচাচী। কথা বললেন না। ভাবভঙ্গিতে কিশোরের মনে হলো, কবর থেকে ফেরত আনা হয়েছে যেন ওকে।

'চাচী! এমন করছ কেন? আমার ভয় লাগছে।'

দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন রাশেদ পাশা। 'ভয় কিসের?'

'ওরা কেন?' ডিটেকটিভদের দিকে ইঙ্গিত করল কিশোর। 'কি করেছি আমি?'

'ওসব নিয়ে ভাবিসনে,' আশ্বস্ত করলেন রাশেদ পাশা। 'দুশ্চিন্তার কিচ্ছু নেই। ওদের কাজ ওরা করতে এসেছে। তুই বিশ্রাম নে। তোর শরীর ভাল না।'

'ভাল না? কি হয়েছে?'

'সেটাই তো জানতে চাইছি আমরা,' এগিয়ে এল একজন ডিটেকটিভ।

'ঘণ্টাখানেক আগে লেকের ধার থেকে তুলে আনা হয়েছে তোকে,' চাচী জানালেন। 'বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলি।'

বেহুঁশ? মনে হলো কিছু কিছু বুঝতে শুরু করেছে কিশোর। আলোর ঝিলিকের কথা মনে পড়ল। 'বজ্রপাতের শিকার হয়েছিলাম নাকি?' জিজ্ঞেস করল সে। নিজের কাপড়-চোপড়ের দিকে তাকিয়ে দেখল পুড়েছে কিনা। কিন্তু তার নিজের কাপড়গুলো নেই। হাসপাতালের হালকা নীল রঙের একটা গাউন পরনে।

'বজ্রপাত?' ভুরু কুঁচকে ফেলেছেন মেরিচাচী। চোখে অস্বস্তি নিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে তাকালেন ডাক্তারের দিকে।

বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার। নেম ট্যাগ-এ ডাক্তারের নাম দেখা যাচ্ছে: মিস শেলী অলরিজ।

পেন্সিল টর্চের সরু রশ্মি চোখে ফেলে দেখতে শুরু করলেন ডাক্তার। প্রথমে বাঁ'টা, তারপর ডান। মিনমিন করে কিশোর বলল, 'ভয়ানক তীব্র আলোর ঝলকানি চোখে পড়েছিল আমার। মেঘের স্তরটা যেন কেমন, একটা ফানেলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল রঙিন হয়ে। তারপর আর কিছু মনে নেই। কে আমাকে খুঁজে পেল?'

'নাসার দুজন মেইনটেন্যান্স ম্যান। ভোরবেলা দেখে পানির কাছে পড়ে আছিস।'

'ও!'

'এতদিন কোথায় ছিলি তুই, কিশোর?' মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন।

'এতদিন মানে!' বুঝতে পারল না কিশোর।

জবাব দিতে যাচ্ছিলেন মেরিচাচী, হাত তুলে তাঁকে নিষেধ করলেন ডক্টর অলরিজ। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন, 'আজ কি বার, বলো তো?'

'কি বার!' গতকাল কি বার ছিল মনে করার চেষ্টা করল কিশোর। মাথা নাড়ল। 'বলতে পারব না!'

মেরিচাচীর মুখ দেখে মনে হলো আবার কেঁদে ফেলবেন। এগিয়ে এসে তাঁর কাঁধে সান্ত্বনার হাত রাখলেন রাশেদ পাশা।

'কি বার আজ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'সোম? মঙ্গল? কাল তো আমার জন্মদিন ছিল...' চুপ হয়ে গেল সে।

ডাক্তারের দিকে ফিরলেন মেরিচাচী। 'ব্যাপারটা কি বলুন তো? কিছু মনে করতে পারছে, কিছু পারছে না! এটা কোন্ রোগ?'

'প্লীজ, মিসেস পাশা, শান্ত হোন,' অনুরোধ করলেন ডাক্তার। 'আপনি এ ভাবে বললে ও আরও দ্বিধায় পড়ে যাবে।'

দ্বিধায় ইতিমধ্যেই পড়ে গেছে কিশোর।

ওর দিকে তাকালেন ডাক্তার। নীল চোখের দৃষ্টি স্থির হলো তার চোখে। ধীরে ধীরে বললেন, 'কিশোর, শুনলে হয়তো চমকে যাবে। কিন্তু সত্যি কথাটা জানা উচিত তোমার। আজকে তোমার জন্মদিনের পরদিন নয়।'

চট করে দুই ডিটেকটিভের ওপর দৃষ্টি ঘুরে এল কিশোরের। চোখে প্রত্যাশা নিয়ে ওরাও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সবার নজর এখন ওর ওপর।

'আমাকে ধাঁধার মধ্যে না রেখে আজ কি বার বলে দিলেই তো হয়,' বলল কিশোর।

'বুধবার,' জবাব দিলেন ডাক্তার। মেরিচাচী আর রাশেদ পাশার দিকে তাকালেন একবার। 'এপ্রিলের বাইশ তারিখ।'

ভুল শুনল মনে হলো কিশোরের। 'কি বললেন!'

'চমকে যাবে বললামই তো,' শান্তকণ্ঠে বললেন ডাক্তার। 'এটা এপ্রিল মাস, কিশোর। প্রায় নয় মাস ধরে নিখোঁজ ছিলে তুমি!'

'বাড়ি যেতে চাও?' স্টেথোস্কোপটা পকেটে ভরতে ভরতে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার অলরিজ। 'নাকি রাতটা এখানে কাটিয়ে যাবে? টেলিভিশনে পঞ্চাশটা

চ্যানেল আছে আমাদের। যে কোন খাবার খেতে চাও, এনে দেয়া যাবে।'

কিন্তু মেরিচাচী থাকতে দিতে রাজি নন। কিশোর জবাব দেয়ার আগেই বললেন, 'নিজের বিছানা ছাড়া ঘুমাতে পারে না ও।' কিশোরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

'আপনাদের পঞ্চাশটা, আমাদের বাড়িতে আসে পঁচাত্তরটা চ্যানেল,' কিশোর বলল।

ডাক্তার হাসলেন।

কিন্তু কিশোরের হাসি আসছে না। ডাক্তারের এক কথাতেই মাথা গরম হয়ে গেছে। নয় মাস! নিশ্চয় রসিকতা করা হচ্ছে তার সঙ্গে। এটা এপ্রিল মাস তো। হয়তো সেজন্যে। এখনই হয়তো হাসিমুখে চিৎকার করে উঠবেন ডাক্তার: এপ্রিল ফুল! এপ্রিল ফুল!

অপেক্ষা করছে কিশোর।

কিন্তু 'এপ্রিল ফুল' বললেন না ডাক্তার। কেউই বলল না। সবাই মোটামুটি গম্ভীর।

ঘরের কোণে রাখা টেলিভিশনের দিকে তাকাল কিশোর। একটা কমেডি সিরিজ হচ্ছে। বিরক্ত হয়ে আওয়াজ বন্ধ করে দিতে বলল।

ঘরে ঢুকলেন লম্বা, বলিষ্ঠদেহী একজন লোক। হাসিমুখে এগিয়ে এলেন বিছানার দিকে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাই, কিশোর! কেমন আছো?'

পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার।

পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর, 'কি মনে হয়, স্যার, আপনার? ভাল কি থাকার কথা? নয় মাস নাকি আমি গায়েব ছিলাম?'

থমকে গেলেন ক্যাপ্টেন। হাসিটা উধাও হয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে। ফিরে এল আবার। 'সে-ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি আমি তোমার সঙ্গে। জবাব দেয়ার মত মনের অবস্থা আছে?'

'আছে।'

'ভেরি গুড। আমি জানতাম তুমি আমাকে নিরাশ করবে না। তা ছাড়া তোমার মনের জোর...'

বাধা দিল কিশোর। 'কি জানতে চান?'

'কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলে কোন ধারণা আছে তোমার? এতগুলো মাস, কোথায় ছিলে?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমার শুধু মনে আছে, লেকের পাড়ে ইউ এফ ও-র ছবি তুলতে গিয়েছিলাম আমি। মুসা, রবিন আর জিনারও যাবার কথা ছিল। ওরা যায়নি। যে কোন কারণেই হোক সময়মত পৌঁছাতে পারেনি। কেন পারেনি, জানি না। কারণ এরপর আর ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। পাথরে বাড়ি খেয়ে আমার ক্যামেরাটা বোধহয় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফ্ল্যাশ জ্বলছিল না। তারপর আকাশে অদ্ভুত রঙের এক মেঘ দেখলাম। ক্যামেরা তাক করলাম সেদিকে। হঠাৎ সাংঘাতিক এক আলোর ঝিলিক! আর কিছু মনে

নেই।'

'ক্যামেরা! কোন ক্যামেরা তো পাওয়া যায়নি লেকের ধারে।'

'তাহলে গেছে আরকি ওটা। যাকগে। আপনারা বলছেন নয় মাস···এতদিন একটা দামী ক্যামেরা ওখানে পড়ে থাকার কথা নয়। এমন কারও হাতে পড়েছে যে ফেরত দেয়ার মত সৎ নয়।'

'তাই হবে। তা আকাশে অদ্ভুত রঙের মেঘ দেখলে বলছ। মেঘটা কেমন?

'ফানেলের মত একটা জিনিস দেখলাম। তীব্র গতিতে ঘুরে ঘুরে তার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল মেঘের স্তর···'

'সেটা কবের কথা?'

'আমার জন্মদিন যেদিন ছিল, সেদিনকার।'

'হুঁ,' গম্ভীর হয়ে মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন। 'নয় মাস আগে। তারপর?'

'ওই যে, তীব্র আলোর ঝিলিকের কথা বললাম। তারপর আর কিছু মনে নেই আমার। চোখ মেলতে দেখলাম এখানে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছি। আপনারা বলছেন নয় মাস, অথচ আমার মনে হচ্ছে গতকালকের ঘটনা!'

'লেকের পাড়ে কেউ তোমাকে অনুসরণ করে গিয়েছিল? কিছু টের পেয়েছ? এমন কেউ, যে তোমাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যেতে পারে?'

'নাহ্!'

মুসাদের কথা মনে করে মনটা তেতো হয়ে গেল কিশোরের। যাবে বলেও কেন গেল না? ওরা সঙ্গে থাকলে হয়তো ধাঁধাটার জবাব দিতে পারত–নয় মাস কোথায় ছিল ও! কারণ ওকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে থাকলে ওরা দেখতে পেত। কিন্তু ধরে নিয়ে যাওয়াটা তো আসল কথা নয়। আসল কথা হলো, নয় মাসের কোন কিছুই মনে করতে পারছে না সে। ডাক্তার, পুলিশ, সবাই নিশ্চয় মিথ্যে বলছেন না। তারমানে নিশ্চিত বিস্মরণ ঘটেছে তার। যে জন্যে নয় মাসের কথা মনে করতে পারছে না।

একটা ছবি বের করে দেখালেন ক্যাপ্টেন। 'এই মেয়েটাকে চেনো?'

এক নজর দেখেই মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'চিনি। আমাদের ক্লাসেই পড়ে। ডানা হিউগ্রি।'

'তুমি নিখোঁজ হওয়ার কয়েক মাস পর এই মেয়েটাও রহস্যজনকভাবে হারিয়ে গেছে। উদ্বিগ্ন বোধ করছি আমরা। মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে মেয়েটার নিখোঁজ হওয়ার কোন সম্পর্ক আছে।'

ভুরু কুঁচকাল কিশোর। 'কিন্তু আমি তো কিছু জানি না! কবে হারাল?'

'গত জানুয়ারিতে। বুঝতেই পারছ, বিস্মৃত নয় মাসের কথা তোমার মনে করতে পারাটা আমাদের জন্যে অতি জরুরী। অনেক সাহায্য হতো তাতে। এমন হতে পারে, যে লোক তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সেই একই লোক ডানাকেও নিয়ে গেছে। কোন একটা সূত্র–যে কোন ধরনের–যদি খালি মনে করতে পারো, অনেক উপকার হত···'

এতক্ষণে বুঝতে পারল কিশোর, ডিটেকটিভ আর পুলিশ কেন এসেছে হাসপাতালে তার সঙ্গে দেখা করতে। নাসার সীমানায় বেআইনী ভাবে ঢুকেছিল সে, সেটা আসল ব্যাপার নয়।

'পারলে কি ভেবেছেন আমিও চুপ করে বসে থাকতাম? ওকে উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করে দিতাম না? নাকি ভাবছেন, আমি যে গোয়েন্দা, এ কথাটাও ভুলে বসে আছি?'

অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। 'না, ভুলিনি...তবে তোমার মনে আছে জেনে সুখী হলাম। একটা দুশ্চিন্তা কাটল। আশা করতে পারি এখন, এ কেসে তুমি আগের মতই সাহায্য করতে পারবে পুলিশকে।'

কি জবাব দেবে বুঝতে পারল না কিশোর। বিছানায় সোজা হয়ে বসে ভাবতে শুরু করল। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। মগজটাকে খাটাতে খাটাতে ঘামিয়ে ফেলল। মনে করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুই মনে করতে পারল না। কেবল তীব্র আলোর ঝলকানির পর অন্ধকার, তারপর হাসপাতালের বেডে জেগে ওঠা—আর কিচ্ছু না।

'সরি!' অবশেষে হতাশ ভঙ্গিতে বালিশে গড়িয়ে পড়ল আবার সে। 'একটা কথাও আমি মনে করতে পারছি না!'

হাসপাতালের কিছু অদ্ভুত নিয়ম-কানুন আছে। কিশোরের অন্তত সে-রকমই মনে হলো। পুরোপুরি সুস্থ মানুষকেও রোগী ভাবা যেন ডাক্তারদের স্বভাব। স্বাভাবিক মানুষের মত হেঁটে বেরোতে পারে যে, তাকেও হুইল-চেয়ার অথবা স্ট্রেচারে করে বাড়ি পাঠানোর রেওয়াজ। যেন পান থেকে চুন খসলেই ভেঙেচুরে সর্বনাশ হয়ে যাবে দেহটা। স্রেফ পাগলামি—কিশোরের ধারণা। এখান থেকে বেরোনোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে, সে-জন্যেই ডাক্তারদের সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করল। সারা গা কম্বলে মুড়ে, মাথায় সাতরঙা রামধনু রঙের একখানা 'ভাঁড়ের উইগ' পরিয়ে যখন স্ট্রেচারে শুইয়ে বিদায় দেয়া হলো ওকে, লক্ষ্মী ছেলের মত মুখ বুজে থাকল। কোন্‌টা থেকে কোন্‌টা বলতে গিয়ে আবার আটকা পড়ে, এই ভয়ে চোখই মেলল না পারতপক্ষে।

তাকে মুক্ত করতে পুরো একটা ঘণ্টা গলদঘর্ম হতে হলো মেরিচাচী আর রাশেদ পাশাকে। অবশেষে চাকাওয়ালা স্ট্রেচারে করে হাসপাতালের করিডর ধরে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল ওকে। বাঁ পাশে থাকলেন চাচা, ডান পাশে একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে চাকাওয়ালা বিছানার সঙ্গে সঙ্গে এগোলেন মেরিচাচী। এত জোরে খামচে ধরেছেন চাচী, যেন আবার ছুটে গিয়ে হারিয়ে যাবে কিশোর। কিশোরের মনে হলো, পরদিন যদি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টরা আসে কোন কারণে, চাচীর আঙুলের ছাপ স্পষ্ট খুঁজে পাবে ওরা তার হাতের চামড়ায়।

হাসপাতালের বাইরে গাড়ির কাছে পৌঁছেছে ওরা, ছায়া থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। পেশিবহুল, পেশাদার অ্যাথলেটের মত দেহ। ছয় ফুটের ওপরে ইঞ্চিখানেক হবে লম্বা, ওজন একশো নব্বই পাউন্ড, লাল ইঁটের

মত চুলের রঙ। একটা হাত পেছন দিকে নিয়ে রেখেছে। কি আছে হাতে? পিস্তল?

আড়চোখে তাকিয়ে আছে কিশোর।

কাছে এসে কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল অপরিচিত লোকটা। চওড়া হাসি।

'হাই!' হাসিমুখে বলল সে। 'ফিরে তাহলে এলে! তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমার জান কাবার হয়ে গিয়েছিল! কোথায় গিয়ে লুকিয়েছিলে?' কিশোরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে সে। বাঁ গাল থেকে লম্বা একটা কাটা দাগ সোজা উঠে দুই ভাগ করে দিয়েছে বাঁ দিকের ঘন ঝোপের মত কালো ভুরুটাকে।

'কে আপনি?' সতর্ক হয়ে গেছে কিশোর।

জবাব দিলেন রাশেদ পাশা, 'উনি মিস্টার মার্টিন ড্রোজার।'

'কই, কখনও নামটা শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না!' কিশোর বলল।

'পড়বে কি করে? তোমার সঙ্গে তো আর আগে পরিচয় হয়নি আমার,' হাসিমুখে বলল ড্রোজার। পেছনের হাতটা সামনে নিয়ে এল। পিস্তল নেই হাতে। এক গুচ্ছ ফুল। কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার জন্যে।'

'থ্যাংকস!' ফুলের তোড়াটা নিয়ে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছাড়ল কিশোর। কিন্তু ফুল দিক আর যা-ই দিক, লোকটার প্রতি অস্বস্তিটা দূর হলো না তার।

গাড়িতে তোলা হচ্ছে কিশোরকে। কানে এল লোকটার কথা, চাচাকে বলছে, 'ভাতিজাকে তো পেলেন। আমার কাজও শেষ। কখনও প্রয়োজন হলে খবর দেবেন আবার।'

'তা তো নিশ্চয়। গত কয়েক মাসে অনেক করেছেন আপনি। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। টাকা-পয়সা যা পাওনা হয়েছে অফিসে এসে একদিন নিয়ে যাবেন।'

'পাওনা আর কোথায়, সবই তো প্রায় দিয়ে দিয়েছেন। ঠিক আছে, যাব একদিন। আপনার ভাতিজাকেও দেখে আসব আরেকবার।'

রাশেদ পাশার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল ড্রোজার।

কয়েক মিনিটের ড্রাইভ। বাড়ি পৌঁছে গেল গাড়ি। সারাটা পথ কিশোরের সঙ্গে বকর বকর করেছেন মেরিচাচী। প্রশ্ন একটাই: ন'টা মাস সে কোথায় উধাও হয়ে ছিল?

কিন্তু ন'মাস নিয়ে আর এখন মাথা ঘামাচ্ছে না কিশোর। সেটা পরে ভাবলেও চলবে। রহস্যময় মিস্টার ড্রোজার কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছে। লোকটাকে মোটেও ভাল লাগেনি তার। চোখের দৃষ্টিও কেমন ভয়ঙ্কর। কেউটের মত শীতল।

বারান্দার সামনে এসে থামল গাড়ি। সব পরিচিত। সেই আগের মতই রয়েছে। সবখানে জঞ্জাল। পুরানো বাতিল মালের স্তূপ। সব সেই আগের

মতই আছে। মনে হচ্ছে গতকালকের ঘটনা।

সত্যি কি আছে? বাগানের দিকে তাকিয়ে পরিবর্তনটা চোখে পড়ল। ড্যাফোডিলগুলো পুরো ফুটেছে এখন। ন'মাস আগে ছিল না। বেড়ার ধারের আপেলের চারাটার বড় ডালটা ভাঙা। নিশ্চয় ঝড় হয়েছিল। তাতে ভেঙে পড়েছে।

দৌড়ে এল বোরিস আর রোভার। স্ট্রেচার থেকে ধরে ধরে নামাল।

ওর ফিরে আসার খবর পেয়ে গেছে মুসা, রবিন আর জিনা। বাড়ি আসছে শুনে আর হাসপাতালে যায়নি, ওঅর্কশপে অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে রাফিয়ান। গাড়ির শব্দ শুনে বেরিয়ে এল ওরাও।

সবাই ভাল ব্যবহার করছে ওর সঙ্গে, কিন্তু দুর্ব্যবহার করে বসল রাফিয়ান। ঘাউ ঘাউ করতে করতে পেছন থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। আদরের আতিশয্য নয়। একেবারে মারমুখো ভঙ্গি। দুদিক থেকে বোরিস আর রোভার ধরে না রাখলে পড়েই যেত সে।

চার

'রাফি! রাফি! হলো কি তোর?' ধমকে উঠল জিনা। কিন্তু কর্ণপাত করল না কুকুরটা। কিশোরের গায়ে পা তুলে দিয়ে চিৎকার করছে, সেই সঙ্গে গর্জন। পারলে ঘাড় কামড়ে ধরে।

'রাফি আমাকে চিনতে পারছে না,' বিমূঢ় কণ্ঠে বলল কিশোর। হাত বাড়িয়ে মাথা চাপড়ে আদর করে দিতে চাইল।

ঝটকা দিয়ে মাথা সরিয়ে নিল রাফিয়ান। কামড়ে দিতে গেল কিশোরের হাতে।

'অ্যাই, রাফি, পাগল হয়ে গেছিস নাকি!' কখনও যা করে না সাধারণত জিনা, তাই করল; ঠাস করে এক চড় মারল কুকুরটাকে। কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে আনল কিশোরের গায়ের ওপর থেকে।

'এতদিন পর আমাকে দেখে বোধহয় চমকে গেছে!' হাসার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু হাসিটা যান্ত্রিক। অস্বস্তি যাচ্ছে না। কি হয়েছে রাফির? ওর সঙ্গে এমন শত্রুর মত আচরণ করছে কেন কুকুরটা?

'পাগল হয়ে গেছে নাকি কুত্তাটা!' মেরিচাচী বললেন। 'জিনা, পাগলা কুকুরে কামড়ায়নি তো ওকে? জলাতঙ্ক!'

'না, সারাটা দিন তো আমার সঙ্গেই ছিল, তেমন কিছু তো দেখিনি,' রাফির ব্যবহারে সাংঘাতিক অবাক হয়েছে জিনা। রীতিমত কান্না পাচ্ছে তার। কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল ওঅর্কশপের দিকে। বিন্দুমাত্র বাধা দিল না রাফিয়ান, প্রতিবাদ করল না, জিনার সঙ্গে একেবারে সুবোধ বালকের আচরণ—ওর যা স্বভাব। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে কিশোরের দিকে চোখ পড়তেই

আবার গোঁ-গোঁ করে উঠল। কিশোরের মধ্যে যেন ভূত দেখতে পেয়েছে কুকুরটা।

খটকাটা বাড়ল কিশোরের। রাফির এই অদ্ভুত আচরণের পেছনে রহস্যটা কি?

'আগামী কাল দেখা হবে' বলে কিশোরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তার বন্ধুরা।

কিশোরকে নিয়ে রান্নাঘরে ডিনারে বসলেন মেরিচাচী আর রাশেদ পাশা। মেরিচাচী হাসপাতালে ছিলেন বলে রান্না করা হয়নি। মিস কোয়াড্রুপলও বাড়ি নেই। বোনের অসুখ, দেখতে গেছে। কাজেই শুধু স্যান্ডউইচ আর আপেল জুস দিয়ে খাওয়া সারতে হলো।

খাওয়া সেরে নিজের শোবার ঘরে চলে এল কিশোর। সব আগের মত রয়েছে। কোন জিনিস এখান থেকে ওখানে হতে দেননি মেরিচাচী। কেবল কম্পিউটারের পাশে আরও ডজনখানেক গেম-এর সি-ডি যুক্ত হয়েছে। বিল্ট-ইন ভিসিআর সহ মিনি ক্যামকর্ডারটা রয়েছে আগের জায়গায়। ঊনত্রিশ ইঞ্চি স্ক্রীনওয়ালা বিশাল টিভি সেটটা রয়েছে ঘরের কোণে। ঝকঝক করছে, নিয়মিত পরিষ্কার করে রাখার কারণে।

চাচা-চাচী দুজনেই এসেছেন ওর সঙ্গে ওর ঘরে। চাচার টেলিফোনটা ছয়বার বাজার পর বিরক্ত হয়ে কানে লাগালেন তিনি। বলে দিলেন, আপাতত ব্যবসার কথা বাদ। এ মুহূর্তে কোন কথা বলতে পারবেন না তিনি।

'তোর ক্লান্ত লাগছে না, কিশোর?' মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন।

'না।'

'বেশি উত্তেজনার সময় ক্লান্তি থাকলেও সেটা টের পাওয়া যায় না,' চাচা বললেন। 'ওর আজকে ঘুম আসতেও দেরি হবে।'

'আমার খুব টায়ার্ড লাগছে,' চাচী বললেন। 'তা ছাড়া শরীরটাও ভাল নেই। দুদিন থেকে পেটের একটা পাশ ব্যথা করছে।'

'কেন?' শঙ্কিত হলো কিশোর।

'কেন আর কি? পেট কি আর ব্যথা করে না মানুষের? অ্যাসিডিটি হবে হয়তো।...আর কিছু লাগবে তোর? আমি শুতে চললাম।'

'না, লাগবে না। তুমি যাও। আমার জন্যে ভেবো না। ঘুমিয়ে পড়ব। কাল আবার স্কুলে যেতে হবে না?'

চাচী বললেন, 'পারবি যেতে?'

'কেন পারব না? তোমরা যতটা ভাবছ, তত অসুস্থ আমি নই। ঘরে বসে থাকার চেয়ে স্কুলে গেলেই ভাল লাগবে আমার। তা ছাড়া মুসাদের সঙ্গেও দেখা হবে। ওরা তো স্কুল শেষ না করে আসতে পারবে না। বিকেল পর্যন্ত একা বাড়িতে বসে থাকব নাকি!'

'য়াস্। যেতে পারলে তো ভালই।'

চাচা বললেন, 'কাজে লেগে যাওয়াই ভাল। দীর্ঘদিন কেউ অসুখে ভুগলে

শরীর সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরও মনটা অসুস্থ থেকে যায়। যত তাড়াতাড়ি সেটাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা যায়, ততই ভাল।'

চাচার কথাই ঠিক। বিছানায় শুয়েও ঘুম এল না তার। ভাবছে। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম করে ফেলার জোগাড়। নয়-নয়টা মাস! এতগুলো দিন সে ছিল কোথায়? পুলিশের ধারণা—হারিয়ে গিয়েছিল। কোথায় হারিয়েছিল? অচেনা কোন জায়গায় নিশ্চয় ঘুরে বেড়িয়েছে এতগুলো দিন। পরিচিত জায়গা হলে, কেউ চিনে ফেললে অনেক আগেই তাকে বাড়ি পৌঁছে দিত।

ফিরে গেল লেকের পাড়ে জ্ঞান হারানোর আগের শেষ দৃশ্যটায়। মুসারা আসেনি। কেন আসেনি, এখ জানে সে। জিজ্ঞেস করেছে ওদের। মুসার জেলপি গাড়িতে করে রওনা দিয়েছিল তিনজনে—রবিন, মুসা আর জিনা। পথে খারাপ হয়ে যায় মুসার ভটভটি। অনেক চেষ্টা করেও সারাতে না পেরে শেষে গাড়ি ফেলে হেঁটে গিয়েছিল ওরা। তাতে অনেক দেরি হয়ে যায়। গিয়ে আর পায়নি কিশোরকে।

লেকের পাড়ে পিছলে পড়ে ক্যামেরাটা নষ্ট হওয়ার কথা ভাবল কিশোর।...তীব্র আলোর ঝলকানি।...তারপর অন্ধকার।...সেই আলোই নিশ্চয় স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত করে দিয়েছে তার। হুঁশ ফেরার পর রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। ঘোরের মধ্যে হাঁটছিল। কোন ট্রাক ড্রাইভার তাকে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছিল হয়তো। ওর মুখ থেকে কোনও ঠিকানা উদ্ধার করতে না পেরে অচেনা কোন শহরের রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছিল তাকে।

কিন্তু কোন শহরেই যদি যাবে, সেই শহর থেকে ফিরে এল কি করে আবার? ফিরে এসে লেকের পাড়ে কি করতে গিয়েছিল? বেহুঁশ হলো কেন?

কেউ তাকে তুলে নিয়ে যায়নি তো?

মনে পড়ল রঙিন মেঘের কথা। ইউ এফ ও!...মনে পড়ল রাফির অদ্ভুত আচরণের কথা। কি দেখতে পেয়েছে কুকুরটা তার মধ্যে? ভূতে আসর করার কথা শুনে এসেছে এতদিন। কিন্তু তার ঘাড়ে ভূত সওয়ার হয়েছে, বিশ্বাস করতে পারছে না এ কথা। তাহলে ঘটনাটা কি?

মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব। গরম হয়ে উঠল মগজ। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে খুট করে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। পিরিচ ঢাকা দেয়া গেলাসটা তুলে ঢকঢক করে গিলে ফেলল সবটুকু পানি।

বই পড়ার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। হয়তো ঠাণ্ডা হবে মাথা। কিন্তু শুধু শুধুই তাকিয়ে রইল ছাপার অক্ষরগুলোর দিকে। মন বসাতে পারল না।

বইটা রেখে দিয়ে তার চাচার স্টাডিতে এসে ঢুকল। ফাইলে অনেক কিছু লিখে রাখেন রাশেদ পাশা। ন'টা মাস কি ঘটেছে এ বাড়িতে, জানা দরকার। কোথায় গিয়েছিল সে, এ রহস্য ভেদের জন্যে কাজে লাগবে এমন কোন তথ্য পেয়েও যেতে পারে।

রাশেদ পাশার ডায়েরীটা দেখতে পেল টেবিলে। কারও ডায়েরী পড়া

নীতি-বিরুদ্ধ, কিশোরও সেটা পছন্দ করে না। কিন্তু আজকে কৌতূহল সামলাতে পারল না। নয় মাসের রহস্য ভেদ তাকে করতেই হবে।

পাতা ওল্টাতে শুরু করল কিশোর। সব বিস্তারিত লেখা রয়েছে। কিভাবে বনের মধ্যে কুকুর নিয়ে খুঁজে বেড়িয়েছে তাকে পুলিশ। কিভাবে দিনের পর দিন সার্চ পার্টি তন্নতন্ন করে খুঁজেছে তাকে লেক আর তার আশেপাশের এলাকায়। মরিয়া হয়ে খুঁজেছে তাকে মুসা, রবিন আর জিনা। ইনটারনেটে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল তার ছবি, টেলিভিশনের প্রতিটি চ্যানেলের 'নিখোঁজ সংবাদ' বিভাগে বার বার প্রচার করা হয়েছিল তার নিরুদ্দেশের খবর, অনুরোধ জানানো হয়েছিল কেউ যদি দেখে থাকে খোঁজ দেয়ার। দুধের কার্টুনের পেছনে যে বিজ্ঞাপনের জন্যে জায়গা থাকে, সেখানেও দীর্ঘদিন ধরে তার ছবি এবং নিরুদ্দেশের খবর ছাপা হয়েছে। পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মেরিচাচীর কান্নাকাটি সহ্য করতে না পেরে 'ভূত-বিশেষজ্ঞ' আর জিপসি ওঝাকে পর্যন্ত ডেকে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন চাচা, অপার্থিব কোন জগতে যদি বিচরণ থেকে থাকে তাঁর ভাতিজাকে তাহলে যাতে ধরে নিয়ে আসতে পারে। মোটকথা, তাকে খুঁজে বের করতে কোন উপায়ই বাদ রাখেননি চাচা।

পরিবারের মধ্যে তার যে এতটা মূল্য, জেনে মনে মনে খুশি হলো কিশোর।

পাতা উল্টে যেতে লাগল।

একটা পাতায় একটা ছবি পিন দিয়ে আটকে রাখা। ইঁটের মত লাল চুল লোকটার। বাঁ গালে কাটা দাগ। মিস্টার ড্রোজারের ছবি।

রাশেদ পাশার লেখা ক্যাপশন পড়ে জানা গেল: এই লোক একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। তারমানে গোয়েন্দা। নিজে গোয়েন্দাগিরি করতে ভালবাসেন রাশেদ পাশা, কিন্তু ভাতিজার নিরুদ্দেশে এতটাই বিচলিত হয়ে গিয়েছিলেন নিজের ওপরও বোধহয় আস্থা ছিল না, তাই বিপুল পরিমাণ ফিসের বিনিময়ে আলাদা গোয়েন্দা নিয়োগ করেছিলেন।

পড়া শেষ করে ডায়েরীটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিল কিশোর। জানা গেছে অনেক কিছু। কিন্তু এ সব থেকে তার নয় মাস গায়েব থাকার রহস্যের কোন সমাধান হলো না। ফিরে এল নিজের ঘরে। শুয়ে পড়ল বিছানায়। আলো নিভিয়ে দিল। ঘুম এল অবশেষে। তবে গাঢ় নিদ্রা হলো না। ছটফট করতে থাকল ঘুমের মধ্যেও। স্বপ্ন দেখে চলল একনাগাড়ে। দুঃস্বপ্ন।

পাঁচ

ঘুম ভাঙলে কিশোর দেখল বিছানার পাশে ঝুঁকে রয়েছেন মেরিচাচী। হাতে এক প্লেট প্যানকেক। নীল জামের রস দিয়ে তৈরি। কিশোরের প্রিয় খাবার।

'এত তাড়াতাড়ি সকাল হয়ে গেছে?' আফসোস করে বলল কিশোর।

'মাত্র তো শুলাম। রাতে ঘুম হয়নি। অনেক রাতে ঘুমিয়েছি।'

'স্কুলে যাবি বললি না?' মেরিচাচী হাসলেন। 'পনেরো মিনিটের মধ্যে বাস চলে যাবে। জলদি ওঠ।'

'বাসে যেতে পারব না। বাথরুম, গোসল, নাস্তা...'

'ঠিক আছে, চিন্তা নেই। আমি তোকে গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে আসব। সত্যি যেতে চাস স্কুলে?'

'নিশ্চয়!' লাফ দিয়ে উঠে বসল কিশোর। 'জাহান্নামে যাক ঘুম। কেটে গেছে। দরকার হলে ফিরে এসেও ঘুমাতে পারব।' বড় একটা তোয়ালে টান দিয়ে তুলে নিয়ে দৌড় দিল বাথরুমের দিকে।

হাসতে লাগলেন মেরিচাচী। এই প্রথম স্বস্তির হাসি দেখা গেল তাঁর মুখে। আবার পুরনো স্বাভাবিক চরিত্রে ফিরে আসছে কিশোর, তাঁর কাছে মনে হলো। পেছনে চিৎকার করে বললেন, 'তোর স্কুলের জামা-কাপড়গুলো বের করে রাখছি আমি। ন্যাংটো হয়ে বেরোসনে আবার। তোয়ালেটা জড়িয়েই আসিস। আগের মত ছোট নেই আর এখন তুই, ভুলে যাসনে।'

আপনমনে হাসতে লাগলেন চাচী। ভাবছেন, ছেলেগুলো বড় হয়ে যায় কেন? হাফপ্যান্ট ছাড়া শুধু গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়াতে পারে যখন সেই সময়টাই তো সবচেয়ে ভাল। কিন্তু উপায় নেই। বড় তো হবেই। কল্পনায় ছোট দেখে আনন্দ পাওয়া ছাড়া করার কিছু নেই। নিজের অজান্তে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। প্লেটটা টেবিলে রেখে গিয়ে আলমারির দরজা খুললেন।

বাথরুম থেকে ফিরে এল কিশোর। অস্বস্তি বোধ করছে। এতদিন পর স্কুলে যাবে। কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছে তার। রবিন আর মুসাকে একটা ফোন করে দিলে হত না? স্কুলে ঢোকার সময় ওরা দুজন সঙ্গে থাকলে আড়ষ্টতা অনেকখানি কাটত। বেশি অস্বস্তি বোধ করছে সে অন্য কারণে–সবাই তাকে একটা প্রশ্নই করতে থাকবে: এতদিন কোথায় ছিল সে? জবাব দিতে পারবে না সে, জানা কথা। হয়তো পাগল ভাববে তাকে সহপাঠীরা। কি রকম চোখে তাকাবে।

তাকাকগে! আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে সব। অস্বস্তিটা জোর করে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল সে।

কাপড়গুলোর ওপর চোখ পড়তে হাসিটা স্থির হয়ে জমে গেল যেন তার মুখে। ওর সবুজ টী-শার্ট, নীল জিনস, টিভা স্যান্ডেল–এগুলো পরেই তো লেকের পারে ছবি তুলতে গিয়েছিল! মেরিচাচী কোথায় পেলেন? এর একটাই জবাব, লেকের পাড়ে পড়ে থাকার সময় ওর পরনে ছিল এগুলো। চাচী ধুয়ে, ইস্ত্রি করে রেখেছেন। আরেকটা রহস্য। নয় মাসে এত নতুন থাকল কি করে পোশাকগুলো? যেন মাত্র গতকাল পরে এসে খুলে রেখেছে!

অস্বস্তিটা ফিরে এল আবার। কোনমতে বলল, 'থ্যাংকস!'

অবাক চোখে তার দিকে তাকালেন চাচী। 'থ্যাংকস কিসের?'

'এই যে জামা-কাপড়গুলো ধুয়ে ইস্ত্রি করে রেখেছ।'

'সে তো সব সময়ই রাখি,' হাসি ফুটল চাচীর মুখে। 'এত ফরমাল হলি

কবে থেকে আবার? ভাল। বন্যতা যত তাড়াতাড়ি দূর হয় ততই ভাল।'

কিন্তু চাচীর কণ্ঠ শুনে মনে হলো না, কিশোরের অগোছালো বুনো স্বভাবটা দূর হয়ে গেলে তিনি খুশি হন। তিনি তাঁর 'ছেলেকে' ঠিক আগের মতই ফেরত চান।

'জলদি রেডি হয়ে নে,' চাচী বললেন। 'আমি বোরিসকে গাড়ি বের করতে বলিগে।'

বাথরুম থেকে দাঁত মেজে আসতে ভুলে গেছে কিশোর। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে বেসিনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে ঘষতে শুরু করল। কয়েক ঘষাতেই কাজ শেষ। বেশি ডলতে ভাল লাগে না তার। আয়নার দিকে তাকিয়ে দাঁতগুলো সব বের করে দেখল। কোনও পরিবর্তন নেই। তার আগের দাঁতগুলোই রয়েছে। তারমানে ভূতে বা ভিনগ্রহবাসীতে আসর করলেও তার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। একটা বিরাট স্বস্তি।

শার্ট গায়ে দিল সে। প্যান্টের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিল। গেল আটকে পা'টা। ঢোকানোর জন্যে একপায়ে লাফালাফি শুরু করল। ইস্ত্রি করা কাপড় পরার এই এক ঝামেলা। কোনখানে যে কখন আটকে যাবে কেউ বলতে পারে না। স্কুলের লকারের চাবিটা তুলতে গিয়ে বিছানার পাশের নাইটস্ট্যান্ডে একটা জিনিসের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল তার।

ওর নিজের নোটবুক। শেষ পাতাটা খোলা। একটামাত্র লাইন লেখা:

ওদের সবাইকে খুঁজে বের করো; বিফল হওয়া চলবে না।

বাক্যটার দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করতে থাকল সে। 'ওদের সবাই' মানে কারা? কাদের খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে? বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ওর। কিচ্ছু বুঝতে পারল না। তবে কেউ একজন তাকে এই নির্দেশ বা আদেশটা দিয়ে রেখেছে কোন সন্দেহ নেই তাতে।

এবং মজার ব্যাপারটা হলো, হাতের লেখাটা তার নিজের! কখন লিখেছে, মনে করতে পারল না।

রকি বীচ জুনিয়র হাই স্কুলের গেটের সামনে এনে গাড়ি থামালেন মেরিচাচী। হাতব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে নিজের হাতে কিশোরের এলোমেলো চুল আঁচড়ে দিলেন তিনি। হেসে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন, 'যা! অস্বস্তি লাগছে?'

'তা তো খানিকটা লাগছেই।'

'কি অবাক কাণ্ড, না? যে স্কুলটা বাড়ির চেয়ে বেশি পরিচিত ছিল তোর, সেখানে ঢুকতে এখন অস্বস্তি। সময় অনেক কিছু গোলমাল করে দেয়। যা, সমস্যা হবে না। দুদিনেই ঠিক হয়ে যাবে।'

কিশোর নেমে যেতে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন চাচী।

যে কারণে স্কুলে আসতে অস্বস্তি বোধ করছিল, সেটাই ঘটল। গেটের ভেতর ঢুকতেই ঘিরে ধরল তাকে সহপাঠীরা। গুড় দেখে ছেঁকে ধরল যেন মাছির ঝাঁক।

‘এতদিন পর স্কুলে ফিরতে কেমন লাগছে, কিশোর?’ প্রথম প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল নর্টন বার্মিং নামে একটা ছেলে।

‘গত নয়টা মাস কোথায় ছিলে?’ ক্যারোলিন নামে একটা মেয়ের প্রশ্ন।

তারপর একসঙ্গে হই-চই শুরু করে দিল সবাই। মেশিনগানের বুলেট বর্ষণের মত একনাগাড়ে শুরু হলো যেন প্রশ্ন-বর্ষণ।

‘যেখানে গিয়েছিলে সেখানে ডানা হিউগ্রিকে দেখেছ?’

‘ভিনগ্রহবাসীরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল নাকি তোমাকে?’

‘কে তোমাকে কিডন্যাপ করেছিল বলতে পারবে?’

‘নাকি সবটাই একটা ধাপ্পাবাজি?’

অসহায় বোধ করতে লাগল কিশোর। ইচ্ছে হলো, ঘুরে ছুটে পালায়। রক্ষা করল ভারী একটা হাত। কাঁধ চেপে ধরল হাতটা। ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিস্টার রবার্টসন। ‘এই, থামো তোমরা! পাগল করে দেবে নাকি ছেলেটাকে!’ ধমক দিতে গিয়ে নাকের ডগায় নেমে চলে আসা চশমাটা ঠেলে ওপরে তুলে দিলেন তিনি। ‘যাও, সরো!’

প্রিন্সিপাল স্যারের পেছনে মুসা আর রবিনকে দেখতে পেল কিশোর। ওদের কাছ থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে জিনা। বুঝতে পারল, ওরাই গিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে স্যারকে।

ধমক খেয়ে সরে গেল অতি উৎসাহী ছেলেমেয়ের দল। কিশোরকে ঘিরে দাঁড়াল মুসা, রবিন আর জিনা। প্রায় এসকর্ট করে নিয়ে গেল ক্লাসের ভেতরে।

সবই চেনা, অথচ কেমন যেন অচেনা। অদ্ভুত! ক্লাসের দেয়ালগুলোও সেই একই ডিজাইনের কাগজে মোড়া দেখতে পাচ্ছে। তবু এমন নতুন নতুন লাগছে কেন তার? নয় মাস পর এলেই কি কারও এমন লাগতে পারে? আসলে নিজের মধ্যে কোথায় যেন একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে, ধরতে পারছে না কিশোর।

ঘণ্টা বাজল। ক্লাস টিচার মিসেস গার্টরুড ঢুকলেন। ঢুকেই নজর পড়ল কিশোরের ওপর। ছোটখাট একজন মহিলা, গায়ে হালকা রঙের সোয়েটার, আন্তরিক কণ্ঠেই জিজ্ঞেস করলেন, ‘কেমন আছ, কিশোর?’

হাসিটাও তাঁর স্বাভাবিক।

কিন্তু কিশোরের মনে হলো, অস্বাভাবিক। কেন লাগছে এমন? সে নিজে বদলে গেছে বলেই কি? লক্ষ করল, চব্বিশজন ছেলেমেয়ে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। যেন মিসেস গার্টরুডের প্রশ্নের জবাবটা সকলেই শুনতে উৎসাহী।

কোনমতে জবাব দিল কিশোর, ‘ভাল।’ ভয়ে ভয়ে থাকল, এর পরের প্রশ্নটা না হয়: এতদিন কোথায় ছিলে?

কিন্তু সে-রকম কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না মিসেস গার্টরুড। পড়াতে শুরু করলেন।

ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়ল এক সময়। বেরিয়ে গেলেন মিসেস গার্টরুড।

‘রুটিন জানো তো?’ কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন। ‘ইংরেজি সাহিত্য

পড়ানো হবে এখন। মিস্টার মালভি...'

'তারমানে আগের রুটিন বদলায়নি?'

'না।

সোনালি-চুলের লম্বা একজন মানুষ মিস্টার মালভি। মুখ ভর্তি দাড়ি। অভিনেতা হার্ডি ফোর-এর মত দেখতে লাগে তাঁকে। ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড থেকে পড়াতে লাগলেন তিনি। গল্পটা হলো এক বিজ্ঞানীর—একটা ভয়ানক ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন যিনি, যেটা তাঁর ভেতরের মানুষটাকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলত। অর্ধেক সময় তিনি থাকতেন চমৎকার একজন ভদ্রলোক, বাকি অর্ধেক সময় দানব।

ঢোলা একটা আলখেল্লা পরে এসেছেন মিস্টার মালভি। মাথায় চূড়াওয়ালা হ্যাট। জেকিল অ্যান্ড হাইড পড়ানোর সময় বিশেষ আবহ সৃষ্টির জন্যেই এ রকম পোশাক পরেছেন কিনা কে জানে। হ্যাঁ, সেটাই করেছেন। কারণ কিছুটা পড়ার পর পকেট থেকে একটা মুখোশ বের করে মুখে লাগালেন তিনি। একপাশ স্বাভাবিক মানুষের, অন্যপাশ বিকৃত দানবের।

'বইটা অতি চমৎকার,' বলতে লাগলেন তিনি। 'সাধারণ হরর কাহিনী হিসেবেও পড়তে পারো, আবার প্রচুর চিন্তার খোরাকও পাবে এর মধ্যে।' মুখোশের ফুটোর ভেতর দিয়ে তার কথাগুলো কেমন বিকৃত হয়ে বেরোতে থাকল। 'গভীর ভাবে ভাবলে বুঝতে পারবে লেখক একই মানুষের দুই রূপ সৃষ্টি করে কি বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই দুটো সত্তা থাকে। একটা ভাল, একটা খারাপ। খারাপটাকে যতক্ষণ চেপে রাখতে পারবে, ভাল থাকবে, কিন্তু বেরোতে দিলেই সর্বনাশ করে ছাড়বে সে তোমার।'

বইয়ের পাতা উল্টে আবার জোরে জোরে পড়তে শুরু করলেন তিনি। গল্পটা সত্যি আকর্ষণীয়। বার বার পড়া থাকা সত্ত্বেও আবার তাতে ডুবে গেল কিশোর। কিন্তু বেশিক্ষণ মনঃসংযোগ করে রাখতে পারল না। বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে মন। মগজে এক ধরনের চাপ। মাথার মধ্যে কি হচ্ছে বুঝতে পারছে না।

জানালার বাইরে তাকাল। এপ্রিলের সুন্দর উষ্ণ দিন। স্কুলের কেয়ারটেকার মিস্টার অ্যাইজন লন পরিষ্কার করছে। রোদে চকচক করছে তার মস্ত টাকটা। বাতাসে ভেসে আসছে সদ্য কাটা ঘাস-পাতার গন্ধ। এর মাঝে মিস্টার মালভির কণ্ঠটা একঘেয়ে লাগছে।

বইয়ের দিকে মুখ ফেরাল কিশোর। চোখের সামনে সাঁতার কাটতে থাকল যেন ছাপার অক্ষরগুলো। মোটেও স্পষ্ট হতে চাইছে না।

মাথার মধ্যে বাড়ছে চাপটা।

একটা লাইনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আবছা হয়ে রইল লাইনটা। তারপর স্পষ্ট হতে শুরু করল। কিন্তু এ-কি লেখা! এ তো জেকিল অ্যান্ড হাইড়ের কথা নয়। লেখা রয়েছে:

ওদের সবাইকে খুঁজে বের করো; বিফল হওয়া চলবে না।

ছয়

এতটাই চমকে গেল কিশোর, আরেকটু হলেই খাড়া হয়ে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে সামলে নিল নিজেকে। চারপাশে তাকাল। সবাই এখন স্বাভাবিক। পড়ায় মগ্ন। এমনকি জিনা, রবিন আর মুসাও তাকাচ্ছে না তার দিকে।

আবার বইয়ের পাতায় মুখ নামাল কিশোর। অদ্ভুত বাক্যটা গায়েব। সে নিজেও এখন স্বাভাবিক লেখা দেখতে পাচ্ছে। জেকিল অ্যান্ড হাইডের লেখা।

নানা রকম সম্ভাবনা মাথায় ঢুকতে আরম্ভ করল কিশোরের। বইটা, বিশেষ করে তার নিজের বইটা কোনও ধরনের 'ম্যাজিক আই'তে ছাপা বই হতে পারে, যেগুলোর লেখার দিকে একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেলে তাকালে ত্রিমাত্রিক লেখা ফুটে ওঠে, ভিন্ন কিছু দেখা যায়। এদিক থেকে ওদিক থেকে, এ ভঙ্গিতে, সে-ভঙ্গিতে, নানা ভাবে দেখতে লাগল পাতাটা। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর সেই অদ্ভুত বাক্যটা ফুটল না বইয়ের পাতায়।

আবার বাইরে তাকাল কিশোর। সেই একই ভাবে একমনে ঘাস কেটে চলেছে মিস্টার অ্যাইজন।

ঘণ্টা পড়ল অবশেষে।

স্বাভাবিকভাবেই শেষ হলো ক্লাসটা। সবার জন্যে স্বাভাবিক। কিশোরের জন্যে নয়। অদ্ভুত একটা বাক্য দেখতে পেয়েছে সে বইয়ের পাতায়, যা আর কেউ দেখেনি। পাগল ভাবতে পারে ওকে, সে-জন্যে রবিন, মুসা বা জিনাকেও জানাল না কথাটা।

'বাবাগো!' ক্যাফিটেরিয়ার টেবিলে বসতে বসতে আচমকা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল ট্যাবি সুজান। 'আমাকে ধরে ফেলেছে গো! নিয়ে যাচ্ছে, ধরে নিয়ে যাচ্ছে! ভিনগ্রহের দানবে!'

পা দিয়ে ওর চেয়ারটা আলতো করে সরিয়ে দিল টেরিয়ার ডয়েল। মেঝেতে পড়ে গেল ট্যাবি। চিত হয়ে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল। কিছু একটা ধরে ওঠার চেষ্টা করছে। হাতে ঠেকল কেবল তার গলায় ঝোলানো থার্মোস ফ্লাস্কটা, যেটাতে মুরগীর স্যুপ ভরে নিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে টিফিনে খাওয়ার জন্যে।

খিকখিক করে হাসতে লাগল টেরি। 'থার্মোসটাই তোমার ভিনগ্রহের দানব, না ট্যাবি?'

ভাইয়ের বিরুদ্ধে টেরির সঙ্গে তাল দিতে লাগল ট্যাবির আপন যমজ ভাই ক্যাবি। সে-ও একই ভঙ্গিতে হেসে ভাইকে ইয়ার্কি মারল, 'চুপ, চুপ, ছুঁচো

কোথাকার! ভেন্নারা শুনে ফেললে সর্বনাশ হবে!' আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকাল সে। কিশোর, মুসা আর রবিন এক টেবিলে বসেছে। জিনা ওদের সঙ্গে নেই। বেশ খানিকটা দূরে দুটো মেয়ের সঙ্গে বসেছে। কিশোরদের পাশের টেবিলে বসেছে ট্যাবি-ক্যাবি আর টেরি। 'আজকাল কতজনকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে ভেন্নারা,' ক্যাবি বলল। ভিনগ্রহবাসীর সংক্ষিপ্ত নাম দিয়েছে ক্যাবি 'ভেন্না'।

আপন ভাই হলেও ট্যাবি আর ক্যাবি দুজন দুজনকে দেখতে পারে না। বহুকাল ধরে আছে ওরা রকি বীচ হাই স্কুলে। কিন্তু কোনদিন কোন ব্যাপারে ওদের একমত হতে দেখেনি কিশোর। ঝগড়া করতে করতে এমন পর্যায়ে চলে যায় শেষে কোন একজন স্যারকে এসে কলার চেপে দুই ভাইকে টেনে ছাড়াতে হয়। দুজন দুজনকে ঘৃণাও করে, আবার কোন্ রহস্যময় কারণে একজনের কাছ থেকে বেশি দূরেও যায় না আরেকজন। এক রকম চেহারা, এক রকম পোশাক পরে, এক ধরনের চুলের ছাঁট, একই ছবি একসঙ্গে দেখতে যায়, সিনেমা দেখার চেয়ে সিনেমার কাহিনী নিয়ে তর্ক করে বেশি, ঝগড়া করতে করতে সীটময় পপকর্ন ছিটায়; কোনভাবেই একমত হতে পারে না কাহিনীটা ভাল, না মন্দ।

'ছুঁচো কাকে বলছ?' ভুরু নাচিয়ে ভাইকে জিজ্ঞেস করল ট্যাবি।

'আহ্, থামো তো তোমরা!' ধমক লাগাল টেরি। 'নিজেরাই যদি ঝগড়া করতে থাকো, অন্যের কথা শুনবে কখন?' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'তারপর, কিশোর, স্কুলে প্রথম দিনটা কেমন লাগছে?'

অবাক কাণ্ড। কিশোরকে টিকটিকি, ছুঁচো বা বাচ্চা শার্লক জাতীয় ব্যঙ্গ করল না আজ টেরি। নিশ্চয় কোন মতলব আছে। কায়দা করে প্রশ্ন করে হয়তো জেনে নিতে চায় গত নয়টা মাস কিশোর কোথায় ছিল।

'ভাল,' জবাব দিল কিশোর। একটু আগে বইয়ের পাতায় দেখা বিচিত্র বাক্যটা কাঁপিয়ে দিয়েছে তাকে, ভুলতে পারছে না। টেরি বা দুই যমজ ভাইয়ের কাণ্ডকারখানা বিশেষ লক্ষ করছে না সে।

'আচ্ছা,' শান্তকণ্ঠে যেন কথার কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে টেরি বলল, 'মিস্টার মালভির ক্লাসটা কেমন লাগল তোমার? মালভিকে একটা ভাঁড় মনে হয়নি? জেকিল অ্যান্ড হাইড পড়াতে এলে এমন ভাঁড় সেজে আসার কি কোন প্রয়োজন ছিল?'

'অ্যাঁ!'

'অকারণে কিশোরকে বিরক্ত করছ তুমি, শুঁটকি,' বাধা দিল মুসা।

'ওমা, বিরক্ত করলাম কোথায়? ঠিক আছে, অত ভান-ভণিতার মধ্যে না গিয়ে আসল কথাটা জিজ্ঞেস করে ফেলা যাক।' কিশোরের দিকে তাকাল টেরি। 'কিশোর, আশা করি কিছু মনে করবে না তুমি?'

'না,' কি প্রশ্ন করতে চায় বুঝে গেছে কিশোর। 'কিন্তু টেরি, সত্যি বলছি, আমি কিছু মনে করতে পারছি না। আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে।'

'বেশ,' ট্যাবি বলল, 'অন্য কথা আলোচনা করা যাক।' কিশোরের দিকে

তাকাল সে। 'অনেক দিন পর তো এলে। তোমার চোখে অন্য রকম লাগার কথা। আমার ভাই ক্যাবিকে কেমন দেখছ? এতদিনে পাগল হওয়াটা সম্পূর্ণ হয়েছে ওর, তাই না?'

'চুপ!' চিৎকার করে ট্যাবির বাহুতে ঘুসি মারল ক্যাবি।

'অ্যাই, থামবে তোমরা!' আবার ধমক লাগাল টেরি। তারপর দুই হাতে কপাল টিপে ধরে বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল, 'আসলে, আমার বিশ্বাস, কোন ধরনের ওয়ার্মহোলে ঢুকে গিয়েছিল কিশোর।'

'কি হোল?' জিজ্ঞেস না করে পারল না কিশোর।

'মহাকাশের এক ধরনের সুড়ঙ্গ। যেটার মুখটা কোনভাবে তোমার সামনে পড়ে গিয়েছিল। ঢুকে পড়েছিলে তুমি। অনেকটা ফানেলের মত। প্রথমে তীব্র আলোর ঝিলিক দেখে মানুষ। তারপর অন্ধকার। কেন, সিনেমায় দেখনি?'

ভুরু কুঁচকে টেরির দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।

'তোমায় বেলায় কি ঘটেছিল এ রকম কিছু?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আবার টেরি।

'ঘটেছিল,' অস্বীকার করল না আর কিশোর। টেরির কথা কৌতূহল জাগিয়েছে তার।

'হুঁ, বললাম না,' মহাবিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল টেরি, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চোখ। 'ওয়ার্মহোলের একেবারে মুখের কাছে চলে গিয়েছিলে তুমি। এক ধরনের সময়-সুড়ঙ্গ ওগুলো। মুহূর্তে যে কোন সময়ে, যে কোন জায়গায় নিয়ে চলে যেতে পারে। বুঝতে পারছি, মহাকাশ থেকে একটা সময়-সুড়ঙ্গ সেদিন নেমে চলে এসেছিল লেকের ওপর। ওটা তোমাকে গিলে ফেলেছিল। নিয়ে গিয়েছিল মহাবিশ্বের কোন নিউট্রাল জোনে, সময় যেখানে স্থির কিংবা অনেক বেশি দীর্ঘ, পৃথিবীর সময়ের তুলনায়। হয়তো কয়েক সেকেন্ড ছিলে তুমি সেখানে, যা পৃথিবীর সময়ের হিসেবে নয় মাস। সুড়ঙ্গটা তোমাকে গিলে নিয়েছিল, কয়েক সেকেন্ড রেখে আবার উগরে দিয়েছিল—নয় মাস পার হয়ে গেছে ততদিনে। উগরে দেয়ার পর মেইনটেন্যান্স ম্যানেরা তোমাকে খুঁজে পেয়েছে লেকের কিনারে।'

টেরির দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাল কিশোর। সিনেমা দেখেই বলুক, আর যে ভাবেই বলুক, বড় বিশ্বাসযোগ্য করে বলছে টেরি—বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে কিশোরের। টেরির যুক্তিটা গ্রহণযোগ্য। ধীরে ধীরে বলল, 'তোমার কথা বিশ্বাস করে ফেলতে ইচ্ছে করছে আমার, টেরি। যে ভাবে বলছ, ঘটনাটা যদ্দূর মনে পড়ে ওভাবেই কিন্তু ঘটেছে। আলো দেখলাম। তারপর অন্ধকার। তারপর দেখি হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি।...কিন্তু তুমি জানলে কি করে এত কথা?'

ফিকফিক করে হাসল টেরি। 'মনে হচ্ছে নতুন এলে রকি বীচে? এখানে যে বাতাসের আগে কথা ছড়ায়, ভুলে গেছ? ওহ্হো, ভুলে তো যাবেই। তোমার তো আবার মেমরি ঠিকমত কাজ করছে না।'

টেরির বড় বড় কথা সহ্য করতে পারল না আর রবিন। 'সুড়ঙ্গটা উগরে

দেয়ার পর ব্যথা পেল না কেন কিশোর?'

'ওয়ার্মহোলের মুখটা নিশ্চয় একেবারে মাটি ঘেঁষে ছিল। ফানেলের মুখের মত উপুড় হয়ে।'

'তাহলে শুধু কিশোরকেই শুষে নিল কেন? তোমার কথায় মনে হচ্ছে সুড়ঙ্গটার শোষণ ক্ষমতা রয়েছে। লেকের পানিও সেই টানে উঠে যাওয়ার কথা।'

'হয়তো শুধু প্রাণীই সংগ্রহ করে ওই সুড়ঙ্গ।'

'ভাল কথা,' মুসা বলল, 'তাহলে লেকের অন্য প্রাণীগুলো রয়ে গেল কিভাবে? গাছপালার কথা নাহয় বাদই দিলাম। পোকা-মাকড়, ব্যাঙ, সাপ, আরও কত ধরনের প্রাণী ছিল। ওগুলো? গায়েব হলো না কেন?'

'হয়তো হয়েছে,' দমল না টেরি। 'কে গুণে দেখতে গেছে লেকের ক'টা প্রাণী অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল?'

চোখা যুক্তি। জবাব দিতে পারল না মুসা।

'বুঝলাম,' রবিন দমল না, 'পোকা-মাকড় হারালেও বোঝার কোন উপায় নেই। কিন্তু সুড়ঙ্গটা হঠাৎ করে একেবারে কিশোরের গায়ের ওপর এসে খুলতে গেল কেন? আর জায়গা পেল না?'

এতক্ষণে কোণঠাসা হলো টেরি। দুই হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে রইল। জবাব খুঁজে পাচ্ছে না।

চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে রবিন।

একটা মেয়েকে আসতে দেখা গেল এ সময়। মেয়েটার লম্বা বাদামী চুল পিঠের ওপর নাচছে হাঁটার তালে তালে। পরনে কালো জিনস, পায়ে কালো কমব্যাট বুট, গায়ে কালো টি-শার্ট। খুব সুন্দরী। কাঁধে ঝোলানো বিশাল একটা কালো ব্যাকপ্যাক। রিটা গোল্ডবার্গ।

'তাকিও না,' ফিসফিস করে কিশোরকে বলল মুসা। মুসার কণ্ঠে খানিকটা ভয়ের ছোঁয়াও লক্ষ করল কিশোর। 'ডাইনী রিটা!'

রিটার যে নতুন খেতাব হয়েছে, জানা ছিল না কিশোরের। নয় মাসে আর কি বদলেছে? কি কি নতুন ঘটনা ঘটেছে?

'ও আবার ডাইনী হলো কবে থেকে?' জানতে চাইল কিশোর।

'হয়েছে! অদ্ভুত ক্ষমতা এসে গেছে ওর মধ্যে,' মুসা জানাল। 'বিস্ময়কর। সবাই এখন ডাইনী ভাবে ওকে।'

রবিন আর মুসার নজর রিটার দিকে। কিন্তু ট্যাবি তাকাল না সেদিকে। ভাইকে খোঁচানোর জন্যে টেরিকে বলল, 'আর একটা প্রশ্ন আছে আমার, প্রফেসর ডয়েল?'

'কি?' ভারিক্কি চালে ভুরু নাচাল টেরি।

'আচ্ছা, বলুন তো, প্রফেসর সাহেব, ক্যাবির গায়ে এত দুর্গন্ধ কেন?'

বাঘের মত ঝাঁপ দিল ক্যাবি। ট্যাবির কোলে রাখা আধখাওয়া দুধের প্যাকেটটা উল্টে ফেলে দিয়ে ভিজিয়ে দিল তার জামা-কাপড়। বেধে গেল মারামারি। ওদের থামানো এখন আর টেরির কর্ম নয়, বুঝে মানে মানে উঠে

কেটে পড়ল সে।

কিশোরের সামনে এসে দাঁড়াল রিটা। 'কিশোর, তোমার ফোন। জরুরী। আসবে আমার সঙ্গে?'

'আমার ফোন!' ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর। 'কে করল?'

'জানি না।'

মুসার চোখে সন্দেহ। চোখ টিপল কিশোরকে, অর্থাৎ যেও না। কিন্তু শুনল না কিশোর। রিটা সম্পর্কে এমনিতেই কৌতূহল বেড়ে গেছে তার। কথা বলার সুযোগ যখন পেয়েছে, ছাড়বে না। তা ছাড়া ফোনটা কার সেটাও দেখে আসা দরকার। রবিন আর মুসাকে ট্যাবি-ক্যাবির ঝগড়া থামাতে বলে উঠে দাঁড়াল সে।

সাত

রিটার পিছু পিছু ক্যাফিটেরিয়া থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। ছাত্রদের বেশির ভাগই লাঞ্চ করছে। বাইরে একা গাছের ছায়ায় বসে গল্পের বই পড়ছে দু'একজন, কিংবা দু'চারজন একসঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছে। কিশোরের প্রতি প্রাথমিক কৌতূহলটা সকাল বেলাতেই মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে সবার। এখন আর বিশেষ তাকাচ্ছে না ওর দিকে। তাতে স্বস্তি বোধ করছে কিশোর।

রিটার পিছু পিছু হলওয়ে ধরে এগোল। নির্জন হলওয়ে। কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল রিটা। ঘুরে তাকাল।

'কই, ফোন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ফোনের কথা না বললে উঠে আসতে না তুমি। মুসাও তোমাকে আসতে দিত না।'

গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'তারমানে মিথ্যে কথা বলে ডেকে এনেছ। কেন?'

'কারণ আছে। খুব জরুরী। তোমাকে শুনতেই হবে।'

'আমার মাথা সত্যি খারাপ হয়েছে কিনা জানার জন্যে ডেকে এনেছ নাকি? না নয়টা মাস কোথায় ছিলাম সেটা নিয়ে খোঁচানো আরম্ভ করবে?'

হাসল না রিটা। সিরিয়াস। গম্ভীর করে রেখেছে মুখের ভঙ্গি। 'না, তোমার মাথা খারাপ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই আমার। বরং আমার ধারণা, আমি জানি তোমার কি হয়েছে।'

'তুমি জানো!'

'হ্যাঁ, জানি,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রিটা। 'কিশোর, সত্যি সত্যি অদ্ভুত কিছু ঘটছে আমাদের এই শহরটায়। তুমি চলে যাওয়ার পর কত কিছু যে ঘটে গেছে, জানলে সত্যি সত্যি মাথা খারাপ হয়ে যেতে চাইবে তোমার! কিছু একটা ঘটছে এখানে। পুলিশ জানে না, নাগরিকদের বেশির ভাগই জানে

না, তোমার বন্ধু মুসা আর রবিনও জানে না; জানি মাত্র আমরা কয়েকজন। তাদের মধ্যে একজন ছিল ডানা। সে তো তোমার মতই রহস্যজনকভাবে গায়েব হয়ে গেল। তোমার ভাগ্য ভাল ফিরে এসেছ, ও আসেনি।'

টেরির ওয়ার্মহোল বা সময়-সুড়ঙ্গের কথাটা চট করে খেলে গেল কিশোরের মগজে। কৌতূহল আর উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বস্তিও বোধ করল—যাক, একজন অন্তত ভাবছে না ওর মাথা খারাপ হয়েছে।

মাথার মধ্যে সেই বিচিত্র চাপটা ফিরে এল তার। রিটার দিকে তাকাতেই চাপটা বাড়ল আরও। কানের কাছে, নাকি মগজের মধ্যে কে জানে!—ফিসফিস করে যেন বলতে লাগল একটা পরিচিত কণ্ঠ: ওদের সবাইকে খুঁজে বের করো; বিফল হওয়া চলবে না! পরিচিত কণ্ঠ, অথচ চিনতে পারছে না। এ কোন ভয়াবহ সমস্যার মধ্যে পড়ল সে!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনে দাঁড়ানো রিটাকে লক্ষ করতে লাগল সে। মনে পড়ল, ওদের ছবি সাঁটানো দেখেছে তার চাচার খসড়া ডায়রিবুকে। আশ্চর্য! রিটার ছবিও দেখেছে। অথচ গতরাতে মাথা ঘামায়নি ব্যাপারটা নিয়ে। ঘামানোর অবস্থাও অবশ্য ছিল না পুরোপুরি। কিন্তু এখন বড় আশ্চর্য লাগছে।

'ডানার কি হয়েছে, বলতে পারো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হয়তো পারি। তোমার কি হয়েছে, তা-ও আন্দাজ করতে পারি।'

'কি হয়েছে?'

'শুনলে চমকে যাবে। বিশ্বাসই করতে চাইবে না।'

'চমকালে চমকাব। তবু সত্যি কথাটা জানতে চাই আমি। যদি পাগল হয়ে গিয়ে থাকি, তা-ও নির্দ্বিধায় বলতে পারো।'

'না, পাগল তুমি হওনি। আচ্ছা, ডানার বাবা যে নয় বছর আগে রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, মনে আছে?'

'আছে। জুলাইয়ের পাঁচ তারিখে।'

হাসি ফুটল রিটার মুখে। 'এই যে প্রমাণ করে দিলে তুমি পাগল হওনি, স্মৃতিশক্তিও নষ্ট হয়নি তোমার।'

'কিন্তু তাতে কি?' ভুরু নাচাল কিশোর।

'আমার মা-ও গায়েব হয়ে গিয়েছিল ওই একই দিনে,' রিটা বলল। 'মনে পড়ে?'

'পড়ে। কিন্তু এর মধ্যে রহস্যটা কোনখানে? এতবড় আমেরিকায় বহু জায়গা থেকে প্রতিদিন বহু মানুষ গায়েব হচ্ছে, নানা কারণে। তুমি কি বলতে চাও বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে যে ভাবে মানুষ, প্লেন, জাহাজ গায়েব হয়ে যায়, তোমার আম্মা আর ডানার বাবাও ওভাবে গায়েব হয়ে গেছেন?'

'অনেকটা ওই রকমই। হাসির কিছু নেই এতে। আমি, সিরিয়াস, কিশোর।'

জবাব খুঁজে না পেয়ে চুপ হয়ে গেল কিশোর।

'গত নয়টা মাস, তুমি আর ডানা গায়েব হওয়ার পর থেকে অনেক ভেবেছি আমি। যতই ভেবেছি, ততই শিওর হয়েছি। হতে পারতাম না, যদি

আমার মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তনটা টের না পেতাম।'

পরিবর্তন শুনে কান খাড়া করল কিশোর। তার নিজের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে, যেটা ধরতে পারছে না সে। 'কি পরিবর্তন?'

'ভয়ঙ্কর এক ক্ষমতা!' বলেই আচমকা প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দিল রিটা, 'কিশোর, ইদানীং তোমার মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন টের পাচ্ছ? এই যেমন হঠাৎ মাথা ধরে যাওয়া, মাথা ঘুরে ওঠা, কিংবা অন্য কোন ধরনের অনুভূতি আগে যেটা ছিল না?'

প্রশ্নটা প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল যেন কিশোরকে। 'না, তেমন কিছু না, তবে মাঝে মাঝে মাথার ভেতরে একটা চাপ…'

বলতে না বলতে চাপটা ফিরে এসেছে। মাথা ঝাড়া দিতে লাগল কিশোর।

'কোন সাংঘাতিক ক্ষমতা?' জিজ্ঞেস করল রিটা।

'যেমন?'

'যেমন! অতিলৌকিক কোন ক্ষমতা। মানুষের যেটা থাকে না।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিশোর, 'নাহ্। তেমন কোন ক্ষমতা জন্মায়নি আমার মধ্যে। বরং তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ভুল শুনছি আমি। হয় মানসিক রোগের ডাক্তার দেখানো উচিত আমার, নয়তো তোমার। মনে হচ্ছে তোমার মগজেও গোলমাল হয়ে গেছে।'

'না, গোলমাল হয়নি। কি হয়েছে, জানতে চাও?'

'সেটাই তো চাইছি! এত ভূমিকা করছ কেন? বলে ফেলো না যা জানো!'

দ্বিধা করতে লাগল রিটা। তারপর বলল, 'নয়টা মাস তুমি গায়েব ছিলে, এ কথা তো সত্যি? আকাশে বিচিত্র আলো দেখেছিলে। তারপর অন্ধকার। কোথায় চলে গিয়েছিলে বলে তোমার বিশ্বাস?'

'কে-কেউ আমাকে কিডন্যাপ করেছিল…'

'কিডন্যাপ করেছিল। ঠিক। কিন্তু জিম্মি করে টাকা দাবী করতে এল না কেন? ফেলে রেখে গেল কেন আবার লেকের পাড়েই, অন্য কোনখানে নয় কেন? ভেবেছ এ সব কথা?…চুপ করে আছ কেন? বলো! জবাব দাও এ সব প্রশ্নের!'

'তুমি কি বলতে চাইছ ভিনগ্রহবাসীরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে?' নিচের ঠোঁট কামড়াতে শুরু করেছে কিশোর। 'তাহলে আমার মনে থাকত। মনে থাকত, নয় মাস ইউ এফ ও-র ভেতরে ছিলাম আমি। ভিনগ্রহবাসীদের চেহারা, মহাকাশযানের ভেতরটা—সব মনে থাকত।'

মাথার মধ্যের চাপটা ভোঁতা একটা দপদপানিতে রূপ নিয়েছে ওর।

'তোমার কেন মনে নেই, সেটা অন্য প্রশ্ন, কিশোর,' রিটা বলল। 'কিন্তু ডানাকে নিজের চোখে তুলে নিয়ে যেতে দেখেছি। একটা ইউ এফ ও-তে করে তুলে নিয়ে গেছে। ওই লেকের পাড় থেকেই। একেবারে সজাগ ছিলাম আমি। স্পষ্ট দেখেছি। চোখের ভুল বলতে পারবে না কোনমতেই।'

'তারমানে, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া ডানার বাবা সুযোগ মত ফিরে

এসে তাকে তুলে নিয়ে গেছে?' কণ্ঠস্বরের ব্যঙ্গের সুর ইচ্ছে করেই চাপতে গেল না কিশোর। রিটার দিকে তাকাল সে। 'তোমার মা-ও তারমানে ভিনগ্রহের মানুষ। একদিন হয়তো তোমাকেও তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি? আমার বাবা-মা এই পৃথিবীর মানুষ ছিল, একবিন্দু সন্দেহ নেই তাতে। আমাদের পেছনে লাগল কেন ভিনগ্রহবাসীরা?'

'তোমার ব্যাপারটা সম্ভবত কাকতালীয়। লেকের পাড়ে ছবি তুলতে গিয়ে ভিনগ্রহবাসীদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলে। তোমার মত বুদ্ধিমান একজন মানুষকে হাতের কাছে পেয়ে গিয়ে ছাড়তে চায়নি ওরা, নিশ্চয় কাজে লাগাতে চাইছে। তবে ডানা বা আমি যে গ্রহের মানুষ, সে-গ্রহের লোক নয় ওরা। ভূতে যে ভাবে আসর করে, ঠিক সে-ভাবে আসর করেছে তোমার ওপর।'

রাফির উদ্ভট আচরণের কথা মনে পড়ল কিশোরের। তারপরেও মানতে চাইল না রিটার কথা। 'না হেসে আর পারলাম না, বুঝলে,' জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। 'আমার ওপর কিসে আসর করেছে জানি না, তবে তোমার যে মাথায় গোলমাল হয়ে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই আর আমার। যাও, এখনও সময় আছে, ভাল কোন মানসিক রোগের ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাওগে।'

হতাশ ভঙ্গিতে দুই হাত উল্টে দিয়ে রিটা বলল, 'জানতাম, তোমাকে বিশ্বাস করানো এত সহজ হবে না!'

'করব, যদি প্রমাণ দিতে পারো।'

প্রমাণ! তাই তো! উজ্জ্বল হলো রিটার মুখ। দ্রুতহাতে ব্যাকপ্যাকটা খুলে নিল কাঁধ থেকে। বড় একটা সেফটিপিন বের করে বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে। 'নাও। আঙুল বা শরীরের যেখানে ইচ্ছে ফুটো করে ফেলো। রক্ত বের করো। রক্তের রঙটা দেখো খালি। তাহলেই বুঝবে আমার কথা ঠিক কিনা। যদি দেখো লাল, তাহলে তুমি আমাদের দলে নও। তোমাকে সিলেক্ট করেনি ভিনগ্রহবাসীরা। আর যদি দেখো…'

মাথার মধ্যে চাপা দপদপানিটা তীব্র ব্যথায় রূপ নিয়েছে কিশোরের। কষ্ট হচ্ছে এখন খুব। সেই কথাটা মগজে বেজে চলল একনাগাড়ে: ওদের সবাইকে খুঁজে বের করো; বিফল হওয়া চলবে না!

মাথায় হাত দিলেই যেন ছুঁতে পারবে কণ্ঠের মালিককে।

পিনটা কিশোরের হাতে গুঁজে দিল রিটা। 'নাও। ফুটো করো। প্রমাণ হয়ে যাক।'

হাতের তালুতে রাখা পিনটার দিকে তাকাল কিশোর। পাগলামি মনে হচ্ছে। কিন্তু কৌতূহলও দমাতে পারছে না। তা ছাড়া রিটার অনেক কথা তার সন্দেহের সঙ্গে মিলে গেছে। যদিও স্বীকার করেনি।

'বেশ,' বলে সেফটিপিনটা তুলে নিয়ে চোখা মাথাটা বুড়ো আঙুলের মাথায় চেপে ধরতে গেল কিশোর।

করিডরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। মোড়ের ওপাশ থেকে ভেসে এল একটা কর্কশ কণ্ঠ, 'এই, কে কথা বলে? কোথায় তোমরা?'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রিটা। 'মিসেস জাঞ্জিবার। টহলে বেরিয়েছে। দেখে ফেললে আর রক্ষা নেই।'

দৌড়ে পালাল সে।

দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। নয় মাস ধরে স্কুলে অভ্যস্ত নয়। নাকি আর কোন কারণ আছে কে জানে! দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল সে। ছুটে পালানোর কথা মাথায় এল না।

মোড় ঘুরে বেরিয়ে এলেন মিসেস জাঞ্জিবার। ভারী শরীর। কালো চুলগুলো বনরুটির মত চূড়ো করে বেঁধেছেন। আড়ালে ছাত্ররা রসিকতা করে তাঁকে নিয়ে। বলে মিসেস জাঞ্জিবারকে দেখলে মনে হয় শুধু বাঁদর নয়, আমাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে গরুর জিনও ছিল।

এ মুহূর্তে মিসেস জাঞ্জিবারের দিকে তাকিয়ে কিশোরেরও সে-রকমই মনে হলো। যদিও ভাবনার সুযোগ পেল না। কালো কাঁচের চশমার ভেতর দিকে তাকিয়ে কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি করছ? পাস আছে?'

'না,' ঢোক গিলল কিশোর। 'আমি···' হাত পেছনে নিয়ে গেছে, যাতে সেফটিপিনটা মিসেস জাঞ্জিবারের চোখে না পড়ে। 'চাচীর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। শরীরটা ভাল লাগছে না,' দেয়ালে ঝোলানো ফোনটা দেখাল সে। 'চাচীকে ফোন করে দিয়েছি, এসে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

সন্দেহ ফুটল মিসেস জাঞ্জিবারের চেহারায়।

'নয় মাস ধরে গায়েব ছিলাম আমি, ম্যা'ম,' তাড়াতাড়ি বলল আবার কিশোর। 'আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি, কিশোর পাশা।'

'ও, কিশোর পাশা!' মাথা ঝাঁকালেন মিসেস জাঞ্জিবার। নরম হলো চেহারা। 'এখানে না দাঁড়িয়ে থেকে নার্সের অফিসে চলে গেলে না কেন? বসতে পারতে। শুয়েও থাকতে পারতে।'

'না, অতটা খারাপ এখনও হয়নি···এখানেই থাকতে পারব···'

বুড়ো আঙুল ফুটো হওয়ার ব্যথা টের পেল কিশোর। লুকিয়ে রাখতে গিয়ে চোখা মাথাটার খোঁচা লেগে গেছে চামড়ায়। সহ্য করে গেল। শব্দ করল না। তাহলে নতুন কৈফিয়ত দিতে হবে মিসেস জাঞ্জিবারকে। যে ভাবে ছিল হাতটা, সেভাবেই রাখল। সরিয়ে আনল না।

'ঠিক আছে, আমিও দাঁড়াচ্ছি তোমার সঙ্গে,' অবশেষে কাঁধ ঢিল করলেন মিসেস জাঞ্জিবার। 'বলা যায় না, যদি বেহুঁশ-টেহুঁশ হয়ে যাও।'

'না না, তা হব না!' বিদেয় করার জন্যে বলল কিশোর, 'চাচী কখন আসবে ঠিক নেই কিছু। আপনি চলে যান। বেশি খারাপ লাগলে আমি বরং নার্সের অফিসে চলে যাব।'

'কোন অসুবিধে নেই,' মিসেস জাঞ্জিবার বললেন। 'আপাতত কোন ক্লাস নেই আমার। সেভেন্থ পিরিয়ড পর্যন্ত ফ্রি।'

মনে মনে নিজেকে গালাগাল করতে লাগল কিশোর। চাচীকে ফোন করেনি। ইস্, কেন যে মিথ্যে বলতে গেল! 'করেছে' না বলে 'করতে এসেছে' বললে এই বিপদে পড়া লাগত না এখন। অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে

আর এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন আশা নেই। শাস্তি আজ তাকে পেতেই হবে।

অলৌকিক ঘটনাই ঘটল। হঠাৎ হলের শেষ মাথার একটা দরজা খুলে গেল। পার্কিং লটের দিক থেকে ঢুকলেন মেরিচাচী। হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিশোর। বিশ্বাস করতে পারছে না।

কাছে এসে বললেন, 'এখানে কেন? খারাপ লাগছে তোর? আমি সামনের দিকে খুঁজে এলাম। রবিন আর মুসা বলল...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খারাপই লাগছে,' জবাব দিলেন মিসেস জাঞ্জিবার। 'সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি ওকে নিয়ে। আমার নাম মিসেস জাঞ্জিবার। স্প্যানিশ পড়াই।'

'আমি মিসেস মারিয়া পাশা,' হাত বাড়িয়ে দিলেন মেরিচাচী। 'আরও আগেই চলে আসা উচিত ছিল আমার। অসুস্থ ছেলেটাকে রেখে গেছি...বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছিল...স্কুল শেষ হওয়ার আগেই তাই...'

ফোনের কথা উঠে পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'চাচী, চলো। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।'

'তোর বইপত্র কোথায়?'

'লকারে। ওগুলো আজ আর দরকার হবে না। হোম ওঅর্ক নেই।'

'ও। চল্ তাহলে।'

মিসেস জাঞ্জিবারকে ধন্যবাদ দিয়ে চাচীর সঙ্গে পা বাড়াল কিশোর।

পার্কিং লটে বেরোনোর আগে হাতটা সামনে আনল না।

রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। শুকিয়ে লেগে আছে আঙুলে। চড়চড় করছে। রঙটা দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল কিশোর।

রক্তের রঙ রূপালী।

আট

'কেমন কাটল স্কুলে?' চাচী জিজ্ঞেস করলেন। শহরতলীর দিকে চলেছেন।

'ভালই,' জবাব দিল কিশোর।

'একজন ডাক্তারের খোঁজ পেয়েছি, মানসিক রোগের ডাক্তার, হিপনোটিজমে বিশেষজ্ঞ। খোঁজ দিয়েছেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। তাঁর ধারণা, সম্মোহিত করে ডাক্তার তোর মগজ থেকে বের করে আনতে পারবে ন'টা মাস তুই কোথায় ছিলি, কি করছিলি।'

কিশোরকে জবাব দিতে না দেখে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন চাচী। চোখে উদ্বেগ। 'তোর কি খারাপ লাগছে এখনও?'

লাগছে, কিন্তু স্বীকার করল না কিশোর। বহু কথা ঘুরপাক খাচ্ছে মগজে। সম্মোহনের কথা শুনে দুশ্চিন্তাটা বেড়েছে। ঘোরের মধ্যে ডাক্তারকে যদি বলে

দেয় রূপালী রক্তের কথা? মহা অনর্থ ঘটে যেতে পারে। দেখা যাবে, হয়তো এরপর জেগে উঠেছে সে কোন সরকারী গোপন তদন্ত সংস্থার হাসপাতাল বেডে, এক্স-ফাইল এজেন্টরা হুমড়ি খেয়ে আছে তার ওপর; গিনিপিগের মত তার মগজ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন ডাক্তাররা, বড় বড় অসংখ্য সুচ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে তার মাথায়।

নয় মাসের খোঁজ জানাটা খুবই জরুরী, কৌতূহলে ফাটছে সে জানার জন্যে, কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে না সাপ বেরোয়! যদি বেরিয়ে আসে ভয়ঙ্কর কোন সত্য?

আসে আসুক! মনকে বোঝাল সে। সব জানা দরকার। অন্ধকারে থাকার চেয়ে ভাল।

রিটার মগজ-গোলানো গল্পটার কথাও মনে পড়ল; নিজের চোখে নাকি ইউ এফ ও দেখেছে সে, ডানাকে তুলে নিয়ে যেতে দেখেছে। বিশ্বাস না করে আর উপায় নেই ওর কথা। কারণ, রিটা প্রমাণ করে দিয়েছে কিশোরের মাঝেও অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছে। নইলে রক্তের রঙ রূপালী হয় কি করে!

'কি ভাবছিস?' জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী।

'অ্যাঁ!...না, কিছু না। আমার শরীর ভালই আছে। ডাক্তারের কাছে যেতেও আপত্তি নেই আমার।'

প্রতিটি কথা নিদারুণ মিথ্যে হয়ে কানে বাজল তার। চাচীর কাছে এ ভাবে মিথ্যে বলার জন্যে ভয়ানক খারাপ লাগতে লাগল। কিন্তু কি করবে সে?

বিশাল তিনতলা একটা ইঁটের বাড়ির সামনে কিশোরকে নামিয়ে দিলেন মেরিচাচী। পেটের একপাশের ব্যথাটা বেড়েছে তাঁর। ডাক্তার দেখাতে যাবেন তিনিও। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই রেখেছেন। কিশোরকে বললেন, কাজ হয়ে গেলে ওয়েইটিং রুমে অপেক্ষা করতে, তিনি এসে তাকে তুলে নিয়ে যাবেন। ঘণ্টা দুয়েকের বেশি লাগবে না তাঁর।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন চাচী। পুরানো বাড়িটা ভালমত দেখতে লাগল কিশোর। হরর লেখক স্টিফেন কিং-এর উপন্যাস থেকে যেন তুলে আনা হয়েছে গা ছমছম করা বাড়িটা। সমস্ত জানালায় ভারী কালো পর্দা টানা। পুরো বাড়িটাকে যেন ঢেকে রেখেছে ঘন আইভি লতায়।

স্লেট পাথরের গুঁড়ো বিছানো সরু রাস্তা চলে গেছে সামনের সিঁড়ির কাছে। পা ফেললেই মড়মড় শব্দ করে স্লেটের গুঁড়ো। যতই চাপ লাগে, আরও ভাঙে, আরও গুঁড়ো হয়। দুই ধারে বাগান, কিন্তু চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই ওটা বাগান—আমার্জনের জঙ্গল হয়ে আছে। সামনের সিঁড়ির ধাপগুলো দেখা যাচ্ছে না বড় বড় ঘাস আর আগাছার কারণে। ঢেকে দিয়েছে। ওই আগাছা থেকে লাফ দিয়ে যদি বিষাক্ত সাপ কিংবা বিরাট জোঁক বেরিয়ে আসে, অবাক হবে না সে।

এ কোন্ ধরনের ডাক্তার? কোনও ডাক্তারের বাড়ি এ রকম ভূতের বাড়ি হয়ে থাকতে দেখেনি আর সে।

সামনের দরজায় পিতলের বিরাট নেমপ্লেট। তাতে অনেক বড় করে লেখা:

হ্যাঙ্গামায়া জুগোজুয়ো, এম. ডি.

মাশাআল্লাহ্! মনে মনে বলল কিশোর। যেমন বাড়ি, তেমনি তার ডাক্তার। নামখানাও বেশ। দিনে দশ-পনেরোবার উচ্চারণ করলেই দম ফুরাবে। উচ্চারণের সুবিধের জন্যে নিজে নিজেই খাটো করে নিল নামটা–ডাক্তার জগ।

ভয়ে ভয়ে হাত তুলল সে, টোকা দেয়ার জন্যে। কিন্তু পাল্লায় হাত ছোঁয়ানোর আগেই খুলে গেল সেটা। 'এসো, ভেতরে এসো, খোকা,' মিষ্টিস্বরে বললেন লম্বা একজন বৃদ্ধ। মাথায় ধবধবে সাদা চুল, এত লম্বা, পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লেজের মত করে বেঁধেছেন। কালচে বাদামী চোখে ইস্পাতের ছুরির ধার। মুহূর্তে মনের ভেতরটা পর্যন্ত যেন চিরে দেখে ফেলেন। 'তুমি নিশ্চয় কিশোর পাশা।' কিশোর জবাব দেয়ার আগেই হাতের ইঙ্গিতে তাকে ভেতরে ঢুকতে বললেন তিনি। সে ঢোকামাত্র পেছনে জোরে শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লাটা।

মৃদু আলোকিত একটা সুড়ঙ্গের মত করিডর ধরে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। অনেকক্ষণ পর ঢুকল একটা অফিস ঘরে। ডাক্তারের অফিস।

ঘরটা আবছা অন্ধকার। বদ্ধ বাতাস আর্দ্রতায় ভরা। জানালার সমস্ত খড়খড়ি নামিয়ে দেয়া। ঘরের বাতাসে পুরানো চামড়ার গন্ধ। চেয়ার, সোফা, সব কিছুর গদি চামড়ায় মোড়া। খড়খড়ির চারপাশে ফুঁড়ে মরছে যেন সূর্যালোক, ঘরে ঢোকার পথ খোঁজার জন্যে মরিয়া। বিচিত্র এক ধরনের আলো সৃষ্টি করেছে ঘরের মধ্যে। ধুলো উড়ছে ক্রমাগত। সব জিনিসে পুরু ধুলোর আস্তরণ, ফলে নাড়া লাগলেই লাফিয়ে উঠছে। খড়খড়ি দিয়ে আসা বিচিত্র আলোতে ঝিকমিক করছে। যেন কয়েক হাজার তারা হঠাৎ করে বিস্ফোরিত হওয়ার পর দুলে দুলে নিচে নামছে ওদের অসংখ্য কণিকা, রোদের আভায় জ্বলছে হীরার কণার মত।

এই আলো-আঁধারি চোখে সয়ে আসতে সময় লাগল কিশোরের। দেখল বিশাল একটা খোদাই করা কাঠের টেবিল ফেলে রাখা হয়েছে একধারে, ঘরের প্রায় অর্ধেকটাই ভরে গেছে তাতে। ডেস্কের সঙ্গে আকার মিলিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটা চেয়ার। কালচে চামড়ায় মোড়া। ফায়ারপ্লেসের ওপরে দেয়ালের গায়ে ইচ্ছে করে তৈরি করা একটা মস্ত ফাটলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কতগুলো পিতলের যন্ত্রপাতি, মৃদু আলোয় ভোঁতা আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওগুলো থেকে। জিনিসগুলো কি, চিনতে পারল না কিশোর। ভাল করে দেখার জন্যে এগোতে গেল সেদিকে।

'দাঁড়াও!' চিৎকার করে উঠলেন ডাক্তার।

এতটাই চমকে গেল, কিশোরের মনে হলো ফুটখানেক লাফিয়ে উঠে গেছে শূন্যে।

মজা পেয়ে হাসলেন ডাক্তার। 'ভয় পেয়েছ? পাওয়ার কিছু নেই। স্যাংটাম

স্যাংটোরামে প্রবেশ করার আগে আমাদের পরিচয়টা হওয়া জরুরী। স্যাংটাম স্যাংটোরাম হলো আমার এই প্রাইভেট অফিস, যেখানে আমি বিশেষ রোগীদের দেখি। তোমার মত রোগী। তুমি যে কিশোর পাশা, জানি আমি; কিন্তু আমি যে ডক্টর জগ, সেটা কি জানো?'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'জানি!'

'অর্থাৎ নিজে নিজেই সহজ করে নিয়েছ,' হাসিটা মুছল না ডাক্তারের। 'সবাই তা-ই করে। উপায় কি? বাবা এত জটিল একখান নাম রেখে দিয়েছিল, ছেলেবেলা থেকেই সেটা নিয়ে বিপদে পড়তে হয়েছে আমাকে। বেশির ভাগই আমাকে জগ বলে ডাকত। ভাগ্যিস মুগোমুয়ো নয় আমাদের পদবী, তাহলে মগ ডাকা শুরু করে দিত। এবং বলাবাহুল্য, সেটা ভাল লাগত না আমার।'

'জগ আপনার ভাল লাগে?'

'তা লাগে না। তবে মগের চেয়ে ভাল। হ্যাং নামটা চালু করতে পারতাম, কিন্তু সেটাও আমার ভাল লাগে না। হ্যাং বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফাঁসিতে ঝোলানো আমার লাশ...থাকগে, নাম নিয়ে কি এসে যায়। ডক্টর জগ বললেই তো চেনা যাচ্ছে; আমাকেই চিনবে, অন্য কাউকে না।'

'তা বটে!' মনে মনে বলল কিশোর। এ মুহূর্তে মনে হলো জগের সঙ্গে বেশ মিল ডাক্তার জগের। কেবল পিঠে একটা রিঙের মত হাতল লাগিয়ে দিলেই হয়ে যায়।

মুচকি হাসলেন ডাক্তার। 'কি ভাবছ, বলি? আমার পিঠে হাতল লাগানোর কথা।'

ভড়কে গেল কিশোর। এ লোকের সামনে কোন কথা ভাবাই নিরাপদ নয়। থট রীডার নাকি? হিপনোটিজমে বিশেষজ্ঞ যখন, হতেও পারেন। মাথা ঝাঁকাল কিশোর। অস্বীকার করল না কি ভাবছিল।

'গুড বয়। সত্যবাদী ছেলেদের আমি পছন্দ করি। তাহলে আর কোন সমস্যা নেই তো? আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল আমাদের। এখনও নার্ভাস বোধ করছ?'

'নার্ভাস নই, তবে উদ্বিগ্ন,' জবাব দিল কিশোর। 'আর কখনও এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়িনি তো। আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। সামলে নিতে পারব।'

'নিশ্চয়,' মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার। 'তুমি সাহসী ছেলে। বুদ্ধিমান তো বটেই। হিপনোটিজমে নার্ভাস হওয়ার বা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তারচেয়ে পেট-কাটা অপারেশন অনেক বেশি ভয়ের। হিপনোটিজম ল্যাটিন শব্দ, এর মানে হলো "ঘুম"। আমি যখন তোমাকে সম্মোহিত করব, একটা গভীর শরীর ঢিল করে দেয়া অবস্থার মধ্যে নিয়ে যাব তোমাকে, যেখানে তোমার ইনার মাইন্ড–মানে, যেটাকে সহজ ভাষায় অবচেতন মন বলা হয়–সেটা শান্তিতে, সহজে কথা বলতে পারবে আমার সঙ্গে। এটা পুরোপুরি বিজ্ঞান। এরমধ্যে অলৌকিক কিছু নেই, জাদুবিদ্যা নেই।'

শুনতে খারাপ লাগছে না কিশোরের। কিন্তু ভয় আর কাটে না। যদি মন্দ কিছু জেনে ফেলেন ডাক্তার? অশুভ কিছু?

'কিশোর, শোনো, সম্মোহিত হবে কি হবে না পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করছে তোমার ইচ্ছের ওপর,' ডাক্তার বললেন। 'যদি সম্মোহিত হতে না চাও, কেউ তোমাকে সম্মোহিত করতে পারবে না।'

ভারী দম নিল কিশোর। মনে মনে বলল, আমি সম্মোহিত হতে চাই না। কিন্তু হওয়াটাও জরুরী। হয়তো ডানার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে ন'টা মাস আমি কোথায় ছিলাম সেটা জানার ওপর।

'বেশ,' দম ছাড়ল কিশোর, 'আমি রেডি।'

হাসলেন আবার ডাক্তার। 'রেডি? ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বক্সিং প্র্যাকটিস করা যায়, সম্মোহিত হওয়া যায় না। ওই কাউচটায় গিয়ে শুয়ে পড়ছ না কেন লম্বা হয়ে? তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারি আমি। এখানে এমন কিছুই ঘটবে না বা ঘটানো হবে না যা তুমি চাও না। সহজ কথায়, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কিছু করা হবে না।'

'বেশ, তা-ই যাচ্ছি,' লম্বা কাউচটার দিকে তাকাল কিশোর। 'খানিকটা যুদ্ধং-দেহী মনোভাব যে নিয়ে রেখেছি মনে মনে অস্বীকার করব না। কি করব? মন যে বিরোধিতা করছে। ঠিক আছে, শুয়ে পড়ছি। দেখি কি হয়।'

কাউচটায় বসে পড়ল সে। আরামদায়ক, নরম গদি। দ্বিধা করল না আর। আধশোয়া হলো কাউচটায়।

ছোট আলমারি খুলে একটা ভিডিও ক্যামেরা আর ট্রাইপড বের করে আনলেন ডাক্তার। ক্যামেরাটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। দামী জিনিস। খুব অস্পষ্ট ছবিও তুলে নেবে।

স্ক্রুতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্যামেরাটা ট্রাইপডে বসালেন ডাক্তার 'এটা দেখে কি কোন বিরূপতা হচ্ছে তোমার?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন। 'পুলিশ অনুরোধ করেছে আমাকে। বলেছে তোমাকে সম্মোহিত করার পর পুরো ঘটনাটার একটা সচল ছবি ধরে রাখতে। ইচ্ছে করলে না করে দিতে পারো তুমি। তাহলে আর তুলব না। পুলিশ কোন সূত্র পাক বা না পাক, সেটা তাদের ব্যাপার, তোমার কিছু না।'

'না, তুলুন,' কিশোর বলল সূত্র তারও দরকার। নয় মাসের বিস্মরণের রহস্যটা তাকে ভেদ করতেই হবে। খারাপ যদি কিছু ঘটিয়েও থাকে সে, তদন্তে সেটা বেরিয়ে আসবে আসুক। জেনে গেলে মনের অস্বস্তিটা অন্তত দূর হবে। রহস্যের এই জটিল গোলক-ধাঁধায় ঘুরে মরতে চায় না আর।

ক্যামেরায় একটা মিনি ক্যাসেট ভরলেন ডাক্তার। বোতাম টিপতে চালু হয়ে গেল ক্যামেরা। নীরব ঘরটায় ক্যাসেট ঘোরার খড়খড় শব্দটা বড় বেশি জোরাল হয়ে কানে বাজতে লাগল।

'ঘরে ঢুকেই আমার সংগ্রহের প্রতি আগ্রহী হয়েছিলে তুমি,' ফায়ারপ্লেসের ওপরে রাখা জিনিসগুলোর দিকে নির্দেশ করলেন ডাক্তার। 'এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ ওগুলো?'

'পাচ্ছি,' জবাব দিল কিশোর।

'ওগুলো কি জিনিস, জানো?'

'না,' ঘুম ঘুম লাগতে আরম্ভ করেছে কিশোরের।

'নাবিকদের জিনিস। ওসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে সাগরে দিক-নির্দেশনার কাজ করত ওরা। নিশ্চয় বুঝতে পারছ, ওগুলো অনেক প্রাচীন জিনিস। জানো, সে আমলে রেডিও ছিল না, টেলিফোন ছিল না। ধরা যাক তুমি নাবিক। ডাঙা থেকে শত শত মাইল দূরে খোলা সাগরে যদি পথ হারাতে তখন, ভয়ঙ্কর বিপদে পড়তে।' জিনিসগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। একটা যন্ত্রে হাত রাখলেন, 'এগুলোর নাম জানতে চাও?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'এটা হলো সেক্সট্যান্ট,' একটা সূর্যঘড়ির সঙ্গে যুক্ত ছোট একটা টেলিস্কোপের মত যন্ত্রে হাত রাখলেন তিনি। 'এর নাম অ্যাস্ট্রোল্যাব। বিশেষ ধরনের যন্ত্র, সবচেয়ে বিপজ্জনক অভিযানগুলোতে এ জিনিস ব্যবহার করত সে-যুগে ওলন্দাজ নাবিকরা।'

ফাটলের মত তাক থেকে সবচেয়ে জটিল দেখতে একটা যন্ত্র তুলে নিলেন তিনি। কাঁচের বাক্সে রাখা একসারি সোনার তৈরি দোলক। 'এটা কি জানো? আমার সবচেয়ে প্রিয় সংগ্রহ। ম্যারিন ক্রোনোমিটার বলে একে। আকাশে মেঘ থাকলে যখন সূর্য পুরোপুরি ঢাকা পড়ে যেত, কিংবা আঁধার রাতে যখন কোন কিছু দেখেই সময় নির্ধারণের উপায় থাকত না, তখন এটা দেখে সময় বুঝতে পারত সাগরে পথ হারানো নাবিক। এটা কার জিনিস জানো? স্বয়ং ক্যাপ্টেন জেমস কুকের, আঠারো শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং বড় নাবিক ছিলেন তিনি।'

দোলা দিয়ে বাক্সের ভেতরের দোলকগুলোকে নাড়িয়ে দিলেন ডাক্তার। দুলতে লাগল ছোট ছোট বলগুলো। একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। মনে হচ্ছে ঘুমের অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। না! মনের ভেতরে কি যেন চিৎকার করে উঠল তার। না না, এ হতে পারে না! আবার শোনা গেল চিৎকার। প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে তার ওপর ডাক্তারের কণ্ঠ, কণ্ঠের সেই মোহজাল ছিন্ন করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সে।

'মহাসাগরে পথ হারিয়েছ তুমি, তাই না, কিশোর?' বলে চলেছেন ডাক্তার। 'কোথা থেকে এসেছ তুমি, তার কিছুই জানো না। কোথায় ছিলে, তা-ও জানো না। তবে কোন না কোনখানে তো ছিলে…অনিশ্চিত কোন জায়গা!'

অবচেতন মনে আতঙ্ক যেন আকুলি-বিকুলি শুরু করে দিল কিশোরের। ঠেলে বেরোনোর চেষ্টায় পাগল হয়ে উঠেছে। শান্ত হয়ে কাউচে পড়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। কিন্তু পিছলে সরে যাচ্ছে কোথায় যেন…দূরে…বহুদূরে…মাথার মধ্যে একটা চাপ তৈরি হচ্ছে।…ডক্টর জেকিল অ্যান্ড হাইডের মত আরেকটা দ্বিতীয় সত্তা যেন ফুঁসে উঠছে, আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইছে…

'তোমাকে সেইখানে নিয়ে যেতে চাইছি আমি, কিশোর,' মায়াময় কণ্ঠে বলে চলেছেন ডাক্তার। 'তোমার সেই আসল জায়গাটাতে, যেখানে পড়েছিলে

ন'টি মাস।'

মগজের ভেতর থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল: 'না, না যেও না! যেও না সেখানে···জানার কোন প্রয়োজন নেই তোমার কোথায় ছিলে তুমি···তোমাকে যে কাজ দেয়া হয়েছে সেটা শেষ করো···!'

প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল যেন মগজের দ্বিতীয় সত্তাটা। চোখের সামনে ঘোলাটে হয়ে আসছে সব। ভয়ঙ্কর···ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করল যেন সে।

নয়

জ্ঞান ফিরলে টের পেল কিশোর বেদম গতিতে চলছে তার হৃৎপিণ্ড, ফেটে বেরিয়ে আসবে যেন। গুটিসুটি কুকুর কুণ্ডলী হয়ে আছে। মাংসপেশীগুলো টানটান। চিতার মত লাফ দিতে প্রস্তুত।

বাতাসে ভাপসা গন্ধ। বদ্ধ জায়গায় যেমন থাকে।

মগজটা এখনও ঘোলাটে হয়ে আছে। স্পষ্ট চিন্তা করতে পারছে না কিছু।

কি ঘটেছে মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু স্মৃতিশক্তি সেই আগের মতই বিশ্বাসঘাতকতা করল। কিছুই মনে পড়তে দিল না। ঘন কালো পর্দায় ঢাকা পড়ে গেছে যেন সব।

সাবধানে চোখ মেলল সে। অন্ধকার। আবছা একফালি আলো চোখে পড়ছে কেবল। ধীরে ধীরে বুঝতে পারল একটা আলমারিতে ঢুকে বসে আছে সে। বোকা হয়ে গেল। আলামারিতে ঢুকেছে কেন?

স্পষ্ট মনে করতে পারল না কিছু। তবে মনে হলো, কারও হাত থেকে বাঁচার জন্যে এখানে এসে লুকিয়েছে। কার হাত থেকে? নিশ্চয় আলমারির বাইরেই আছে এখন সেই লোক।

পায়ের শব্দ কানে এল।

অন্ধকারে হাতড়াতে শুরু করল সে, একটা কিছু খুঁজে বের করতে চাইল যেটা দিয়ে বাধা দিতে পারে। একটা ঝাড়ুর হাতল ঠেকল আঙুলে। আর মেঝে পরিষ্কার করার একটা ব্রাশ। একটা ক্যান। আক্রমণকারীর মুখে ওগুলো ছুঁড়ে মারলে কেমন হয়? কাজ হবে? ভাল একজন গোয়েন্দা এ মুহূর্তে কি করত—পোয়ারো কিংবা শার্লক হোমস—ভাবার চেষ্টা করল।

হ্যাঁচকা টানে খুলে গেল আলমারির দরজা। তীব্র আলো পড়ল মুখে।···সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার।

'ভালই আছ মনে হচ্ছে!' ফিরে তাকিয়ে বোধহয় সহকারীদেরই বললেন তিনি। 'এই যে এখানে!'

হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'ধরো। বেরিয়ে এসো।'

পুলিশ দেখে জীবনে এত খুশি আর হয়নি কখনও কিশোর। এতটা স্বস্তি

বোধ করেনি। ক্যাপ্টেনের হাত ধরে বেরিয়ে এল আলমারি থেকে। সোজা হয়ে দাঁড়াল। পরনের পোশাকগুলোর অনুভূতিটা বিচিত্র। এমন কেন লাগছে? ভাল করে দেখল। টি-শার্টটা ছিঁড়ে ফালাফালা। জিনসের প্যান্টও নানা জায়গায় ছেঁড়া। যেন অনেক বেড়ে গিয়েছিল তার শরীর, টান লেগে ছিঁড়েছে। বহু লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছে। অনেকের হাতে শপিং ব্যাগ।

শপিং ব্যাগ! চারপাশে তাকিয়ে দেখল সে। পরিচিত দৃশ্য। চলমান সিঁড়ি, দোকানের সামনে কাঁচের সুসজ্জিত উইন্ডো, ঝলমলে আলো।

মলে রয়েছে সে! ডাক্তার জগের অফিস থেকে কম করে হলেও দশ মাইল দূরে। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল সে। বিমূঢ়ের মত জিজ্ঞেস করল, 'আমি এখানে কি করে এলাম, ক্যাপ্টেন?'

হৃৎপিণ্ডের গতি অনেকটা কমে এসেছিল তার, আবার বেড়ে যাচ্ছে।

'ওসব নিয়ে ভাবার দরকার নেই এখন,' কোমল কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। 'শান্ত হও। বাড়ি চলো আগে। আমাদেরও অনেক প্রশ্ন আছে।'

বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে বসে জানালেন ক্যাপ্টেন, 'তোমার সঙ্গে যখন ডাক্তারের কথা চলছে, জোর করে কেউ ঢুকে পড়েছিল তাঁর অফিসে। ডাক্তারকে মারধর করেছে সে। জায়গাটাকে তছনছ করে দিয়েছে। অফিসের অবস্থা দেখলে মনে হয়, একটা দৈত্য ঢুকে পড়েছিল।'

ফায়ারপ্লেসের ওপরের তাকে রাখা নাবিকদের পুরানো যন্ত্রপাতিগুলোর কথা মনে পড়ল কিশোরের। খুব পছন্দ হয়েছিল তার। ওগুলোও নিশ্চয় নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। 'ডাক্তার কি বললেন?'

'তিনি কিছু বলতে পারেননি,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন। 'সাংঘাতিক জখম হয়েছেন। বেহুঁশ অবস্থায় পেয়েছি তাঁকে। বেঁচে যে গেছেন এ-ই বেশি।...কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি? তুমি কিছু মনে করতে পারছ?'

'নাহ্!' কোন কিছুরই জবাব নেই তার কাছে–নিজেকে গাধা মনে হচ্ছে কিশোরের! ভাবতে কষ্ট হচ্ছে, একটা সময় তুখোড় গোয়েন্দা ছিল সে। 'আমার মনের গুদামটা পুরোপুরি ফাঁকা। কি যে হয়েছে আমার, নিজেও বুঝতে পারছি না। ডাক্তারের ওপর যখন হামলা হলো, জেগে উঠলাম না কেন তা-ও বুঝতে পারছি না।'

'সেটা অস্বাভাবিক নয়,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'তোমাকে তখন সম্মোহিত করে রাখা হয়েছিল।'

আঙুল মটকাল কিশোর। নিজের অজান্তে চিমটি কাটল একবার নিচের ঠোঁটে। 'আমার সঙ্গে কথা বলার সময়কার দৃশ্যটা ভিডিও করে রাখছিলেন ডাক্তার। ক্যামেরাটা চেক করেছেন?'

'করেছি,' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। 'অফিসের জিনিসপত্র তছনছ করা হয়েছে বটে, তবে সব আছে–পাওয়া যায়নি কেবল একটা জিনিস, ওই ভিডিওটেপের ক্যাসেটটা। কোন কথাই হয়তো জানতে পারতাম না আমরা, ডাক্তারের পড়শী ভদ্রলোক যদি দেখে না ফেলতেন। লম্বা, ফ্যাকাসে চামড়ার

একটা লোককে তিনি ডাক্তারের অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন। ডাক্তারের গাড়ি নিয়ে শহরের দিকে চলে গিয়েছিল লোকটা। গাড়িটা খুঁজে পেয়েছি আমরা শপিং-মলের বাইরে। একটা লোককে নেমে দৌড়ে মলে ঢুকে পড়তে দেখেছে এক দোকানদার। সেই লোকটাকে খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম তোমাকে। হতে পারে জিম্মি হিসেবে তোমাকে তুলে নিয়ে এসেছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে তোমাকে ফেলেই পালিয়েছে।'

লম্বা, ফ্যাকাসে চামড়ার লোক! ভাবনাটা যেন ঝাঁকি দিয়ে গেল কিশোরকে। মনে হলো, লোকটাকে চেনে সে। কোথাও দেখেছে।

'কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি তার?' বিড়বিড় করল কিশোর। 'মোটিভ? ডাক্তারকে মেরেধরে আমাকে তুলে নিয়ে আসার কারণ?'

'সেটা জানলে তো অনেক রহস্যেরই সমাধান হয়ে যেত।'

ইয়ার্ডের গেটে পৌঁছল গাড়ি। ব্রেক কষলেন ক্যাপ্টেন। গাড়ি থামিয়ে স্টিয়ারিং থেকে সরিয়ে আনলেন হাত। কিশোরের দিকে তাকালেন। 'একটা কথাই মনে হচ্ছে আমার, কেউ একজন চায় না তোমার স্মৃতিশক্তি ফিরে আসুক; চায় না গত নয় মাসে তুমি কি করেছ সেটা জানাজানি হয়ে যাক।'

ঘর অন্ধকার। দরজায় তালা দেয়া। মনে হচ্ছে বাড়ি নেই কেউ। বোরিস আর রোভার ডিউটি শেষ করে চলে গেছে। চাচা-চাচীও নেই। তবে একা কোন অসুবিধে হবে না, ক্যাপ্টেনকে বলল কিশোর। বরং একাই থাকতে চাইছে কিছুক্ষণ। ভাবতে চাইছে।

ক্যাপ্টেন তাকে নামিয়ে দিয়ে সাবধানে থাকতে বলে চলে গেলেন। ঘরে না ঢুকে বারান্দায় বসে রইল কিশোর। গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল।

রিটা তাকে অদ্ভুত যে সব কথা বলেছে–সেগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে আর পারল না। কারণ তার নিজের রক্তের রঙও বদলে গেছে। এ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। রক্তের রঙ রূপালী! কে কবে শুনেছে মানুষের রক্তের এমন রঙ হয়?

ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারা করতে না পেরে রক্তের কথা বাদ দিয়ে ডাক্তারের অফিসে কি ঘটেছিল সেটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল সে। কে হামলা চালিয়েছিল ডাক্তারের অফিসে? তাকে খুন করতে এসেছিল, নাকি শুধুই কিডন্যাপ করতে? কিডন্যাপার কি পৃথিবীবাসী, না ভিনগ্রহের? ভাবনাটা আর পাগলামি মনে হচ্ছে না কিশোরের এখন, রিটার কথা শোনার পর।...লোকটা যে গ্রহের বাসিন্দাই হোক, ডাক্তারের অফিসে দেখামাত্র তাকে খুন করল না কেন? তাকে খুন করলেই তো নয়টা মাস সে কোথায় ছিল, কি করেছিল, সেটা চিরকালের জন্যে চাপা পড়ে যেত।

ভাবনাই সার হলো–কোন প্রশ্নের জবাব তো পেলই না কিশোর, মাথাটা বরং গরম হতে থাকল। সূত্র দরকার তার, সূত্র! সূত্র ছাড়া কোন প্রশ্নের জবাব বের করতে পারবে না। কোন একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা বলেছিল, এ মুহূর্তে নামটা মনে করতে পারল না সে–যেখানে রহস্যের শুরু, সেখানেই গিয়ে সূত্র খোঁজো, কিছু না কিছু অবশ্যই পেয়ে যাবে।

রহস্যের শুরুটা কোনখানে?

লেকের পাড়ে।

তারমানে আবার যাওয়া দরকার ওখানে। একা যাবে? নাহ্, আর একা নয়। তারচেয়ে কয়েকজন মিলে যাওয়া যাক। একজোড়া চোখের চেয়ে কয়েক জোড়া চোখ সূত্র খুঁজে বেড়াতে পারবে অনেক বেশি।

রবিনকে ফোন করার সিদ্ধান্ত নিল সে।

দরজায় তালা দেয়া। বাড়তি চাবিটা দরজার পাশে দেয়ালের কোন খোপে রাখা থাকে জানা আছে তার। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। সিটিং রুমে না গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল ফোন করার জন্যে। রান্নাঘরটা কাছে। খিদে পেলে খাবারও পাওয়া যাবে। তা ছাড়া চাচা যদি কোন মেসেজ রেখে যান, ওখানেই টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে যাবেন।

নিজের বাড়ি। অথচ কেমন অদ্ভুত লাগছে অন্ধকার ঘরে ঢুকে। অপরিচিত লাগছে, আগে যেটা কোন সময়ই লাগত না তার। সুইচ টিপে আলো জ্বালল। চাচী কোথায়?—এতক্ষণে প্রশ্নটা মনে জাগল। দুই ঘণ্টার মধ্যে তাকে তুলে নেয়ার কথা ছিল ডাক্তার জগের বাড়ি থেকে। পেটের ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি শেষ হয়নি এখনও? বহু আগেই হয়ে যাওয়ার কথা। এতক্ষণ লাগার কোন প্রশ্নই ওঠে না, যেহেতু আগে থেকে যোগাযোগ করেই গিয়েছিলেন তিনি।

আলো জ্বলার পরেও দেয়াল ঘড়িটার টিক-টিক শব্দ অতিরিক্ত জোরাল মনে হচ্ছে নীরব, নির্জন ঘরে।

টেবিলে কাপ চাপা দিয়ে রাখা মেসেজটা চোখে পড়ল প্রথমেই। চাচা লিখে রেখে গেছেন:

কিশোর, তোর চাচী হাসপাতালে। পেটের ব্যথার কারণটা জানা গেছে। অ্যাপেনডিক্স। অপারেশন লাগবে। জেনারেল হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। ফোন নম্বর জানা না থাকলে ডিরেক্টরি থেকে বের করে নিস। আমি হাসপাতালে গেলাম।—রাশেদ পাশা।

মাথার মধ্যে চক্কর দিতে আরম্ভ করল কিশোরের। অ্যাপেনডিক্সের ব্যথা শুরু হওয়ার আর সময় পেল না। তার এই মানসিক অবস্থার মধ্যে···লোকে বলে কাকতালীয় ঘটনা ঘটে না। এখন তো দেখা যাচ্ছে ঘটে। প্রচুর ঘটে। অতি-বাস্তববাদীরা বিশ্বাস করতে চায় না। কিংবা ঘটতে দেখেও বোকা কাকের মত চোখ বুজে রাখে। নিজেকে এ মুহূর্তে বোকা কাক মনে হতে লাগল কিশোরের।

চাচীর জন্যে মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। হাসপাতালে যাওয়া দরকার। তবে তারচেয়ে জরুরী, রহস্যটার সমাধান করা। পুরো পরিস্থিতিটা কেন যেন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে তার। আরও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে।

রিসিভার তুলে আগে রবিনকে ফোন করল।

'হালো?' জবাব দিলেন রবিনের আম্মা মিসেস মিলফোর্ড।

'আন্টি? আমি, কিশোর। রবিন কোথায়?'

'খাচ্ছে। দেব?'

'দিন।'

খাবার মুখে নিয়ে ফোন ধরল রবিন। 'হ্যালো'টা শোনাল 'হারলো!'

'রবিন!' ফিসফিস করে নিজেকে কথা বলতে শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল কিশোর। এ ভাবে চাপাস্বরে কথা বলছে কেন! 'রবিন, ডাক্তারের অফিসে আমার ওপর হামলা হয়েছিল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।'

উত্তেজনায় তাড়াহুড়ো করে খাবার গিলতে গিয়ে গলায় আটকে গেল রবিনের। 'কি হয়েছিল?'

মাথার মধ্যে চক্কর দিয়ে উঠল কিশোরের। বমি বমি লাগল। দুই আঙুলে কপাল টিপে ধরল সে। ব্যথা শুরু হয়েছে।

'কিশোর?' গলা চড়ল রবিনের। 'শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, শুনছি,' কপালের ব্যথাটা অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করল কিশোর। 'কেউ আমার পিছু লেগেছে। মনে হচ্ছে, খুন করতে চায়।'

'কোথায় তুমি এখন, কিশোর?' রবিনের কণ্ঠে ভয়। 'ভাল আছ তো?'

'ভালই আছি, এখন পর্যন্ত। আমাদের বাড়ি থেকে কথা বলছি, রান্নাঘরের ফোন থেকে।'

'ওহ্, বাঁচালে!' চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা শব্দ করে ছাড়ল রবিন। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'কিশোর, শোনো, ফোনে কথা বলে হবে না। মুখোমুখি আলোচনায় বসা দরকার আমাদের। আমি, মুসা, জিনা, তুমি।'

'আমিও সে-কথাই ভাবছিলাম। দেরি করা উচিত হবে না। আজ রাতেই।'

'কোথায়? আমাদের হেডকোয়ার্টারে?'

'না, যেখানে এর উৎপত্তি—লেকের ধারে। আমার মন বলছে, জবাব যদি পাওয়া যায়, ওখানেই পাওয়া যাবে।' একটা বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছে কিশোরের। কথাগুলো যেন তার মুখ থেকে নয়, অন্য কারও মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে, পাখি পড়ানোর মত করে। নয় মাস গায়েব থেকে ফিরে আসার পর কত রকম কাণ্ডই যে হচ্ছে! 'মুসা আর জিনাকেও নিয়ে যেয়ো। তবে রাফিকে যেন না নেয়। ও ঝামেলা করবে। সূত্র খুঁজতে অসুবিধে হবে আমাদের।'

'ঠিক আছে। খেয়ে উঠেই ফোন করছি ওদের। কখন দেখা হচ্ছে?'

'এই বারোটা নাগাদ। যদ্দূর মনে পড়ে, মধ্যরাতেই অঘটনটা ঘটেছিল আমার।'

গুড-বাই জানিয়ে ফোন রেখে দিল কিশোর।

ঘড়ির দিকে তাকাল। আটটা বাজে প্রায়। হাতে আছে এখনও চার ঘণ্টা সময়। বহু সময়। হাসপাতালে যাবে চাচীকে দেখতে? যেতে তো খুবই ইচ্ছে করছে, কিন্তু আটকা পড়ার ভয়ও আছে। ওকে দেখলে, ডাক্তারের ওখানে কি অঘটন ঘটেছে জানতে পারলে, আর ছাড়তে চাইবে না চাচা বা চাচী কেউই। হাসপাতালে আটকে রাখবে। তাতে রবিনদেব সঙ্গে মীটিংটা আর হবে না।

রহস্যের জবাব খোঁজা পণ্ড হবে। ওদের সঙ্গে দেখা করাটা অনেক বেশি জরুরী মনে হলো ওর কাছে। মনে হলো, নয় মাস সে কোথায় ছিল এই প্রশ্নের জবাব জানার ওপর নির্ভর করছে তার বাঁচা-মরা।

চাচীর কাছে চাচা রয়েছে। তার না গেলেও কোন সমস্যা হবে না। বরং খানিক বিশ্রাম নিয়ে, কিছু খেয়েদেয়ে লেকের পাড়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি হওয়াটা এখন জরুরী।

ওপরতলায় নিজের ঘরে উঠে এল সে। ছেঁড়া পোশাক বদলাতে গিয়ে প্যান্টের পকেটে শক্ত জিনিসটার অস্তিত্ব টের পেল।

বের করে এনে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে।

একটা মিনি ভিডিও ক্যাসেট।

দশ

চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না। এই ক্যাসেটটাই ক্যামেরায় ভরতে দেখেছিল ডাক্তার জগকে। হাত কাঁপছে ওর থরথর করে। কোনমতেই স্থির রাখতে পারছে না। শেষে স্বাভাবিক করার জন্যে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জি চেপে ধরল। ক্যাসেটের ওপরে লেখা লেবেলটা পড়ল:

সাবজেক্ট: কিশোর পাশা
এগ্‌জামিনার: হ্যাঙ্গামায়া জুগোজুয়ো
তারিখ: ৪/২৩

ডাক্তারের অফিস থেকে খোয়া গেছে টেপটা। সে পকেটে ভরে নিয়ে এসেছে। কেন? কয়েকটা সম্ভাবনা লাফ দিয়ে উঠে এল মগজে। প্রত্যেকটা সম্ভাবনা ঠাণ্ডা করে দিতে চাইল তার 'রূপালী রক্ত'।

ক্যাসেট হাতে ভিসিআরটার দিকে ছুটল সে। চালু করে দিল টেলিভিশন। মাথার মধ্যে কে যেন বলছে: খবরদার, কি আছে ওর মধ্যে দেখো না! কিন্তু অন্য আরেকটা মন বলছে: দেখো, অবশ্যই দেখো! নাহলে জানতে পারবে না তোমার ভেতরে কি ঘটছে!

দ্বিতীয় মনটার জোর আর প্রভাব যেন প্রথমটার চেয়ে বেশি। ভিসিআর-এ ক্যাসেট ঢোকাল সে প্লে টিপতে চালু হয়ে গেল মেশিন। ঘুরতে আরম্ভ করল ফিতে।

ছবির কোয়ালিটি ভাল না, দুর্বল চিত্র। ঘরে আলো ছিল খুব কম। তবে ভাল জাতের ক্যামেরা দিয়ে তোলা হয়েছে। বোঝা যায়। ডাক্তারের অফিস ঘরটা ফুটে উঠল টিভির পর্দায়। ক্যামেরার পেছনে থাকায় ডাক্তারকে দেখতে পাচ্ছে না, তবে কল্পনায় স্পষ্ট দেখছে তাঁর চেহারা, মাথার পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে বাঁধা লম্বা, সাদা চুল। নিজেকে কাউচে শুয়ে থাকতে দেখল। ঢিলেঢালা মুখের চামড়া, চোখ বোজা–ঘুমন্ত মানুষের মত। কিন্তু দেহের প্রতিটি পেশি

টানটান, ছবিতেও বোঝা যাচ্ছে।

'তোমাকে আমি পেছনে নিয়ে যেতে চাই,' ডাক্তার বলছেন। 'মনটাকে ছড়িয়ে দাও। যতটা সম্ভব ছড়াও। ভাবো। ভাবতে থাকো। চলো আমার সঙ্গে সঙ্গে। আগস্টের এক উষ্ণ রাত্রি। তুমি একা। লেকের ধারে। কি দেখেছ?'

'মেঘ...শুধুই মেঘমালা! ওগুলো নড়ছিল!' জবাব দিল কিশোর। নিজেকে ওই ভঙ্গিতে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে কেমন অদ্ভুত লাগছে তার। যে সব কথা বলেছে সেগুলো এখন আর মনে করতে পারছে না।

'তারপর কি হলো?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

'তারপর...' মিলিয়ে গেল কিশোরের কণ্ঠ। উদ্ভট কিছু ঘটছে পর্দায়। বিকৃত হয়ে যাচ্ছে ওর চেহারা।

'বলো?' প্রশ্নটায় জোর দিলেন ডাক্তার।

'তারপর...' আবার মিলিয়ে গেল কিশোরের কণ্ঠ। পুরো চেহারাটাই বদলে যাচ্ছে। চামড়ার নিচে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। সামনে ঝুঁকলেন ডাক্তার। অনেক সামনে এগিয়ে গেছেন। ভাল করে কিশোরকে দেখার জন্যে। ক্যামেরার সামনে চলে এল তাঁর মুখ। দেখা যাচ্ছে। স্পষ্ট উত্তেজনা চেহারায়।

'কিশোর? তুমি ঠিক আছ তো, কিশোর? তোমার কি হচ্ছে? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

ছটফট করতে লাগল কিশোর। কাঁপতে শুরু করল মৃগী রোগীর মত। যেন ট্যাজার গান দিয়ে গুলি করা হয়েছে ওকে। ট্যাজার গান! আশ্চর্য! কোথায় শুনেছে ওই অস্ত্রের নাম? ছবিতে দেখল ঝটকা দিয়ে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে গেল তার দেহটা। কাউচের গদিতে মুখ গুঁজল।

এগিয়ে গিয়ে ওর ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন ডাক্তার। 'কিশোর? জলদি বলো, কিশোর!' কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকি দিলেন কিশোরকে।

মুখ তুলল কিশোর। ডাক্তারের দিকে তাকাল। সরাসরি।

ভীষণ চমকে লাফ দিয়ে দুই কদম পিছিয়ে গেলেন ডাক্তার। কথা বলার জন্যে মুখ খুললেন। হাঁ হয়েই রইল মুখটা। কথা বেরোল না।

নিজের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখন কিশোর। চোখের পাতা খোলা। কিন্তু চোখ নেই সেখানে। কোটর দুটো শূন্যও নয়। চোখের জায়গায় গোল গোল দুটো চাকতি। তাতে কোন মণি নেই। শুধুই দুটো চাকতি। একধরনের আভা বেরোচ্ছে সে-দুটো থেকে।

হাত-পা ছড়াতে থাকল ছবির কিশোরের। টানটান হয়ে যেতে লাগল চামড়া। মোমের মত ফ্যাকাশে রঙ। পাতলা হয়ে এল মাথার চুল। বয়স্ক মানুষের মত। দেখতে দেখতে অনেক বড় হয়ে গেল শরীরটা।

বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে আসল কিশোরের। সাংঘাতিক উত্তেজনা নিয়ে তাকিয়ে আছে ছবির দিকে। নিজের এই ভয়াবহ পরিবর্তন দেখছে বিমূঢ় হয়ে।

ছবিতে পিছিয়ে যাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছেন ডাক্তার। ক্যামেরার ট্রাইপডে পা বেধে উল্টে পড়ে গেলেন

'আমি দুঃখিত,' হিসহিস করে উঠল পর্দার খুনীটা, 'কিন্তু না বলে পারছি না, তোমার সময় শেষ হয়ে গেছে, ডাক্তার! অনেক বেশি জেনে ফেলেছ তুমি!'

চিতাবাঘের মত মসৃণ গতিতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কাউচে শোয়া দানবটা। কিশোরের সঙ্গে সামান্যতম মিল নেই আর এখন। দাঁত বের করে ফেলেছে জানোয়ারের মত। ধস্তাধস্তি শুরু হলো। তবে ক্যামেরার চোখের বাইরে বলে ভয়ানক সেই দৃশ্যটা আর নিজের চোখে দেখতে হলো না কিশোরকে।

তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল ডাক্তারের। তারপর গড়গড়া করার মত শব্দ বেরোল গলার গভীর থেকে। অবশেষে চুপ।

কাজ শেষ হয়ে গেছে মনে করে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়াল আবার ভয়ঙ্কর প্রাণীটা। মাথার মধ্যে চাপ অনুভব করছে কিশোর।

ক্যামেরার চোখের দিকে ঘুরে তাকাল দানবটা।

কিশোরের মাথার মধ্যে কে যেন বলে উঠল, 'কিশোর পাশা, আমাকে চিনতে পারছ না?'

কে কথা বলে! কে?–চমকে গেল কিশোর। চারপাশে তাকাতে লাগল।

'আমি তোমার ভেতরেই রয়েছি,' হিসহিসে কণ্ঠটা বলল। 'কিশোর পাশা, এখনও যদি বুঝে না থাকো তুমি কে, তাহলে শোনো, তোমার আসল রূপটা হচ্ছি আমি। কিশোর পাশার ছদ্মবেশ নিতে বাধ্য হয়েছি।'

'তুমি কে?' ছবির দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে।

'আমি অন্য জগতের মানুষ!' নিজের মগজ থেকে জবাব পেল কিশোর 'ছবিতে এখন যাকে দেখছ, সে-ই হলাম আসল আমি, তোমার মধ্যে বসে আছি।'

কুৎসিত, জঘন্য এই দানবটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল কিশোর। 'কিন্তু তাহলে নিজেকে কিশোর পাশা ভাবছি কেন আমি?'

'ভাবছ, তার কারণ আমার মগজে কিশোর পাশার মগজের কোষ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে,' নিজের মগজ থেকে জবাব পেল কিশোর। 'কিশোর পাশা বানিয়ে পাঠানো হয়েছে আমাকে পৃথিবীর এ সময়ে বাস করা প্রতিটি ক্ষতিকর এজেন্টকে শেষ করে দেয়ার জন্যে। নইলে আমাদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে ওরা। আমার মিশন, ওদের সবাইকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করা।

'লেকের পাড়ে কিশোরকে পেয়ে গিয়ে সুবিধেই হয়েছিল আমাদের। বুঝতে পেরেছিলাম, এখানে আমাদের মিশন সফল করতে হলে তার রূপ ধরলে অনেক সুবিধে হবে। কারণ এখানে অনেক বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে তার বন্ধু, পুলিশ তার বন্ধু–কিশোর পাশার রূপ ধরলে তাদেরকে বশে আনতে, তাদের দিয়ে কাজ করাতে সুবিধে হবে আমাদের। তাই কিশোর হতে আদেশ দেয়া হয়েছে আমাকে, স্মৃতি-কোষ থেকে কোষ নিয়ে আমার মগজে ইনজেক্ট করে দেয়া হয়েছে যাতে কিশোরের পরিচিতজনদের চিনতে পারি, তাদের সঙ্গে

স্বাভাবিক আচরণ করতে পারি; ছদ্মবেশটা একশো ভাগ নিখুঁত হয়।'

এই তাহলে জবাব! কিশোর পাশার মগজের কোষগুলো ভাবল। দানবটাকে শুধু কিশোর পাশার চেহারাই দেয়া হয়নি, তার অতীত স্মৃতিটাও পুরোপুরি দিয়ে দেয়া হয়েছে। নয় মাস আগের স্মৃতি। যে কারণে পরের নয়টা মাস মনে করতে পারছে না দানবের মগজে ঢোকানো কিশোরের মগজের কোষ। কারণ পরের স্মৃতি-কোষ আর ঢোকানো হয়নি।

কিন্তু আগের কোষগুলো ঢোকাল কিভাবে? জবাব এল নিজের মগজ থেকে: আলাদা ডিস্ক থেকে কম্পিউটারের সফটওয়্যার ডাউনলোডিঙের কায়দায়।

একটা অতি উন্নত টেকনিক। মগজের কোষ পরিবর্তনের, একজনের মাথা থেকে আরেকজনের মাথায় প্রতিস্থাপনের। চোখের সামনে দানবটাকে দেখতে পাচ্ছে। নিজের মগজে জবাব শুনতে পাচ্ছে। অবিশ্বাস করার আর প্রশ্নই ওঠে না। গত কয়েকদিনে তার উদ্ভট আচরণের জবাবও এখন পেয়ে গেছে কিশোরের মগজের কোষগুলো। স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের বিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমসের একটা কথা মনে পড়ল: অসম্ভব ব্যাপারগুলোকে যদি বাদ দিয়ে দাও, দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, সেটা যত অবিশ্বাস্য আর পাগলামিই মনে হোক না কেন, সেটাই সত্য। পর্দার দিকে তাকিয়ে সত্যটা মেনে নিতে কষ্ট হলেও না নিয়ে পারল না কিশোরের মগজের কোষ।

ক্ষতিকর এজেন্টদের ধ্বংস করে দিতে পাঠানো হয়েছে। তারমানে সে একজন খুনী। দেহের রূপ পরিবর্তন করতে পারে—অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা! সত্যি বলেছে রিটা।

বিদ্যুৎ চমকের মত আরেকটা কথা খেলে গেল কিশোর-মগজে, খুনীটার 'ক্ষতিকর এজেন্ট'দের মধ্যে রিটাও পড়ে না তো! ভানাকেও হয়তো সে-কারণেই তুলে নিয়ে গেছে।

'রিটা কি ক্ষতিকর এজেন্ট?' জানতে চাইল কিশোর-মগজ।

'হ্যাঁ। তুমি যার কথা ভাবছ, ডানা, সে-ও রয়েছে ক্ষতিকরদের তালিকায়।'

'সে এখন কোথায়?'

'বাইরের কাউকে বলা নিষেধ।'

ভাবছে কিশোর-মগজ। রাফিয়ানের অদ্ভুত আচরণের মানে এখন পরিষ্কার। আর কেউ চিনতে না পারলেও কুকুরটা ঠিকই চিনে ফেলেছিল, কিশোর পাশার মত দেখতে ওই লোকটা আসল কিশোর নয়। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মিশন শেষ হয়েছে?'

'না, সবাইকে খুঁজে পাইনি। একআধজনকে ধ্বংস করে লাভ নেই, তাতে সতর্ক হয়ে যাবে বাকিরা। আজ রাত বারোটায় আমার এবারকার মিশনের সময় শেষ। মাদার শিপটা আসবে তুলে নিতে। লেকের পাড়ে। ঠিক মাঝরাতে।'

মাঝরাত!

চমকে গেল কিশোর-মগজ। মাঝরাতে লেকের পারে দেখা করতে

বলেছে রবিনকে। মুসা আর জিনাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছে। সর্বনাশ! ভয়ানক বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওদের।

'রবিনদের কথা ভাবছ তো?' দানব-মগজটা বলল। 'ভালই করেছ ওদের লেকের পাড়ে যেতে বলে। ওদের তুলে নিয়ে যেতে বলব আমি আমার কমরেডদের। তোমার মত আরও কয়েকজনের ছদ্মবেশ ধরতে পারবে আমাদের এজেন্টরা। একটা কাজের কাজই হবে। আসল মিশন ব্যর্থ হলো বলে আমার ওপর আর রাগ করবেন না লীডার...'

ছবি চলে গেল পর্দা থেকে। ফিতে শেষ। কিংবা ক্যামেরাটা থেমে গিয়েছিল, আর ছবি ওঠেনি।

মাথার চাপটা কমে গেল কিশোরের। যে কোন কারণেই হোক, অফ হয়ে গেছে দানব-মগজটা। আয়নায় নিজের দিকে তাকাল সে। কিশোরের চেহারাই দেখা যাচ্ছে এখন। বুঝতে পারছে, দানবের রূপ ধরে ডাক্তারকে পিটিয়ে ক্যাসেটটা হাতিয়ে নিয়ে ডাক্তারের গাড়ি নিয়েই পালাচ্ছিল দানবটা। পুলিশের তাড়া খেয়ে বাঁচার জন্যে আবার কিশোরের ছদ্মবেশ ধরেছে। সেই রূপেই আছে এখন। মগজটাও কাজ করছে কিশোরেরই।

ভাবল, রবিনদের সাবধান করে দিতে হবে যাতে লেকের পাড়ে না যায়। লাফ দিয়ে গিয়ে ছোঁ মেরে রিসিভারটা তুলে নিল কিশোর। ফোন করল রবিনদের বাড়িতে।

এবারও ফোন ধরলেন রবিনের আম্মা। 'হালো?'

'আন্টি, আমি কিশোর। রবিনকে...' থেমে গেল কিশোর। খুট করে একটা শব্দ হয়েছে লাইনে। মুহূর্তে বুঝে গেছে কি ঘটেছে। ফোনটা এখন ডেড।

ডায়াল টোন নেই। একেবারে স্তব্ধ। তার কেটে দেয়া হয়েছে।

দপ করে নিভে গেল ঘরের বাতি। মেইন সুইচ বন্ধ করে দিয়েছে।

বাড়িতে ঢুকেছে কেউ!

পা টিপে টিপে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল। জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে চোখ পড়তে গাড়িটা দেখতে পেল। বহু পুরানো ৬৮ মডেলের ঝরঝরে একটা পন্টিয়াক দাঁড়ানো। গাড়িটা এর আগে কখনও দেখেনি সে।

কিশোরদের পাশের বাড়িটা, অর্থাৎ পড়শীর বাড়িটা ইয়ার্ড থেকে বেশ খানিকটা দূরে। জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। জেগেই আছে। একটা প্ল্যান দ্রুত তৈরি হয়ে যেতে লাগল কিশোর-মগজে। কেউ যে হামলা করতে আসছে তার ওপর, বুঝে গেছে। হামলাকারী কাছে আসার আগেই চুপ করে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে সে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে চলে যাবে পড়শীর বাড়িতে। পুলিশকে ফোন করতে পারবে ওখান থেকে।

ডাইনিং রুম পার হয়ে পেছনের দরজার কাছে চলে এল সে। পালানো খুব একটা কঠিন হবে বলে মনে হলো না।

কিন্তু হামলাকারী তারচেয়ে কম চালাক নয়।

দরজার বাইরে বেরিয়ে আঙিনায় নামার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের অন্ধকার থেকে বলে উঠল একটা খসখসে কণ্ঠ, 'চমকে দিলাম, তাই না?'

কিশোর কিছু করার আগেই একটা কাপড়ের থলে টেনে দেয়া হলো ওর মাথার ওপর দিয়ে। টানাটানি করে খোলার চেষ্টা করল কিশোর। পারল না। লোকটা অসম্ভব শক্তিশালী। তার দুই হাত পেছনে মুচড়ে নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেলল। মাথার পেছনে শক্ত বাড়ি লাগল কঠিন কোন জিনিসের। দ্বিতীয়বারের মত বেহুঁশ হলো সেদিন কিশোর।

এগারো

এবং দ্বিতীয়বারের মত সেদিন অন্ধকারে জ্ঞান ফিরল তার। নাকে ঢুকল গাড়ির তেলের গন্ধ। প্রচুর ঝাঁকি লাগছে। দুই-দুইয়ে যোগ করে অনুমান করে নিল গাড়ির ট্রাংকে ভরে রাখা হয়েছে ওকে। নিশ্চয় রাস্তায় দাঁড়ানো সেই পন্টিয়াকটাতে।

একটা ব্যাপার খচখচ করছে মনে। এবার তার পিছনে কে লেগেছে? ভিনগ্রহবাসী অন্য কেউ? সম্ভাবনাটা কম। ওরা জানে সে ওদের অনুচর, ওদের কথা মত কাজ করছে। তবে এমন হতে পারে কোন কারণে সন্দেহ হয়েছে ওদের, অন্য কোন এজেন্টকে পাঠিয়েছে যাচাই করে দেখার জন্যে।

আরও কিছুদূর চলে থামল গাড়ি। ট্রাংকের তালা খোলার শব্দ হলো। ডালা উঠল। কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কিশোর। মাথায় থলে পরানো। শক্ত হাত টেনে-হিঁচড়ে বের করল তাকে। কথা বলার চেষ্টা করল। তা-ও পারল না। টেপ আটকে রাখা হয়েছে মুখে। ও যখন বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল, তখনই নিশ্চয় আটকানো হয়েছিল।

ঠেলেঠুলে তাকে গাড়ির সীটে বসিয়ে দেয়া হলো। ট্রাংকের ডালা লাগানোর শব্দ শুনতে পেল। তারপর দড়াম করে বন্ধ হলো ড্রাইভিং সীটের পাশের দরজা। আবার চলতে শুরু করল গাড়ি।

মাথা থেকে হ্যাঁচকা টানে থলে খুলে নেয়া হলো। পেশিবহুল একজন মানুষকে দেখতে পেল সে। দেখামাত্র চিনল।

'চিনতে পারছ আমাকে, কিশোর?' স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরেছে লোকটা, রাস্তার দিকে চোখ।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

লোকটা মার্টিন ড্রোজার, সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কিশোরকে খুঁজে বের করার জন্যে নিয়োগ করেছিলেন তার চাচা। কিন্তু ও এখন তাকে কিডন্যাপ করছে কেন? সে ও কি ভিনগ্রহবাসী কিংবা ভিনগ্রহবাসী কোন খুনী ভর করেছে তার ওপর?

শহরের বাইরে চলে এসেছে গাড়ি। নির্জন হাইওয়ে ধরে দূরে সরে

যাচ্ছে। এক সময় রকি বীচের আশেপাশে যখন মাইনিং কলোনিগুলো গড়ে উঠেছিল, তখন মূল শহরের সঙ্গে যুক্ত ছিল অনেকগুলো রাস্তা—তারই একটা এখন হাইওয়ে হয়েছে, আর সেটা ধরেই ছুটে চলেছে গাড়ি। পোড়ো কোন খনি-শহরে তাকে নিয়ে যাচ্ছে নাকি লোকটা? কেন? আটকে রাখার জন্যে? নাকি খুন করার জন্যে?

'চিনতে পারায় খুশি হলাম, খোকা,' তরল কণ্ঠে বলল ড্রোজার। 'তারমানে স্মৃতিশক্তি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি তোমার। আমার চেহারার ছাপ ঠিকই পড়েছে ওখানে যাকগে, তুমি নিশ্চয় জানো, আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ

ভুসভুস করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে লোকটার মুখ থেকে। সহ্য করতে পারছে না কিশোর

'নয়টি মাস ধরে তোমার কেসটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আমি,' লোকটা বলল। 'তোমার সম্পর্কে সব জানা আছে আমার। তুমিও একজন শখের গোয়েন্দা। আমার চেয়ে অনেক বেশি খুঁতখুঁতে। কোন রহস্যের কিনারা করতে না পারা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। নিশ্চয় ভেবে মরছ এখন, ঘটছেটা কি?'

ভুল বলেনি ড্রোজার। সে কি করতে চাইছে, সত্যি জানতে চায় কিশোর। তবে 'তোমার সম্পর্কে আমি সব জানি' এ কথাটা ঠিক বলেনি লোকটা। সে নিশ্চয় জানে না, ডাক্তার জগের অফিসে সত্যি সত্যি কি ঘটেছে। কিশোররূপী ছেলেটার মগজে কোন দানব বাসা বেঁধে আছে, সেটাও হয়তো কল্পনা করতে পারছে না সে

'সবাই আমাকে জানিয়েছে, ড্রোজার বলল, 'গোয়েন্দা হওয়ার জন্যে তুমি পাগল। তুমিও গোয়েন্দা, আমিও গোয়েন্দা—গোয়েন্দা মানসিকতার মানুষগুলোর কৌতূহল আমার জানা সুতরাং অকারণে তোমাকে অন্ধকারে রাখার কোন যুক্তি দেখতে পাচ্ছি না আমি কেন কিডন্যাপ করেছি সেটা নিয়ে কৌতূহল হচ্ছে তো? শোনো, এর কারণ, টাকা তোমাকে খুঁজে বের করার জন্যে নয় মাসে অনেক টাকা দিয়েছেন আমাকে তোমার চাচা ভাল অবস্থায় ছিলাম আমি, খরচের হাত বেড়ে গিয়েছিল—মাসে মাসে এত টাকা জীবনেও আর কামাইনি কখনও, বেশ আরামেই ছিলাম।' স্টিয়ারিঙে আচমকা মোচড় দিয়ে রাস্তার পাশে গাড়ি নামিয়ে নিল ড্রোজার ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল হেডলাইট নিভাল এতক্ষণে আর কোন গাড়ি চোখে পড়েনি কিশোরের এখনও পড়ছে না। যেন নো-ম্যানস-ল্যান্ডে পৌঁছে গেছে ওরা

'তারপর বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ করেই এসে উদয় হলে তুমি। দিলে আমার ইনকামের বারোটা বাজিয়ে স্বভাবতই টাকা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে তোমার চাচা কিশোর, ভেবে দেখো ব্যাপারটা, মাসে মাসে এতগুলো টাকা বন্ধ হয়ে গেলে তোমার কি অবস্থা হত? তোমার ওভাবে উদয় হওয়াটা কি ঠিক হয়েছে?' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলল ড্রোজার, 'ভাল একটা চাকরি ছিল আমার, দু'হাতে খরচ করেছি, রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছি, ঘুম থেকে উঠেই খবর পেলাম চাকরি নট—তোমার হলে কেমন লাগত?

'প্রাইভেট ডিটেকটিভের যে ভাত নেই আজকের দুনিয়ায়–কোনকালে ছিল কিনা তাতেও সন্দেহ আছে আমার–সেটা বোধহয় তোমার জানা নেই। জানলে আর গোয়েন্দা হতে চাইতে না। অবশ্য তোমার কথা আলাদা। বড়লোক চাচার একমাত্র উত্তরাধিকারী, এ সব বিলাসিতা তোমাদের মানায়। কিন্তু আমার বেলায়?' ঢেকুর তুলল ড্রোজার। ভুসভুস করে মদের দুর্গন্ধ বেরিয়ে এল পেট থেকে। নাকমুখ বিকৃত করে ফেলল কিশোর। সেটা লক্ষ করল না ড্রোজার। বলল, 'তোমার কেসটা এখনও অমীমাংসিত। পুলিশ এখনও রহস্যটার কোন কিনারা করতে পারেনি। তোমার ফিরে আসার পর চাপাচাপি শুরু করেছে ওরা আমাকে। আমি যা যা জানি জানাতে বলছে, নইলে লাইসেন্স ক্যান্সেল করিয়ে দেবার হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু কি বলব ওদের? বিশ্বাস করো, ন'টি মাসে একটি সূত্রও আমি বের করতে পারিনি। কোন সূত্র নয়। এগোনোর কোন পথ নেই। একজন সন্দেহভাজনকে খুঁজে পাইনি। কিছু না। কিচ্ছু না। তোমাকে বলতে বাধা নেই, কিশোর, এত বিস্ময়কর জটিল কেস, এ রকম রহস্যের মুখোমুখি এত বছরের গোয়েন্দা জীবনে কখনও হইনি আমি।

'যাই হোক, চাকরিটা যাওয়ার পর ভাবনায় পড়ে গেলাম,' বলতে থাকল ড্রোজার। 'ভাবলাম, আবার যদি তুমি গায়েব হয়ে যাও তাহলে কি হয়? যদি আবার কিডন্যাপ করা হয় তোমাকে? আবার তোমার চাচা নিয়োগ করবেন আমাকে। টাকা দেবেন। হয়তো বেশিদিন আটকে রাখতে পারব না তোমাকে তবে জিম্মি রেখে তোমার চাচার কাছ থেকে মোটা টাকা আদায়ের সুযোগ এবং সময় দুটোই পাব। টাকাটা হাতিয়ে নিয়ে গায়েব হয়ে যাব রকি বীচ থেকে চলে যাব অন্য কোন রাজ্যে। পুলিশ আমার টিকিটিও ছুঁতে পারবে না

ড্রোজারের উদ্দেশ্য এতক্ষণে পরিষ্কার হলো কিশোরের কাছে ড্যাশবোর্ডের ঘড়ির দিকে তাকাল এগারোটা তিরিশ বাজে আধঘণ্টার মধ্যে রবিনরা পৌঁছে যাবে লেকের পাড়ে সময়মত ওদের সাবধান করে দিতে না পারলে শয়তান ভিনগ্রহবাসীদের খপ্পরে পড়বে ওরা হয়তো চিরকালের জন্যে নিখোঁজ হয়ে যাবে। কেউ আর কোনদিন খুঁজে বের করতে পারবে না ওদের কিংবা ফিরে আসবে কিশোরের মত দানব-খুনীদের রূপ ধরে তছনছ করবে শান্তিময় পৃথিবীটাকে।

কিন্তু ওদের কাছে যেতে হলে নিজেকে মুক্ত করতে হবে আগে।

'আমার কথায় মনে হয় কান দিচ্ছ না তুমি?' ড্রোজার বলল। 'আমার কথার মানে বুঝতে পেরেছ? তোমাকে কিডন্যাপ করেছি আমি।'

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। মুক্তি পাবার একটাই উপায় দেখতে পাচ্ছে–ডক্টর জগের অফিসের মত কোনভাবে যদি নিজের রূপটা বদলে ফেলতে পারে। ড্রোজারকে তখন কাবু করা সম্ভব। কিন্তু জানতে হবে কি করে নিজেকে রূপান্তরিত করতে হয়। ডাক্তারের অফিসে করেছিল সম্মোহিত অবস্থায়। সচেতন থেকে কি করে করতে হয় জানা নেই। আরেকটা চিন্তা ঢুকল মাথায়। দানবে পরিণত হওয়ার পর রবিনদের প্রতি সহানুভূতিটা থাকবে তো? নাকি শত্রু ভেবে ক্ষতি করার ইচ্ছেটাই প্রবল হবে?

এত কথা ভাবার সময় নেই এখন। ঝুঁকি নিতেই হবে।

'অ্যাই, কথা বলছ না কেন! তোমাদের মত ছেলেদের নিয়ে এটাই সমস্যা,' বিরক্ত হয়ে উঠেছে ড্রোজার। 'তোমাদের বিশ্বাস, দুনিয়ার কোন কিছুই তোমাদের ছুঁতে পারে না, কোন বাধাই বাধা নয় তোমাদের কাছে।'

ড্রোজারের কথা কানে ঢুকছে না কিশোরের। বুঝতে চাইছে, ডাক্তারের অফিসে পরিবর্তনটা তার কখন, কিভাবে ঘটেছিল। সম্মোহিত অবস্থায় তার সচেতন মগজ কাজ করছিল না। নিজেকে আবার সেই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? নিজে নিজে সম্মোহিত হওয়া? কিংবা অবচেতন মনের প্রবল ইচ্ছে শক্তিকে জাগিয়ে তোলা?

চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই। চোখ বন্ধ করে অবচেতন মনটাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চালাল সে। মনের সমস্ত ইচ্ছেশক্তি এক করে ভাবতে শুরু করল, সে ঘুমের জগতে চলে যাচ্ছে। কল্পনা করতে লাগল, সে আর কিশোর পাশা নয়, অন্য কেউ। সেই 'কেউ'টাকে কিশোর পাশার জায়গায় ঠাঁই নেয়ার জন্যে জোরাল আবেদন জানাতে শুরু করল। হঠাৎ মনে হলো কাজ হচ্ছে! নিজের মধ্যে ধীর পরিবর্তনটা টের পেতে আরম্ভ করল।

'কি ব্যাপার, কিশোর, অমন করছ কেন তুমি?' শঙ্কিত হয়ে উঠল ড্রোজার। 'কাঁপছ কেন অমন করে? জ্বর আসছে?'

মাথার মধ্যে গরম লাগছে কিশোরের। সত্যি যেন জ্বর আসছে। একশো সাত-আট ডিগ্রি। উত্তাপটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল সমস্ত দেহে। প্রচণ্ড শক্তি তৈরি হচ্ছে শরীরে।

'কথা বলছ না কেন, খোকা? অ্যাই, কিশোর?' মনে পড়ল ড্রোজারের, মুখে টেপ আটকে রাখলে কেউ কথা বলতে পারে না। একটানে খুলে দিল টেপটা।

সরাসরি তার কিডন্যাপারের দিকে তাকাল কিশোর, কিংবা তার পরিবর্তিত রূপ। নিতান্তই ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে এখন লোকটাকে। বিড়াল যে ভঙ্গিতে ইঁদুরের দিকে তাকায়, তেমনি করে তাকাল যেন কিশোরের রূপান্তরিত দেহ। তারমানে কাজ হয়েছে। দানবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে সে।

ড্রোজারের চোখে আতঙ্ক দেখতে পেল কিশোর। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে টিভির পর্দা থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকা দানবটার চোখের জায়গায় দুটো ডিস্কের মত চ্যাপ্টা গোল গোল জিনিস।

'খোকা!' ড্রোজারের সম্বোধনটাই তাকে ফিরিয়ে দিল কিশোর। 'ভুল দিনে ভুল লোককে কিডন্যাপ করতে এসেছ তুমি।'

মরুভূমির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আগুন-গরম দমকা বাতাসের মত এসে প্রচণ্ড শক্তি যেন ছড়িয়ে পড়ল কিশোরের দেহের অণু-পরমাণুতে। 'ইনক্রেডিবল হাল্কের' মত বিশাল হয়ে যাচ্ছে দেহটা। পটপট করে ছিঁড়তে শুরু করেছে কাপড়ের সেলাই। কিন্তু এত দ্রুত বেড়ে গেল শরীর, সুতো ছিঁড়েও শেষ রক্ষা করতে পারল না কাপড়, ফড়ফড় করে ছিঁড়ে যেতে লাগল। প্রচণ্ড চাপে ঠাস করে ছিঁড়ে গেল চামড়ার সীটবেল্ট। ইস্পাতের তারের মত পেশি গজিয়ে

উঠেছে দুই বাহুতে।

আতঙ্কে হাঁ হয়ে গেছে ড্রোজারের মুখ।

'তুমি আমাকে কিডন্যাপ করেছিলে না,' নিজের কানেই নিজের কণ্ঠস্বর বেখাপ্পা শোনাল কিশোরের। ওর কণ্ঠ নয়। বড়ই যান্ত্রিক, অন্য কারও গলা। 'এখন আমি তোমাকে কিডন্যাপ করলাম মিস্টার মার্টিন ড্রোজার।'

চিৎকার করে ওঠার আগেই পিস্টনের মত সবেগে কিশোরের কনুইটা ছুটে গেল একপাশে, ড্রোজারের চোয়ালে আঘাত হেনে স্তব্ধ করে দিল তাকে। কাত হয়ে ঢলে পড়ল ড্রোজারের মাথা। এক আঘাতেই বেহুঁশ। দুই মিনিটের মধ্যেই ট্রাংকে চলে গেল সে, কিশোর যেখানে ছিল।

কি ভাবে উল্টে গেল দাবার ছক! প্রচণ্ড এই ক্ষমতা এখন উপভোগ করছে কিশোর। মজা পেতে আরম্ভ করেছে।

সীটের ওপর পড়ে আছে ড্রোজারের খাকি ওভারকোটটা। কাঁধের ওপর ওটা টেনে দিয়ে নিজের ছেঁড়া পোশাক ঢাকল কিশোর। গাড়িতে উঠল। ড্রাইভিং সীটে।

ঘড়িতে দেখল: পঁচিশ মিনিট বাকি।

বারো

হাইওয়ে ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে নিজের মগজের সঙ্গে কথা বলতে লাগল সে। কিশোর পাশার ভাল চিন্তাগুলোকে এখনও গ্রাস করে ফেলতে পারেনি ভিনগ্রহবাসী দানবের মন্দ চিন্তা। দানবে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতাটা বজায় থাকলেও মগজের কোষগুলো বোধহয় গড়বড় হয়ে যাচ্ছে, কিশোর পাশার মগজটাকে দখল করতে পারছে না আর ডাউনলোড করা দানবের মগজের সফটওয়্যার। চকিতেই কথাটা মাথায় এল কিশোরের, কোন ধরনের 'কম্পিউটার ভাইরাস' না তো! মানুষের মগজ এক ধরনের কম্পিউটার–কিংবা বলা যায় মানুষের মগজের আদলেই তৈরি করা হয়েছে কম্পিউটারের ব্রেন। সেটাকে যদি ভাইরাস দূষণে দুষ্ট করা যেতে পারে, মানুষের মগজকে যাবে না কেন? তারমানে অতি উন্নত কোন গবেষণাগারে নিয়ে গিয়ে তার মগজটায় দুষ্ট ভাইরাস ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেই ভাইরাসের প্রভাব এখন কাটতে শুরু করেছে। মন্দ ভাবনা আর পেরে উঠছে না ভাল ভাবনার সঙ্গে। রক্ত বদল করেও ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল কোন ধরনের প্রচণ্ড ক্ষমতা। যার সাহায্যে সে নিজের রূপ বদল করে ফেলতে পারে।

ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড–ঝট করে মনে পড়ে গেল তার। গল্পটাকে আর গল্প মনে হচ্ছে না এখন। তার নিজের বেলাতেই ঘটে গেছে। তারমানে, বাস্তব!

ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে শহরে প্রবেশ করল সে। বন্ধুদের বাঁচানোর

চিন্তাটা এখনও প্রবল মনের মধ্যে। পুলিশের টহল-গাড়ির সামনে পড়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। ওর এই ইনক্রেডিবল হাল্ক রূপ দেখলে সন্দেহ করে বসবে পুলিশ। কি করা যায়? কল্পনায় ড্রোজারের চেহারা দেখতে শুরু করল সে। কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না রূপান্তর ঘটাতে। রিয়ারভিউ মিররে নিজের চেহারা দেখে নিজেই তাজ্জব হয়ে গেল। মার্টিন ড্রোজার হয়ে গেছে সে। পুলিশ তো দূরের কথা, ড্রোজারের মা দেখলেও এখন নিজের ছেলে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারবে না।

রাস্তার বাঁকে এসেও গতি কমাল না কিশোর। সময়মত লেকের পাড়ে পৌঁছানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভুলটা করল গতি না কমিয়ে। টহল পুলিশের চোখে ঠিকই পড়ে গেল। লাল-নীল বাতির ঝিলিক তুলে, পোঁ-পাঁ পোঁ-পাঁ করে সাইরেন বাজিয়ে ছুটে আসতে লাগল টহল পুলিশের একটা গাড়ি।

না থামালে বিপদ। ফোনে সতর্ক করে দেবে আশেপাশের সমস্ত গাড়িকে। চতুর্দিক থেকে এসে ঘিরে ফেলবে তখন ওকে ওরা।

ইঙ্গিত পেয়ে গাড়ি থামাল কিশোর। পাশ কেটে গিয়ে তার গাড়ির পথ আটকে দিয়ে গাড়ি থামাল টহল পুলিশ। গাড়ি থেকে নেমে এল একজন তরুণ অফিসার। নতুন ভর্তি হয়েছে মনে হয়। রকি বীচে দেখেনি আগে কখনও। ইয়ান ফ্লেচারের অফিসেও না। নয় মাস অনেক দীর্ঘ সময়–ভাবছে কিশোর। মাত্র ক'মাসে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে শহরটায়!

টহল পুলিশের সঙ্গে তর্ক করলেই জটিলতা বাড়ে, জানা আছে তার। যা বলে, মেনে নেয়াটা সবচেয়ে উত্তম। জরিমানা করে টিকেট ধরিয়ে দিত যদি এখন, বাঁচা যেত। কম সময় নষ্ট হত তাতে।

কি করবে বোঝার উপায় নেই। যতটা সম্ভব শান্ত হয়ে বসে রইল কিশোর। কিন্তু মগজের মধ্যে খোঁচানো শুরু করেছে দানব-মগজ: মানুষটাকে পাত্তা দিও না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে দাও খতম করে! দানব-মগজকে জোর করে সরিয়ে দিল কিশোরের মগজ। বোঝাল, খবরদার, ওসব করতে যেও না! গুলি খেয়ে মরবে!

জানালায় উঁকি দিল অফিসার। টর্চের আলো পড়ল কিশোরের মুখে। অপরাধীর লজ্জিত, মোলায়েম হাসি হাসল কিশোর। 'গুড ইভনিং, অফিসার,' কানে বাজল ড্রোজারের কর্কশ কণ্ঠ, এটাও বড় বেখাপ্পা লাগল কিশোরের। তখন মনে পড়ল, ড্রোজার সেজে বসে আছে সে। 'গতি কি বেশি বাড়িয়ে ফেলেছিলাম?'

'অনেক বেশি।'

'তাই?'

'কেন, খেয়াল করেননি?'

'না, ভাই। তাহলে কি আর করতাম?'

'চালাকি করছেন নাকি?'

'না না, কি যে বলেন! তা করব কেন? ভুলটা তো আমারই।'

'তারমানে তাড়া আছে আপনার। এত রাতে এত তাড়া কিসের?'

মিথ্যে বললে সন্দেহ আরও বাড়বে লোকটার। সত্যি কথাই বলল কিশোর, 'আমার বন্ধুদের কথা দিয়েছি, অফিসার। ওরা এসে বসে থাকবে। দেরি করলে লজ্জায় পড়ে যাব।'

সন্তুষ্ট হলো অফিসার। সত্যি কথা বুঝতে না পারার মত বোকা সে নয়। 'বুঝলাম। কিন্তু আপনি আইন তো অমান্য করেছেন।'

'তা করেছি।'

'লাইসেন্স আর অন্যান্য কাগজপত্র,' হাত বাড়াল অফিসার। 'প্লীজ!'

আতঙ্কের অসংখ্য তীক্ষ্ণ সুচ ফুটিয়ে দিল যেন কেউ কিশোরের শরীরে। লাইসেন্স! লাইসেন্স পাবে কোথায়? যদি বলে নেই, তাকে সহ গাড়িটা নিয়ে যাবে এখন থানায়। এত সময় এখন নেই তার হাতে।

আবার মনে পড়ল, সে এখন কিশোর পাশা নয়–মার্টিন ড্রোজার। ড্রোজার নিশ্চয় লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালায় না। এবং এটা ড্রোজারের গাড়ি। কথাটা মনে পড়তেই ওভারকোটের পকেটে হাত ঢোকাল সে। কিছুই ঠেকল না হাতে। অন্য হাত ঢোকাল অন্য পকেটে। শক্ত কিছু লাগল এবার। বের করে আনল।

ড্রোজারের ওয়ালেট। দুটো কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিল অফিসারের দিকে।

ভাল করে দেখে অফিসার বলল, 'মিস্টার ড্রোজার, একটা টিকেট ধরিয়ে দেয়াটাই এখন উচিত ছিল আমার। কিন্তু অকপটে দোষ স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া টিকেট দিতে গেলে অন্তত পনেরোটা মিনিট নষ্ট হবে। বন্ধুদের কাছে লজ্জায় ফেলতে চাই না আপনাকে। এবারের মত ছেড়ে দিলাম। তবে দয়া করে আবার গতি বাড়াবেন না।'

'থ্যাংক ইউ, অফিসার। সত্যি, আমি কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম আপনার কাছে।'

এতক্ষণে হাসি ফুটল অফিসারের মুখে। 'ঠিক আছে। যান।'

এই সময় শব্দটা শুনতে পেল কিশোর। থাপ-থাপ-থাপ! নির্জন হাইওয়ের নীরবতার মাঝে বড় বেশি জোরাল।

ট্রাংক থেকে শব্দ আসছে। তারমানে হুঁশ ফিরে পেয়েছে ড্রোজার। গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে অফিসার কি শুনতে পাবে শব্দটা?

'কিসের শব্দ?' মুহূর্তে অফিসারের টর্চের আলো ঘুরে গেল ট্রাংকের দিকে।

ধড়াস ধড়াস করছে কিশোরের বুক। এর কি জবাব দেবে সে?

আতঙ্ক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তার 'কিশোর-মগজে'। দানব-মগজ বলছে: খুন করো লোকটাকে, ল্যাঠা চুকে যাক! কিন্তু কুবুদ্ধি দিয়ে কিশোরের মগজকে পরাস্ত করতে পারল না সে। হাত দুটো চেপে বসল স্টিয়ারিঙে। দুটো প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে এখন কিশোরের মগজকে: সামনে পুলিশ, মগজের মধ্যে দুষ্ট-দানবের ভাইরাস কিংবা মগজের কোষ, যা-ই

হোক।

'কি-কি-ক্কিছু না, অফিসার!' কোনমতে বলল সে।

'তাই?' ট্রাংকের দিকে তাকিয়ে আছে অফিসার। কিশোরের দিকে ফিরল।

মলিন হাসি ফুটল কিশোরের মুখে।

'এত নার্ভাস লাগছে কেন আপনাকে, মিস্টার ড্রোজার?' অফিসারের প্রশ্ন। 'দয়া করে যদি বাইরে আসেন একবার...'

'বেশ, আসছি।'

'আস্তে আস্তে নামবেন,' দুই পা পিছিয়ে গেল অফিসার। 'দুই হাত সামনে বাড়িয়ে। পিস্তল বের করবেন না আবার।'

তারমানে পুরোপুরিই সন্দেহ করে বসেছে তাকে অফিসার।

ট্রাংকের ভেতর থেকে গোঙানি ভেসে এল।

আস্তে করে গাড়ি থেকে নেমে এল কিশোর। ট্রাংকের দিকে মাথা ঝাঁকাল অফিসার। 'কাউকে ভরে রেখেছেন নাকি ওখানে?'

'না, অফিসার,' সরাসরি মিথ্যে বলল এখন কিশোর। মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করেছে মগজের দানবটা।

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন কোন মানুষ নেই ট্রাংকের মধ্যে? আপনাআপনি এ সব উদ্ভট শব্দ বেরোচ্ছে? বেশ, দেখা যাক কি আছে।' হাত বাড়াল অফিসার, 'চাবি!'

ট্রাংকের মধ্যে রীতিমত ঝড় তুলল এখন ড্রোজার। কিল মারছে, লাথি মারছে। এত তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে পাবে ভাবেনি কিশোর। তাহলে অন্য ব্যবস্থা করত।

'দেখুন, অফিসার,' কণ্ঠস্বর বদলে গেল কিশোরের, ড্রোজারের কণ্ঠও নয়, বেরিয়ে আসছে রোবটের মত যান্ত্রিক কণ্ঠ, 'আপনার নিজের ভালর জন্যেই বলছি...'

'চাবি!' গর্জে উঠল অফিসার। 'জলদি করুন!'

ইগনিশন থেকে চাবির রিঙটা খুলে দিল কিশোর। দানব-মগজটা জয়ী হয়ে যাচ্ছে, সরিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে কিশোরের শুভবুদ্ধিকে।

ট্রাংকের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে অফিসার। চাবি দিয়ে তালা খুলল। ডালার হাতল ধরে টান দিতেই লাফ দিয়ে উঠে গেল স্প্রিং লাগানো ডালা।

ট্রাংকের লোকটার মুখের ওপর আলো ফেলেই স্থির হয়ে গেল অফিসার। বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের চোখকে। এক চেহারার দুজন লোক! সত্যি দেখছে কিনা বোঝার জন্যে ঘুরতে গেল কিশোরের দিকে।

কিন্তু দেখা আর হলো না। কিশোরের ডান হাতের একটা পাশ কারাতের কোপের ভঙ্গিতে তীব্র গতিতে নেমে এল অফিসারের ঘাড়ে। রেঞ্চের হাতল দিয়ে বাড়ি মারার মত শক্ত আঘাত। ড্রোজারের গায়েও কম জোর ছিল না, মনে আছে কিশোরের। এখন ড্রোজার সেজেই আঘাত করেছে সে। টুঁ শব্দ না করে জ্ঞান হারাল অফিসার।

দ্বিতীয় আঘাতটা করল আসল ড্রোজারকে। এবার অনেক জোরে মারল। নিশ্চিত হয়ে নিল, যাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আর হুঁশ না ফেরে ড্রোজারের। ট্রাংকের ডালা নামিয়ে তালা লাগিয়ে দিল আবার।

তীব্র গতিতে হাইওয়ে ধরে আবার গাড়ি ছোটাল কিশোর। গতি আগের চেয়ে বেশি। ঘণ্টায় একশো মাইল। টহল পুলিশের পরোয়া করল না। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে।

তবে এবার আর টহল পুলিশে ধরবে না তাকে, জানে। কারণ পুলিশের গাড়িটাতে করেই চলেছে। অফিসারকে বেহুঁশ করে, তাকে পুলিশের গাড়ির ট্রাংকে আটকে রেখে, তার রূপ ধরেছে। তার পোশাকগুলো পরেছে। ছদ্মবেশ নিতে ছোটবেলা থেকেই মজা পায় কিশোর। এত নিখুঁত ছদ্মবেশ নেয়ার সাংঘাতিক ক্ষমতাটা উপভোগ করছে রীতিমত।

সাইরেন অফ করে দিয়েছে কিশোর। এত সাইরেন শুনলে রাস্তার অন্যান্য টহল পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে। এসে ঝামেলা বাধাতে পারে।

দানব-মগজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে কিশোর-মগজ। কোনমতে দানবটা একবার জয়ী হয়ে গেলে, সর্বনাশ হয়ে যাবে। পুলিশের গাড়িতে পুলিশের ছদ্মবেশে এমনিতেই একটা বড় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে আছে সে। তার ওপর দানবটা তার মগজকে গ্রাস করে কুবুদ্ধি দিতে থাকলে রবিনরা একজনও বাঁচতে পারবে না, হয় সে নিজের হাতে খুন করবে ওদের, নয়তো ধরে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে ভিনগ্রহবাসীদের।

দানবটা যাতে প্রশ্রয় না পায় সেজন্যে ভাল ভাল কথা ভাবতে লাগল কিশোর। তার নিজের জীবনের কথা। অতীতের কথা। অন্যমনস্ক হওয়ার আরও সুযোগ ঘটল। গাড়ির রেডিওটা বেজে উঠল হঠাৎ: 'ডিসপ্যাচ বলছি! শুনতে পাচ্ছ? ওভার!'

নিজের অজান্তেই অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেডিওর মাইক্রোফোনটা তুলে নিল পুলিশ অফিসার রূপী কিশোরের হাত, 'পাচ্ছি, ডিসপ্যাচ! কি চাও? ওভার!'

'সে ইয়োর ফরটি!'

পুলিশী কথাবার্তাগুলো মোটামুটি জানা আছে কিশোরের। 'সে ইয়োর ফরটি' মানে হলো 'তুমি কে এবং কোথায় আছো জানাও!' ড্যাশের নিচে চোখ চলে গেল তার। গাড়ির আইডেন্টিফিকেশন পড়ে নিল। জবাব দিল, 'কার ইলেভেন। আমি এখন শহরের বাইরে পুরানো সার্ভিস রোডটাতে আছি।'

'কিছু ঘটেছে নাকি, কার ইলেভেন? তোমাকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে। বিপদে পড়েছ?'

'নিগেটিভ,' অর্থাৎ, না–জবাব দিল কিশোর। 'টিনেজারদের একটা গাড়ির পিছু নিয়েছি। অতিরিক্ত গতিতে ছুটে যাচ্ছে।'

'লেকের দিকে যাচ্ছে না তো?' হাসি শোনা গেল ডিসপ্যাচারের। 'এই ইউ এফ ও সারা শহরটাকে পাগল করে তুলল!'

'মনে হচ্ছে।'

'সাহায্য লাগবে?'

'না, লাগবে না। গোটা দুই ছেলেকে সামলানো কোন ব্যাপারই না। বরং কাছাকাছি কোন গাড়ি আমার পিছু নিয়ে থাকলে সরে যেতে বলো। বেশি পুলিশ দেখলে আর ছেলেগুলো সন্দেহ করে বসলে সতর্ক হয়ে যাবে; ওরা কি করতে যাচ্ছে, আর বুঝতে পারব না।'

'ঠিক আছে। গুড লাক, কার ইলেভেন। ওভার অ্যান্ড আউট!'

মুচকি হাসল কিশোর। রিয়ারভিউ মিররে চোখ পড়তে মুছে গেল হাসিটা। অফিসারের কঠিন চেহারাটা ফুটে রয়েছে সেখানে। পুলিশরূপী চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে কিশোর। ভয়ঙ্কর এক রাত। সাংঘাতিক তার ক্ষমতা! ক্ষণে ক্ষণে নিজের রূপ পরিবর্তন।

মগজে কুবুদ্ধি দেয়ার চেষ্টা চালাতে লাগল দানব-মগজটা। কিশোরের মগজকে হারিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখলের জন্যে মরিয়া।

কোনমতেই ওটাকে পাত্তা দিল না সে। ওটার কথা ভাবতে চাইল না। ভাবলেই যদি জোর পেয়ে যায়! আবার নিজের অতীতের কথা ভাবতে লাগল। বন্ধুদের কথা ভাবল। ওদের সঙ্গে কত ভাল ভাল জায়গায় অ্যাডভেঞ্চার করেছে, সে-সব ভাবল। মুসার অতিরিক্ত খাওয়ার কথা ভেবে হাসল।

রাস্তার পাশে নজর পড়তেই যেন বাস্তবে ফিরে এল। আবার নির্জনতা। শহরের শেষ পেট্রল স্টেশনটাও পার হয়ে এসেছে। লেকের দিকে চলেছে এখন।

বাস্তবে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মগজের মধ্যে গর্জে উঠল দানবটা: জলদি করো! সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে!

তেরো

ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে বারোটা বাজতে ঠিক পাঁচ মিনিট বাকি। লেকের পাড়ে পৌঁছে গেল কিশোর। ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল। মগজের দানবটা ভয়ানক খেপে গেছে। মরিয়া হয়ে উঠেছে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে।

হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে লাফিয়ে নামল কিশোর। দৌড় দিল বেড়ার দিকে। বেড়ার নিচের ফাঁকের কাছে এসে দাঁড়াল। আগের বার যেখান দিয়ে চুরি করে ঢুকেছিল।

বড় বড় ঘাস আর লতা সরিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল ফাঁকে। কাঁটাতারের খোঁচা লাগল কাঁধে। মনে পড়ল, কিশোর পাশার দেহের চেয়ে অফিসারের দেহ অনেক বড়, এই ফাঁক দিয়ে ঢোকাটা তার জন্যে বেজায় কঠিন। কিন্তু রূপ পরিবর্তন করতে গেলে এখন সময় নষ্ট হবে।

বড় শরীর নিয়ে অনেক খোঁচা সহ্য করে, অনেক রক্ত ঝরিয়ে অন্যপাশে চলে এল কিশোর। ঠোঁট কামড়ে ধরে ব্যথা সহ্য করল হাঁপাতে হাঁপাতে

সোজা হয়ে দাঁড়াল। চাঁদের আলোয় তাকাল একটা জখমের দিকে। রক্ত বেরোচ্ছে। রূপালী রক্ত!

ঘড়ি দেখল কিশোর। সাড়ে-তিন মিনিট বাকি। রবিনরা কোথায়? জানে কোনখানে থাকবে। এই অফিসারের বেশে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে বোঝাতে অনেক সময় লাগবে। দৌড়াতে দৌড়াতেই প্রবল ইচ্ছেশক্তি প্রয়োগ করতে থাকল সে কিশোর পাশা হওয়ার জন্যে।

মনে হতে লাগল, সেদিন মুসারা দেরি করে ফেলেছিল, আজ সে নিজে দেরি করে ফেলেছে। লেকের পানির ধারে কেউ নেই। একেবারে নির্জন।

ঘড়ি দেখল। বারোটা বাজতে এখনও এক মিনিট বাকি। ভিনগ্রহবাসীরা কি বারোটার আগেই এসে তুলে নিয়ে গেছে ওদের?

তার প্রশ্নের জবাবেই যেন কথা শোনা গেল ঝোপের ভেতর থেকে, 'কিশোর, আমরা এখানে!'

রবিনের কণ্ঠ।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন কিশোরের। রবিনরা আছে। ভিনগ্রহবাসীরা এখনও কোন ক্ষতি করতে পারেনি ওদের। আর সে নিজেও কিশোর পাশার রূপ নিয়ে ফেলেছে।

ঝোপের কাছে দৌড়ে গেল সে। গায়ে গা ঠেকিয়ে ভেতরে বসে আছে রবিন, মুসা আর জিনা।

'তোমার দেরি দেখে আমরা তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম,' রবিন বলল, 'তুমি আদৌ আসবে কিনা? আসার কথা মনে থাকবে কিনা!'

'তোমাকে দৌড়ে আসতে দেখেছি আমরা,' জিনা বলল। 'দূর থেকে মনে হলো তুমি নও, অন্য কেউ; তারপর দ্রুত যেন বদলে গিয়ে কিশোর হয়ে গেলে।...আরি, তোমার গায়ে পুলিশের পোশাক কেন?'

'তাই তো!' এতক্ষণে যেন ব্যাপারটা লক্ষ করল রবিন আর মুসা।

গম্ভীর কণ্ঠে কিশোর বলল, 'ভুল দেখোনি তুমি, জিনা। আমার মধ্যে একটা অলৌকিক ক্ষমতা জন্মেছে। নিজের দেহকে বদল করে অন্য যে কারও মত হয়ে যেতে পারি। পুলিশ অফিসারের রূপ ধরে আসতে হয়েছে আমাকে। সে অনেক কথা। এখন আর বলার সময় নেই। শুধু শুনে রাখো, আমি তোমাদের কারও জন্যেই নিরাপদ নই। আমি তোমাদের শত্রু। যে কোন মুহূর্তে ভয়ানক দানবে রূপ নিতে পারি আমি। তোমাদের ভয়ানক ক্ষতি করে দিতে পারি তখন।'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে তিনজনে।

মুসা বলল, 'খাইছে! কি বলছ তুমি কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

'না পারার তো কিছু নেই। রিটা আমাকে বিশ্বাস করিয়েছে, প্রমাণ করে দিয়েছে, আমাদের দেহে মস্ত পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে ভিনগ্রহবাসীরা। তারপর সেটা আমি নিজের চোখেও দেখেছি।' আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। 'আজ রাত ঠিক বারোটায় একটা মাদার শিপ নেমে আসবে। তাতে করে তুলে

নিয়ে যাওয়া হবে আমাকে। সামনে পেলে তোমাদেরও নিয়ে যাবে, নয় মাস আগে কিশোর পাশাকে যেমন নিয়ে গিয়েছিল। ভয়ানক একেকটা খুনী বানিয়ে ফেরত পাঠানো হবে পৃথিবীতে।'

'পুরো পাগল হয়ে গেছে ও!' জিনা আর রবিনের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল মুসা।

'না, পাগল আমি হইনি!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'বিশ্বাস করো! না করলে ভয়ানক বিপদে পড়বে তোমরা!'

মগজে ধমক মারছে দানব-মগজটা। কিন্তু দমিয়ে রাখল ওকে কিশোর-মগজ। তবে যে হারে খোঁচাচ্ছে, বেশিক্ষণ পারবে বলে মনে হলো না। দানবটা জিতে গেলেই সর্বনাশ!

আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। মেঘের স্তর দেখা যাচ্ছে কয়েকটা। কোন্‌টার আড়ালে নামবে মাদার শিপটা? রঙিন ফানেল চোখে পড়ছে না এখনও।

রবিনদের দিকে তাকাল আবার কিশোর। 'বাঁচতে চাইলে এসো আমার সঙ্গে! জলদি করো!'

না না, ওদের যেতে দিও না!—ধমকে উঠল মগজের দানবটা। পস্তাবে বলে দিলাম!

পাত্তা দিল না কিশোর। বন্ধুদের দিকে তাকাল। 'দেরি করছ কেন? এসো! নইলে আর সময় পাবে না!'

'চলো, যাই ওর সঙ্গে!' সবার আগে উঠে দাঁড়াল জিনা। 'দেখাই যাক না সত্যি বলছে কিনা!'

দৌড় দিল কিশোর। স্বাভাবিকভাবে পা ফেলতে পারছে না। মনে হচ্ছে সীসা বেঁধে দিয়েছে কেউ তার পায়ে। বুঝতে পারল, দানবটা বিরোধিতা করাতে এমন হচ্ছে। কিন্তু থামল না সে। ভিনগ্রহবাসী দানবের কাছে পরাস্ত হতে চাইল না।

রবিনদের নিয়ে পুলিশের গাড়িটার কাছে পৌঁছে গেল। অফিসারের চেয়ে ছোট শরীর নিয়ে ফোকর গলে আসতে বেগ পেতে হলো না এখন। ড্যাশবোর্ডের দিকে তাকাল। বারোটা বাজতে এক মিনিট বাকি। আকাশের দিকে তাকাল। এখনও কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ভুরু কুঁচকে গাড়িটার দিকে তাকাল রবিন, 'পুলিশের গাড়ি! কি করে জোগাড় করলে এটা?'

'বলার সময় নেই,' তাগাদা দিল কিশোর। 'গাড়িতে ওঠো!'

দানবটা যেন ক্রমাগত খুঁচিয়ে চলেছে তার খুলির গায়ে। হৃৎপিণ্ডের গতি অস্বাভাবিক দ্রুত হয়ে গেছে কিশোরের। আপ্রাণ চেষ্টা করেও দানবের সঙ্গে পেরে উঠছে না আর।

'জলদি করো! গাড়িতে ওঠো! একটা সেকেন্ডও দেরি কোরো না আর!' চিৎকার করে বলল কিশোর।

হঠাৎ তার চোখের দিকে চোখ পড়তে চিৎকার করে উঠল মুসা, 'খাইছে!

ও সত্যি সত্যি দানব হয়ে গেছে! পালাও, জিনা! রবিন!'

চোদ্দ

সাইড-ভিউ মিররে নিজের চোখ দেখতে পেল কিশোর। আবার দুটো গোল ডিস্কে পরিণত হয়েছে।

'তুমি...তুমি...' কিশোরের দিকে তাকিয়ে গাড়ির কাছ থেকে সরে এল রবিন।

'আমি তো এতক্ষণ ধরে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি,' জবাব দিল কিশোর। 'আমার সময় শেষ হয়ে আসছে। না পালালে তোমরাও মরবে। এই গাড়িটা নিয়ে শহরের দিকে চলে যাও...'

জিনা ভাবল, গাড়িতে চড়িয়ে তাদের বিপদে ফেলার চালাকি করছে কিশোরের ভেতরের দানবটা। কিশোরের মুখের কথা বিশ্বাস করতে পারল না। আচমকা ঘুরে আবার বনের দিকে দৌড় মারল সে। লেকের সীমানায় ঢুকে পড়াই নিরাপদ মনে হলো তার কাছে।

বেড়ার ফাঁক গলে আবার লেকের সীমানায় ঢুকে পড়ল সে। পেছনে ছুটল মুসা আর রবিন।

তিনজনই মরবে ওরা! একজনও বাঁচতে পারবে না! হাহাকার করে উঠল কিশোর-মগজ। কিছুই করার নেই আর এখন ওর। দৌড়ে ধরে ফেলা ছাড়া।

বেড়ার ফাঁক গলে এসে সে-ও ছুটল ওদের পেছনে। ঝোপ, লতা, পচা পাতা, কাঁটাঝাড় ঠেলে, মাড়িয়ে যত দ্রুত সম্ভব। এপ্রিলের শীতল বাতাস যেন চিরে ঢুকছে ফুসফুসে। তীক্ষ্ণ পাথরের খোঁচায় পা হয়ে উঠছে রক্তাক্ত।

'দাঁড়াও!' হাপরের মত হাঁপাচ্ছে কিশোর। 'মাদার শিপটা...চলে আসবে...'

'কিসের মাদার শিপ! মিথ্যুক কোথাকার! আকাশে তো কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না!' কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে জবাব দিল জিনা। সবার আগে চলে গেছে সে। তাকে কোনমতেই ধরা সম্ভব নয় আর কিশোরের পক্ষে।

জবাব দিল না কিশোর। একটাই চিন্তা এখন, ওদের ধরতে হবে। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করল সে। টের পেল পা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। চামড়ার রঙ হয়ে যাচ্ছে ফ্যাকাসে।

আবার ভিনগ্রহবাসীতে পরিণত হচ্ছে সে।

অসম্ভব দ্রুতগামী।

দ্রুত কমে আসতে শুরু করল আগে আগে ছুটতে থাকা তিনজন আর ওর মাঝের দূরত্ব। দৌড়ে ওদের ধরে ফেলাটা যেন আর কিছুই না এখন ওর জন্যে। পায়ের পেশিতে কোন টান নেই আর। সাবলীল গতিতে দৌড়াচ্ছে। উড়ে চলেছে যেন পা দুটো। অলিম্পিক গেমসের দৌড়বিদরা এখন ওকে

দেখলে হাঁ হয়ে যেত।

সবচেয়ে পেছনে দৌড়াচ্ছে রবিন। তার পা সই করে ঝাঁপ দিল সে। গোড়ালি ধরে ফেলল। হুমড়ি খেয়ে নরম কাদামাটির ওপর পড়ে গেল রবিন। 'রবিন, দোহাই তোমার, আমার কথা শোনো...'

গড়িয়ে গিয়ে চিত হলো রবিন। মুখ তুলে তাকাল। মুখে রাগ, ভয় দুটোই দেখা যাচ্ছে। 'ছাড়ো! ছাড়ো আমাকে!' কিশোরের মুখে ঘুসি মারার জন্যে হাত তুলল সে।

ঠিক এই সময় বিচিত্র একটা শব্দ শোনা গেল লেকের পানিতে। গলা বাড়িয়ে দিয়ে সেদিকে তাকাল রবিন। মনে হচ্ছে শব্দটা আসছে যেন ওদের নিচ থেকে, জলাভূমির তলা থেকে।

'কিসের শব্দ?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল রবিন।

তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল পর মুহূর্তে। কয়েক হাজার টন ইস্পাত যেন ছিটকে বেরিয়ে এল পানির নিচ থেকে। দানবীয় একটা রূপালী গুবরে পোকার পিঠের মত ভেসে উঠল। ধাতু আর স্ফটিকের মত পদার্থে তৈরি রঙিন জিনিসটা পানির কয়েক ফুট ওপরে উঠে ঝুলে রইল। উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে গা থেকে। অপূর্ব সুন্দর। কিন্তু কিশোর-মগজ এখন জানে, ওই সুন্দরের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে কি ভয়ঙ্কর, মারাত্মক প্রাণীরা।

এটাই মাদার শিপ—বুঝে ফেলেছে সে। উত্তেজিত হয়ে উঠল দানব-মগজ। বলল, জয় তাহলে আমাদেরই হবে! ছেলেমেয়েগুলো পালাতে পারবে না। ধরে ওদের ফেলবই। আমাদের মিশন সফল হতে চলেছে।

ইউ এফ ও-টার দিকে তাকিয়ে আছে বিস্মিত রবিন। ঘুসি মারার কথা ভুলে গেছে। সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর। ঘাড়ের পেছনে বাহু পেঁচিয়ে চাপ দিয়ে অবশ করে ফেলল তাকে। ওর কিশোর-মগজে একটা প্ল্যান তৈরি হচ্ছে। সফল হলে বাঁচাতে পারবে তিনজনকে। সেজন্যেই নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে রবিনকে। বাধা দিতে থাকলে পারবে না।

সরে এসে লেকের মাটির ওপরে থামল মাদার শিপের একটা ধার। গা থেকে ক্রমাগত বিচ্ছুরিত হচ্ছে আঁকাবাঁকা নীল বিদ্যুতের শিখা। শকওয়েভের ধাক্কায় থরথর করে কেঁপে উঠল মাটি। সরে গেল একটা হ্যাচের মত গোল ঢাকনা। নীল রঙের আলো যেন ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে এল খোলা জায়গাটা দিয়ে।

উজ্জ্বল হ্যাচের ভেতর থেকে নেমে এল মস্ত একটা ধাতব মই। ধীরে ধীরে মাটিতে ঠেকল নিচের দিকটা। বিশাল পোকার শুঁড়ের মত ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল যেন নিরাপদ কিনা। তারপর স্থির হলো। মাদার শিপের গ্যাঙওয়ে ওটা—অতি-অতি আধুনিক সিঁড়ি; যেখানে ইচ্ছে খোলা যায়, নামানো যায়, ছোট করা যায়, বড় করা যায়; শিপ থেকে যেখানে ইচ্ছে যাতে নামতে পারে এর যাত্রীরা। জরুরী অবস্থায় শিপটা যখন নড়তে থাকে, তখনও সিঁড়ি নামাতে কোন অসুবিধে নেই। বিশেষ ধরনের স্ট্যাবিলাইজার আছে সিঁড়িতে, যাতে শিপ নড়লেও ওটা স্থির থাকে, ওঠানামা করতে অসুবিধে না হয়।

মানুষের মত দুজন লম্বা লোক নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। চামড়ার রঙ

ফ্যাকাসে। মাথাটা স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে বড়। কালো বড় বড় চোখ। সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপর থেকে লাফ দিয়ে নামল শিকারী বিড়ালের ক্ষিপ্রতায়। নেমেই চোখে পড়ল কিশোরকে। এগিয়ে এল তার দিকে।

ওর মগজের দানব অংশ ওদের দেখে উল্লসিত হলো। কিশোর অংশ শঙ্কিত। পরের কয়েকটা মিনিটেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যাবে। বোঝা যাবে, তিনজনকে বাঁচাতে পারবে কিনা।

কিশোরের দিকে তাকাল একজন ভিনগ্রহবাসী। কিশোরের দেহটা এখন ভিনগ্রহবাসী লোকটার মতই হয়ে গেছে। রবিনকে দেখিয়ে বলল লোকটা, 'এটাকে আটকে ফেলে ভাল কাজ করেছ,' হিসহিসে কণ্ঠস্বর। 'খুব খুশি হবে আমাদের লীডার। বাকিগুলো কোথায়?'

যা করার এখুনি করতে হবে! আর সময় নেই! ভাবছে কিশোর-মগজ।

'ওদিকে,' হাত তুলে দেখাল কিশোর। 'গাড়ি আছে ওদের। মেইনরোডে উঠে গেলে আর ধরতে পারবেন না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দৌড় দিল দুজনে।

'ভুল দিকে দেখিয়েছ তুমি!' ফিসফিস করে বলল বিস্মিত রবিন। 'ব্যাপারটা কি? এ-সব কি ঘটছে? আসলে তুমি কে বলো তো?'

'ঠিক জানি না। তবে আমি সম্ভবত মানুষ নই, কোনও ধরনের রোবট। মানুষ হলে ভিন্ন জাতের মানুষ, তোমাদের মত নই। কিশোর পাশার ছদ্মবেশে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিশনে পাঠানো হয়েছিল আমাকে।'

'তাহলে আসল কিশোর পাশা কোথায়?'

'সেটাও আমি বলতে পারব না।'

'আমাকে আর আমার বন্ধুদের বাঁচানোর চেষ্টা করছ কেন?'

'আমার মগজে প্রোগ্রামিং করার সময় নিশ্চয় ভজঘট করে ফেলেছে ডেলটা বিজ্ঞানীরা,' জবাব দিল কিশোররূপী রোবট। 'ওরা ভেবেছে আমার মগজে কিশোর পাশার মগজের কোষ ঢুকিয়ে দিলে ছদ্মবেশটা নিখুঁত হবে। কারণ তাতে কিশোর পাশার পরিবার আর তোমাদের মত মানুষদের সঙ্গে মিশে যেতে পারব সহজে। সহজই হয়েছিল। কিন্তু এই কোষ ঢোকানো বুমেরাং হয়ে গেছে ডেলটাদের জন্যে। আমার মগজে কিশোর পাশার স্মৃতি-কোষের পরিমাণটা সম্ভবত বেশি হয়ে গেছে। তাতে আসল খুনীর চেয়ে কিশোরের ইচ্ছেটাই প্রাধান্য পাচ্ছে এখন আমার মধ্যে বেশি। সেই সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধি-যুক্তিগুলোও।'

'এই ডেলটারা আবার কারা?'

'সে-সব বলার সময় নেই আর এখন,' কান পেতে আছে কিশোর-রোবট। স্বজাতির চেহারা নিয়েছে এখন। পায়ের শক্তির মত কানের শক্তিও বেড়ে গেছে তাই। শুনতে পাচ্ছে দুই সহকর্মীর ছুটন্ত পদশব্দ। বুঝতে পারছে, খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই কিছু না পেয়ে শৈলশিরার দিক থেকে ফিরে আসবে ওরা।

'যে কোন মুহূর্তে চলে আসবে ওরা,' রবিনকে বলল কিশোর। 'মুসা বা

জিনাকে খুঁজে না পেয়ে।'

উঠে দাঁড়াল রবিন। 'কি করতে বলো আমাকে? পালানোর উপায় কি? কোন বুদ্ধি বের করেছ?'

হাসল কিশোর-রোবট। বিষণ্ন হাসি। জানে, ভয়ানক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে নিজের ওপর। ডেলটারা যখন ধরে ফেলবে তার চালাকি, কি ঘটবে...ভাবতে চাইল না আর সে।

'জোরে কথা বলবে না,' সাবধান করল রবিনকে। 'শুনে ফেলবে ওরা। যা বলি, মন দিয়ে শোনো।'

*

শৈলশিরার কাছ থেকে ফিরে এল দুই ভিনগ্রহবাসী। লেকের কিনারে এসে পড়ে থাকতে দেখল রবিনের অবশ দেহটা।

'তুমি!' চিৎকার করে উঠল একজন। 'তোমাকে যে ধরেছিল সে কোথায়?'

জবাব দিল না রবিন।

'কালা নাকি?' চিৎকার করে বলল দ্বিতীয়জন। 'কই, কোথায় সেই ছেলেটা? আর তোমার বন্ধুরা? জলদি বলো। তাহলে ছেড়ে দেব।'

গুঙিয়ে উঠল রবিন। নড়ে উঠে নিথর হয়ে গেল তার দেহ। নেতিয়ে রয়েছে কাদায়।

'নিশ্চয় মারামারি করে কাহিল হয়ে গেছে,' প্রথমজন বলল। 'খুব পিটিয়েছে মনে হচ্ছে এটাকে।'

'জিজ্ঞেস করো, জিজ্ঞেস করো এটাকে!' জরুরী কণ্ঠে তাগাদা দিল দ্বিতীয়জন। 'বাকি ছেলেমেয়েগুলো কোথায় আছে নিশ্চয় জানে ও।'

'জিজ্ঞেস করার সময় নেই আর,' প্রথমজনের কণ্ঠে উদ্বেগ। 'এখুনি চলে যেতে হবে আমাদের, নইলে যোগাযোগ মিস করব। ফিরে যেতে পারব না আমাদের জায়গায়। আর যেতে না পারলে...'

'ভয়ানক রেগে যাবে লীডার,' হিসহিস করে উঠল দ্বিতীয়জন। 'বরং যেটাকে হাতে পেয়েছি সেটাকেই নিয়ে যাই। লীডার খুশি হবে।'

'কেন, খুশি হবে কেন?'

'চিনতে পারছ না? চেহারাটা কেমন চেনা চেনা লাগছে না?'

'গ্যারিলির ছেলে না তো!'

খসখসে হাসি হাসল দ্বিতীয়জন, 'সে-রকমই লাগছে।'

'তাহলে তো খুবই ভাল। একে পেলে সত্যি খুশি হবে লীডার। চলো, চলো, নিয়ে চলো। দেখি, মাথার দিকটা ধরো তুমি।'

ছেলেটাকে তুলে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত সিঁড়ির কাছে বয়ে নিয়ে এল দুজনে। ওপরে তুলল। মহাকাশযানের ভেতরে এনে ছাত থেকে মেঝে পর্যন্ত লম্বা একটা মোটা প্ল্যাস্টিকের টিউবের মধ্যে ভরল তাকে। নিথর দেহটা খাড়া হয়ে রইল টিউবের মধ্যে।

মাদার শিপ ছাড়ার জন্যে যখন তৈরি হচ্ছে ভিনগ্রহবাসীরা, তখন চোখ

মেলল রবিনরূপী কিশোর-রোবট।

কোটরে চোখের জায়গায় কালো দুটো ডিস্ক।

শেষবারের মত দেহ-রূপান্তর ঘটিয়েছে সে। ওরা তাকে রবিন ভেবে, গ্যারিলির ছেলে ভেবে, মেডিক্যাল টিউবে ভরে রেখেছে। চালাকি ধরতে পারেনি। বোকা বনেছে।

একটা ইন্টারকমের মত জিনিসে প্রথম ভিনগ্রহবাসী বলল, 'কমান্ড ওয়ান, মাদার শিপ থেকে বলছি। আমাদের কাজ শেষ।'

'এজেন্ট নিমোর খবর কি?' স্পীকারে খড়খড় করে উঠল আরেকটা কণ্ঠ।

'এজেন্ট নিমো...ওকে ফেলে আসতে হয়েছে,' জবাব দিল দ্বিতীয় ভিনগ্রহবাসী। ওর কণ্ঠের শঙ্কা টিউবের ভেতরে থেকেও কান এড়াল না কিশোর-রোবটের। মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে।

এই প্রথম জানতে পারল ও, ওর আসল নামটা কি। এজেন্ট নিমো।

ভাবতে লাগল সে: ওদের নিচে এখন কোথাও রয়েছে সত্যিকারের রবিন, মুসা আর জিনা। হয়তো বনের মধ্যে ঘাপটি মেরে রয়েছে। ইউ এফ ও-টা অদৃশ্য হয়ে গেলে গাড়ির ট্রাংক থেকে পুলিশ অফিসারকে মুক্ত করবে ওরা।

রকি বীচ শহরটার কথা মনে পড়ল কিশোর-রোবট ওরফে এজেন্ট নিমোর কিশোর-মগজের। হাহাকার উঠল মনের মধ্যে। মেরিচাচী আর রাশেদ পাশার কথা ভেবে মোচড় দিয়ে উঠল বুক। চোখের জায়গায় ডিস্ক না থাকলে পানিই চলে আসত চোখে। ইস্, আবার যদি আসতে পারত পৃথিবীতে! এত সুন্দর জায়গা। মানুষগুলো কত ভাল।

কিন্তু ফিরে আসাটা অত সহজ নয়। ডেলটাদের আক্রোশ থেকে বাঁচতে হবে প্রথমে। তারপর খুঁজে বের করতে হবে আসল কিশোর পাশাকে। ওকে না পেলে কোনদিনই তার ইচ্ছে সফল হবে না।

****
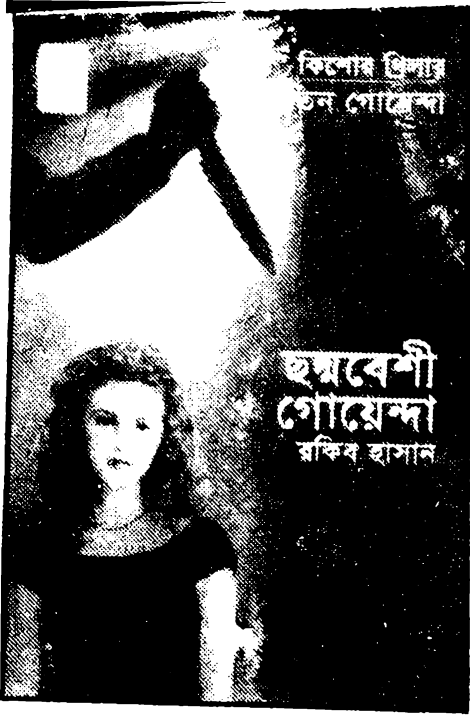
ছদ্মবেশী গোয়েন্দা

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

বিকেল বেলা স্কুল থেকে এসে রবিন বাড়িতে পা দিতেই ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল রাফিয়ান। প্রবল বেগে লেজ নাড়তে নাড়তে টেনে শিকল খোলার চেষ্টা করতে লাগল। হেসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে রবিন বলল, 'আরে বুঝলাম তো, বুঝলাম, বেড়াতে যেতে চাস্।'

ব্যাকপ্যাকটা হলে রেখে রাফির শিকল খুলে দিল সে। বেরিয়ে এল কুকুরটাকে নিয়ে। দরজা লাগিয়ে, গেট পেরিয়ে এসে রাস্তায় নামল। হেঁটে চলল ফুটপাথ ধরে।

জিনা গেছে তার ফুফুর বাড়ি বেড়াতে। রাফিয়ানকে রেখে গেছে রবিনের কাছে, রবিনের অনুরোধে। বাবা-মা বাইরে চলে গেছেন বিশেষ কাজে। ফিরতে ক'দিন সময় লাগবে। ব্ল্যাক ফরেস্টে গোস্ট লেনের বাড়িতে রবিন একা। শরীর বিশেষ ভাল না। বিশেষ করে মগজের অবস্থা। হঠাৎ করে কি যেন কি হয়, উল্টোপাল্টা দেখা শুরু করে। ডাক্তার বলেছেন, মাথায় আঘাত পাওয়ায় এমন হয়েছে। 'রূপালী মাকড়সা' অভিযানে প্রিন্স দিমিত্রিকে সাহায্য করতে ভ্যারানিয়ায় গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছিল রবিন, তারই খেসারত দিতে হচ্ছে এখন।

মুসা বলে, আঘাত-টাঘাত কিছু না, আসলে ব্ল্যাক ফরেস্টে থাকাতে জিনে আসর করছে রবিনের ওপর। শহরটার নাম যেমন-তেমন, গলিটার নাম রীতিমত গা শিউরানো—মুসার মতে, কারণ ব্ল্যাক ফরেস্টের যে গলিতে রবিনদের বাড়ি, সেটার নাম গোস্ট লেন। পেছনে ঘন বন। বনের নামেই নামকরণ হয়েছে ছোট্ট শহরটার। গোস্ট লেন এবং তার পেছনের এলাকার খুব বদনাম। লোকে বলে, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব অনেক কিছুই আছে ওই বনে। আশ্চর্য, ভুতুড়ে সব ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ হয়ে যায় মানুষ। রাতের বেলা বন থেকে ভেসে আসে নেকড়ের ডাকের মত ডাক—লোকে বলে মায়ানেকড়ে। রোম খাড়া করে দেয় সেই চিৎকার।

রবিনের উল্টোপাল্টা দেখাটা বড় বিচিত্র। এমন সব জিনিস আগাম দেখে ফেলে সে কল্পনায়, যেটা পরে সত্যি সত্যি ঘটে যায়। কিংবা এমন কিছু দেখে, যেটা বাস্তবেও আছে, খোঁজ করলে গিয়ে জায়গামত পাওয়া যায় সেই জিনিসটা।

রাফির সঙ্গে তাল রেখে প্রায় দৌড়ে হাঁটতে হচ্ছে ওকে। আগে আগে যাচ্ছে রাফি। বহুক্ষণ পর ছাড়া পেয়ে আনন্দে-উত্তেজনায় অস্থির। মাঝে মাঝে

গাছের দিকে নাক তুলে কাঠবিড়ালীর গন্ধ শুঁকছে।

ঝোপের মধ্যে নড়তে দেখা গেল একটা কাঠবিড়ালীকে। ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে গেল রাফি। পড়ন্ত সূর্যের সোনালি আলোয় চকচক করে উঠল ওর গা।

'এই রাফি, আয় আয়!' ডাক দিল রবিন।

কিন্তু শুনল না রাফি। কাঠবিড়ালীর পিছু নিয়ে দৌড়ে বনে ঢুকে পড়ল।

'রাফি! রাফি! এলি না! জলদি আয়!'

শেষ পর্যন্ত কাঠবিড়ালীর আশা ছেড়ে দিয়ে রবিনের ডাক যখন কানে তুলল রাফি, ততক্ষণে খুদে নালাটার কাছে চলে এসেছে ওরা। পানিতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাফি। শুরু করল দাপাদাপি। কাদা উঠে বাদামী হয়ে যেতে লাগল টলটলে পানি।

রাফির আনন্দে বাধা দিতে মন চাইল না রবিনের। বড় একটা পাথরের গোড়ায় বসে পড়ে হেলান দিল ওটার শ্যাওলা-ছাওয়া দেয়ালে। সারাদিন স্কুলে কাটিয়েছে। বাড়ি এসে বিশ্রাম না নিয়েই বেরিয়ে পড়েছে। রাফির পেছনে ছুটাছুটি করে ক্লান্ত। আপনাআপনি বুজে এল চোখ। একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করল। একটা কবর। তার মধ্যে একটা লাশ। শুধুই কঙ্কাল। হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকছে কঙ্কালটা...

ঘাউ! ঘাউ!

কল্পনা কিংবা তন্দ্রা, যা-ই হোক, টুটে গেল। চোখ মেলে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাফি। মুখে একটা হাড়।

'ইস্, কোত্থেকে কি নিয়ে এসেছিস!' নাক কুঁচকে বলল রবিন। 'ফেল! ফেল!'

হাড়টা মাটিতে ফেলে দিল রাফি। কুঁই-কুঁই শব্দ করতে লাগল।

উঠে দাঁড়াল রবিন। প্যান্টের পেছনে লেগে থাকা মাটি মুছল। 'এতবড় হাড় কোত্থেকে আনলি?'

সামনে ঝুঁকে হাড়টা দেখল সে। সরু, লম্বা। বনের মধ্যে হরিণ আছে। কিন্তু হরিণের পায়ের বলে মনে হলো না।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রবিন। অন্ধকার হয়ে আসা বনের দিকে তাকাল। গা ছমছম করে উঠল। 'চল, রাফি! বাড়ি যাই!'

হাঁটতে শুরু করল সে। শুকনো পাতায় পা পড়ে মড়মড় শব্দ হচ্ছে। কয়েক পা গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখে, হাড়টা মুখে নিয়ে নালার দিকে সরে গেছে আরও রাফি। রবিন তাকাতেই খেক্-খেক্ করে উঠল।

'গাধা কোথাকার! ওদিকে যাচ্ছিস কোথায়?' ধমকে উঠল রবিন।

কিন্তু শুনল না রাফি। আরও জোরে ঘেউ ঘেউ করতে করতে নালা পেরিয়ে চলে গেল উল্টোদিকের বনে।

'রাফি! রাফি!' করে ডাকতে থাকল রবিন। অধৈর্য হয়ে পড়েছে। রাফির অদ্ভুত চিৎকার অবাক করল ওকে। নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে। নইলে এ ভাবে অবাধ্যতা করার কথা নয়।

'রাফি!' বলে আবার ডাক দিয়ে একলাফে নালা পেরিয়ে এল রবিন। ঢুকে

পড়ল ঘন কাঁটাঝোপে ভরা বনের মধ্যে। হউউউ করে আরেকটা লম্বিত চিৎকার শোনা গেল রাফির।

চামড়ায় কাঁটার খোঁচা লাগছে রবিনের। ঝোপঝাড় ঠেলে বেরিয়ে এল একটা পাইনগুচ্ছর কাছে। পাতায় ঢাকা একটা ঢিবির ওপর বসে থাকতে দেখল রাফিকে। লম্বা ঢিবির একমাথা খুঁড়ে ফেলেছে সে। মুখ ফিরিয়ে রবিনকে দেখে আবার হাঁক ছাড়ল তার দিকে তাকিয়ে।

মাথা নামিয়ে আবার পুরোদমে খুঁড়ে চলল রাফি। থাবার ঘায়ে মাটি ছিটাচ্ছে চতুর্দিকে।

'হলো কি তোর!' ফির আচরণ অবাক করল রবিনকে। 'থাম! থাম! শেয়াল নাকি তুই যে গর্ত করে মাটিতে সেঁধোবি?'

ওর কলার ধরে টান দিল রবিন।

আসতে চাইল না কুকুরটা। মাটি খুঁড়েই চলেছে।

'আরে থামলি না! বড় বেয়াড়া হয়ে গেছিস...'

হঠাৎ থমকে গেল রাফি। বন্ধ হয়ে গেল মাটি খোঁড়া। কুঁই-কুঁই করে উঠল আরেকবার। মুখ ফিরিয়ে কালো চোখ মেলে তাকাল রবিনের দিকে।

নতুন খোঁড়া অগভীর গর্তটার দিকে তাকাল রবিন। কুঁচকে গেল ভুরু। রাফির কলারে শক্ত হয়ে গেল আঙুলগুলো।

কিছু একটা বেরিয়ে আছে মাটি থেকে।

ঢোক গিলল রবিন।

ঝুঁকে বসে হাত দিয়ে সরিয়ে ফেলল আলগা মাটি।

রাফি কি আবিষ্কার করেছে, বুঝতে পেরে দম আটকে এল তার।

দুই

একটা মানুষের হাত।

হাতের খণ্ডাংশ।

চাপা চিৎকার বেরিয়ে এল রবিনের মুখ থেকে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

হাত নয়, নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল সে। রাফি যেটা তুলে এনেছে, ওটাও মানুষের পায়ের হাড় নয়। এগুলো তার চোখের ভুল। উল্টোপাল্টা দেখা।

অন্ধকার হয়ে গেছে। গোরস্থানটা বেশি দূরে না।

থেমে থেমে কুঁই-কুঁই করতে থাকল রাফি। ওর দিক থেকে আবার গর্তের দিকে নজর গেল রবিনের। আবার ফিরে এল।

না, ভুল দেখছে না সে।

বড় করে দম নিল। বসে পড়ে ভালমত তাকাল গর্তের দিকে। হাতের হাড়টা দেখল। সত্যি সত্যি মানুষের হাত।

তারমানে কারও কবরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। কাউকে মাটি চাপা দিয়ে রেখে যাওয়া হয়েছে এই বনের মধ্যে।

উঠে পিছিয়ে গেল রবিন। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে তার। ঘুরে ছুটতে শুরু করল পাইন আর ওকের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

বন থেকে বেরিয়ে যেতে চায়।

মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা মানুষটার কাছ থেকে, ওর লাশের কাছ থেকে দূরে।

ছুটছে রবিন। ডাল বাড়ি খাচ্ছে গায়ে। লাফ দিয়ে পেরিয়ে এল নালাটা।

এখন আর অবাধ্য হচ্ছে না রাফি। তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে।

শর্টকাট পথ আছে ব্ল্যাক ফরেস্ট গোরস্থানের ভেতর দিয়ে। সেদিক দিয়েই ছুটল সে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। কপালে দপদপ করছে শিরা। উত্তেজিত হয়ে ডাক ছাড়ছে রাফি। জোরে জোরে লেজ নাড়ছে।

গাধা নাকি তুই! খেলার জিনিস মনে করেছিস? রাফির দিকে তাকিয়ে ভাবল রবিন। বুঝতে পারছিস না কি আবিষ্কার করেছিস? ওটা মানুষের হাত, বুঝলি!

রাস্তায় উঠে এল ওরা। একটা গাড়ি আসতে দেখা গেল। নীল রঙের হোন্ডা সিভিক। চেনা গাড়ি। ওদের স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রী লীলা ডাউসনের। পাশে বসা ওর বন্ধু জিম ক্যামেরন।

'আই, থামো, থামো...' রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই হাত মাথার ওপর তুলে নাড়তে লাগল রবিন।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল লীলা। কাঁচ নামিয়ে মুখ বের করে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, রবিন?'

পেছনের সীট থেকে উঁকি দিল আরও দুটো মুখ। জন আর ডরোথি।

'আমাকে থানায় নিয়ে যেতে পারবে?' উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'থানায়?' জন জিজ্ঞেস করল, 'কেন, চুরি করেছ নাকি?'

ওর রসিকতায় কান দিল না রবিন। 'একটা লাশ দেখে এলাম!'

দরজা খুলে দিল জন। উঠে বসল রবিন। ঠাসাঠাসি করে পায়ের কাছে জায়গা হয়ে গেল রাফিরও।

'কোথায় দেখলে?' সামনের সীট থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জিম। খাটো খাটো সোনালি চুল ওর, নীল চোখ। 'গোরস্থানে?'

'তা ছাড়া লাশ আর থাকে কোনখানে?' রসিকতা করল ডরোথি। জনের দিকে আরেকটু সরে গিয়ে জায়গা বাড়িয়ে দিল রবিনকে।

'না না, গোরস্থানে না!' রবিন বলল। 'গোরস্থানের কাছে বনের মধ্যে। খুঁড়ে খুঁড়ে একটা হাত আর একটা পা বের করে ফেলেছে রাফি।'

লীলা আর ডরোথি দুজনেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রবিনের দিকে। সত্যি বলছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। অবশেষে ঝাঁকি দিয়ে মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে লীলা বলল, 'তার মানে!'

'হবে হয়তো কোন পুরানো কবর-টবর,' জন এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারছে না।

রাফির কলার চেপে ধরল রবিন। নাহ্, এগুলোকে বলাটাই অন্যায় হয়েছে। নিশ্চয় পাগল ভাবছে ওকে। মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল যে সে, জেনে গেছে কোন ভাবে।

'কবর হোক আর যা-ই হোক,' মরিয়া হয়ে বলল রবিন, 'আমি পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে চাই। থানায় পৌঁছে দিতে পারবে কিনা বলো।'

'বেশ। চলো।' গীয়ার দিয়ে গাড়ি টান দিল লীলা। রীয়ারভিউ মিররে রবিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি সত্যি মানুষ তো? জন্তু-জানোয়ারের হাড় নয়? নাকি কিছুই দেখোনি!'

'মানুষ!' লীলার চোখে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারল না রবিন। আপনাআপনি বুজে এল। 'কিছুই দেখোনি' শব্দ দুটো বার বার বেজে চলল মগজে। সন্দেহটা মাথাচাড়া দিতে লাগল মনের মধ্যে। সত্যি দেখেছে তো? নাকি তার সেই 'কল্পিত দৃশ্য' দেখা! মগজের গোলমালের কারণে যেটা হচ্ছে!

'একটা হাত পেয়েছ বলছ?' জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট পল্‌বি।

'হ্যাঁ। আর একটা পা। মানুষের হাড়ের মতই লাগল,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিল রবিন।

'মানুষের হাড় চিনলে কি করে?'

'বায়োলজি ক্লাসে কঙ্কাল তো হরদম দেখি।'

রাফির কলার চেপে ধরা নিজের আঙুলগুলোর দিকে তাকাল রবিন। জোরে জোরে দম নিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা চালাল। পুলিশও তাকে পাগল ভেবে বসলে মুশকিল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সার্জেন্ট পল্‌বি। ঘন কালো চুলে চিরুনির মত করে আঙুল চালাল। 'হাড়গুলো কি দেহের সঙ্গে যুক্ত ছিল?'

'অত কিছু খেয়াল করিনি,' রাফির গায়ে চাপড় দিল রবিন। 'পায়ের হাড়টা তুলে নিয়ে এল প্রথমে। তারপর মাটি খুঁড়ে বের করল হাতেরটা…'

ওর দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কেন সার্জেন্ট পল্‌বি? কথা কি বিশ্বাস করছে না?

'দেখা দরকার।' টান দিয়ে একটা ড্রয়ার খুলল অফিসার। 'তোমার নাম-ঠিকানা বলো।'

'রবিন মিলফোর্ড…'

'হুঁ।' কলমটা পিস্তলের মত করে রবিনের দিকে তাক করল অফিসার। 'দেখো, রসিকতা যাতে না হয় এটা। তোমাদের বয়েসী ছেলেমেয়েদের চেনা আছে আমার।'

মাথা নাড়ল রবিন, 'রসিকতা করছি না।'

নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল অফিসার। 'ঠিক আছে। লেফটেন্যান্ট জেনসেনকে জানাচ্ছি। সত্যি না হলে এখনও বলো

আমাকে। কড়া লোক জেনসেন। ও গেলে কিন্তু বিপদে পড়বে। রসিকতা একদম বোঝে না।'

ঢোক গিলল রবিন। 'রসিকতা নয়। হলেই বরং খুশি হতাম।'

ছোট একটা অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো রবিনকে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে লেফটেন্যান্ট জেনসেনকে চিনতে পারল সে। সোফির বাবা। ক্ষণিকের জন্যে ভুলেই গেল রবিন, তিনি পুলিশ। হুবহু এক রকম কালচে বাদামী চোখ বাবা আর মেয়ের। তবে চুল এক নয়, জেনসেনের চুল প্রায় সবই ধূসর। মুখের ভাঁজের রেখাগুলো অতিরিক্ত গভীর।

'তুমি রবিন না?' বললেন তিনি। 'সোফির বন্ধু।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। সোফি আর ও একই ক্লাসে পড়ে। চেয়ারে বসল সে। তার পায়ের কাছে বসে দুই থাবার মাঝখানে থুঁতনি রেখে চোখ মুদল রাফি।

সার্জেন্ট পলবির রেখে যাওয়া ফর্মটায় চোখ বোলালেন জেনসেন। 'মানুষের হাড়?' রবিনের দিকে মুখ তুলে তাকালেন তিনি।

'সে-রকমই মনে হলো,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'প্রথমে একটা লম্বা হাড় নিয়ে এল রাফি। আমাকে যাওয়ার জন্যে উৎসাহিত করতে করতে দৌড়ে চলে গেল গভীর বনে। পেছন পেছন গিয়ে দেখি, একটা উঁচু ঢিবি খুঁড়ছে।' কণ্ঠস্বর খাদে নেমে গেল রবিনের। 'কবরের মত উঁচু ঢিবি।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন জেনসেন।

তিনি বিশ্বাস করেছেন বুঝে ঢিল হয়ে আসতে লাগল রবিনের স্নায়ু।

উঠে দাঁড়ালেন জেনসেন। ছয় ফুটের ওপর লম্বা। 'চলো, দেখে আসি। অন্ধকারে চিনতে পারবে তো?'

'পারব।'

সঙ্গে দুজন অফিসারকে নিলেন জেনসেন।

দ্বিধায় পড়ে গেছে এখন রবিন। সত্যি কি কিছু আছে ওখানে? নাকি ভুল দেখেছে! পুলিশের সঙ্গে রসিকতা করার অপরাধে বিপদে পড়তে হবে তাহলে।

গোরস্থানের কাছে এসে রাফিকে ছেড়ে দিল রবিন। একছুটে বনে ঢুকে পড়ল রাফি। পেছনে ছুটল রবিন। তার পেছনে লেগে রইল তিন অফিসার।

ফ্যাকাসে চাঁদ উঠেছে গাছের মাথায়। মৃদু, মোলায়েম বাতাসে শরতের ভারী সুবাস। পাতা কাঁপছে থিরথির করে।

সহজেই পাথরটা খুঁজে বের করল রবিন। 'প্রথম হাড়টা এখানেই নিয়ে এসেছিল রাফি,' টর্চের আলো ফেলে হাড়টা দেখার চেষ্টা করতে লাগল সে। 'ওই যে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। না, ভুল দেখেনি।

ঝুঁকে দাঁড়িয়ে হাড়টা দেখলেন জেনসেন। 'না, হরিণের না।' কাঁধের ওপর দিয়ে দুই সহকারীর দিকে ফিরে বললেন, 'তুলে রাখো। পরে দরকার হবে।'

সোজা হয়ে রবিনের দিকে তাকালেন তিনি। 'এবার কোনদিকে?' গম্ভীর

হয়ে গেছেন।

'উঁম!' নালাটার দিকে তাকিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল রবিন। 'ঠিক কোনখান দিয়ে পার হয়েছিলাম, মনে করতে পারছি না। রাস্তা-টাস্তা ছিল না।'

'খুঁজলেই পেয়ে যাব,' ভরসা দিলেন জেনসেন। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে তাঁর।

নালা পেরিয়ে এল সবাই। টর্চের আলোয় গাছগুলো সব এক রকম লাগছে দেখতে।

নাহ্, পারব না! হতাশ হয়ে পড়ল রবিন। খুঁজে বের করা সম্ভব না!

'এদিক দিয়ে যাব?' জিজ্ঞেস করল একজন অফিসার। এক জায়গায় কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

হাত তুললেন জেনসেন, 'দাঁড়াও না, এত অস্থির হচ্ছ কেন?'

'দেখি তো, টর্চটা নিভিয়ে দিলে বোঝা যায় কিনা,' রবিন বলল। অন্ধকার চোখে সইয়ে নেয়ার পর তাকাতে লাগল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। বনতলে ছায়া ছায়া অন্ধকার। নাহ্, অন্ধকারে আরও বোঝা যায় না। আবার টর্চ জ্বালতেই চোখে পড়ল কয়েকটা ভাঙা ডাল।

'ওই যে, ওই যে!' চিৎকার করে উঠল সে। বুনো কালোজামের একটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় কাঁটায় লেগে ছিঁড়ে রয়ে গেছে কাপড়ের একটা টুকরো।

পাইনগুচ্ছ! ভাবতেই বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল তার।

মাটির দিকে চোখ রেখে খুব ধীরে এগোতে শুরু করল সে। কোথায় ঢিবিটা?

পাইনগুচ্ছ পেলেও ঢিবিটা দেখতে পেল না। মাটিতে বিছিয়ে আছে পাতা। কোন ঢিবি নেই। খোঁড়ার চিহ্ন নেই। হাড় নেই।

শক্ত মোচড় দিল পেটের মধ্যে। তবে কি ভুলই দেখেছিল! তা কি করে হয়? পায়ের হাড়টা তো সত্যি পাওয়া গেছে। এমনও হতে পারে, পায়ের হাড়টা কল্পনাশক্তিকে উস্কে দিয়েছিল তার। কল্পিত দৃশ্য দেখিয়ে ছেড়েছে।

মাটির দিক থেকে নজর সরাল না সে। মুখ তুলে তাকাতে পারল না সোফির বাবা কিংবা অন্য দুজন পুলিশ অফিসারের দিকে।

ঢিবিটা না পেলে কি বলবে ওদেরকে? বলবে, সরি, আমি ভুল দেখেছি? মানবে ওরা...!

রাফির তীক্ষ্ণ চিৎকারে চমকে গেল সে। ঘুরে দাঁড়াল। চিৎকার করে উঠল। 'ওই যে! নিশ্চয় দেখতে পেয়েছে রাফি!'

তিন

ডাক লক্ষ্য করে দৌড় দিল রবিন। কিছুদূর এসে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে

হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠে কোনমতে সোজা হতেই চোখে পড়ল আরেকটা পাইনগুচ্ছ। তার মধ্যে ঢিবিটা। চিৎকার করে উঠল, 'ওই যে! ওই যে! ওটা!'

একসঙ্গে গিয়ে তিন অফিসারের হাতের তিনটে টর্চের আলো পড়ল ঢিবিটার ওপর। নীরবে তাকিয়ে রইল হাতটার দিকে। হাতের কঙ্কাল। আঙুলগুলো সামান্য বাঁকা হয়ে আছে।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন জেনসেন। ভাল করে দেখতে শুরু করলেন।

'হাতই তো,' বলল একজন অফিসার।

উঠে দাঁড়ালেন জেনসেন। 'কার্টার, জলদি যাও, তাড়াতাড়ি ক্রাইম টেকনিশিয়ানদের পাঠাতে বলোগে। এখুনি।'

'ইয়েস, স্যার,' বলে গাড়ির দিকে ছুটল কার্টার। রেডিওটা রয়েছে গাড়িতে।

নড়ল না রবিন। তাকিয়ে আছে হাতটার দিকে।

'গ্রেনার,' সঙ্গের আরেক অফিসারকে বললেন জেনসেন, 'জায়গাটার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করো।'

'করছি, লেফটেন্যান্ট।'

'রবিন,' ওর চোখের দিকে তাকালেন জেনসেন।

কিন্তু গর্ত থেকে বেরিয়ে থাকা কঙ্কালের হাতটা ছাড়া আর কোনদিকেই নজর নেই রবিনের। ডাকটা শুনতে পেল না।

'রবিন!'

চমকে গেল রবিন। মুখ তুলল। 'অ্যাঁ!'

'চলো, তোমাকে বাড়িতে দিয়ে আসি,' নরম স্বরে বললেন জেনসেন। 'এখানে আর কোন কাজ নেই তোমার। যা করার আমরাই করব।'

'না!' মাথা নাড়ল রবিন। 'আমি থাকব! আমার দেখা দরকার...'

কি দেখবে নিজেই জানে না সে। 'দরকারটা কেন, তা-ও বুঝতে পারছে না। মগজের মধ্যে কোথায় যেন একটা অ্যালার্ম বেল বাজতে আরম্ভ করেছে।

'তুমি থেকে আর কি করবে?' জেনসেন বললেন। 'পুরো কঙ্কালটা খুঁড়ে বের করতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে। অনেক রাত হবে। তোমার বাবা-মাকে কি বলবে? ওঁরা ভাববেন না?'

'না, বাড়ি নেই। বাইরে গেছে। আগামী হপ্তার আগে আসবে না।'

শ্রাগ করলেন জেনসেন। 'ঠিক আছে, থাকো তাহলে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখো। সামনে থাকলে কাজের অসুবিধে হবে আমাদের।'

পিছিয়ে যাবার আগে আরেকবার হাতটার দিকে তাকাল রবিন। নিথর হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, কবরের মধ্যে। কেমন যে লাগে দেখতে! মৃত্যু জিনিসটা বড় ভয়ঙ্কর।

'রবিন!'

সোফির কণ্ঠ রবিনের ভাবনার জগতে যেন কেটে ঢুকে গেল।
মুখ তুলে তাকাল সে। ঝোপঝাড় ঠেলে এগিয়ে আসছে সোফি। ওয়েইট্রেসের পোশাকের ওপর একটা সোয়েটার পরেছে। বেকির কফি শপে পার্টটাইম ওয়েইট্রেসের কাজ করে সে। পেছনে এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে, প্রায় সবাইকেই চেনে রবিন, ব্ল্যাক ফরেস্টে ওদের স্কুলে পড়ে।
'কি হয়েছে?' জানতে চাইল সোফি। কৌতূহলে জ্বলজ্বল করছে চোখ।
তাকে ঘিরে জড় হলো বাকি ছেলেমেয়েগুলো। ঢিবিটার চারপাশে হলুদ ফিতের বেড়া দিয়ে দিল অফিসার গ্রেনার। লেফটেন্যান্ট জেনসেন, অফিসার কার্টার আর দুজন টেকনিশিয়ান প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে হলুদ বৃত্তের ভেতরে।
আরও ডজনখানেক গম্ভীর চেহারার মানুষ বেড়ার বাইরে তদন্তে ব্যস্ত। কারও কারও হাতে টর্চ। সাদা পোশাকের দুজন অফিসার উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে রেডিওতে।
'সোফি,' জিজ্ঞেস করল রবিন, 'তুমি খবর পেলে কার কাছে?'
'বেকি'জ কফি শপে গিয়ে ঢোল পিটিয়ে দিয়েছে জন আর ডরোথি,' সোফি জানাল, 'ব্ল্যাক ফরেস্টের বনে তুমি নাকি একটা লাশ খুঁজে পেয়েছ। তারপর শুনলাম পুলিশের সাইরেন। আমার ডিউটির পর কফি শপ থেকে বেরোনোর আগে থানায় ফোন করে বাবাকে চাইলাম। ডেস্ক সার্জেন্ট জানাল, বাবা এখানে। ভাবলাম, তোমাকেও পাওয়া যেতে পারে।'
সোফির বাবার দিকে তাকাল রবিন। দুজন অফিসারের কাজ দেখছেন তিনি। কবর খুঁড়ছে ওরা দুজনে।
'তুমি ভাল আছ তো?' রবিনকে জিজ্ঞেস করল সোফি।
মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'তা আছি। তবে খুব ঠাণ্ডা লাগছে।'
'আমার সোয়েটারটা নেবে?'
'না না, লাগবে না।'
'লাশটা কার, বোঝা গেছে?'
'না,' রবিন বলল। 'তোলাই হয়নি এখনও। হাতটা শুধু দেখেছি আমি। তোমার বাবা বললেন, পুরো শরীরটা তুলতে সারারাতও লেগে যেতে পারে। কার লাশ শনাক্ত করতে কতদিন লাগবে, সেটা বলা কঠিন।'
'হরিণ-টরিণ না তো?'
'হরিণকে কবর দিতে আসবে কে?'
'তা-ও তো বটে।'
আলোকিত কবরটার দিকে তাকিয়ে রইল দুজনে। লেফটেন্যান্ট জেনসেন আর একজন ক্রাইম টেকনিশিয়ান এখনও ঝুঁকে রয়েছে ওটার ওপর। ইতিমধ্যেই ফুটখানেক উঁচু মাটির স্তূপ জমে গেছে ঢিবিটার পাশে।
ক্যামেরা উঁচু করে দ্রুত কবরটার কয়েকটা ছবি তুললেন মিস্টার জেনসেন।
ভিড়ের দিকে তাকাল রবিন। ফিসফিস, কানাকানি চলছে। বহু ছেলেমেয়ে

চলে এসেছে দেখতে। লীলা, জন, জিম, ডরোথি, সবাইকে দেখা গেল।

রবিনের পা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে রাফি। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রবিন।

বেড়ার ভেতরে উত্তেজিত গুঞ্জন শুনে আবার ফিরে তাকাল সে। কার্টার আর একজন টেকনিশিয়ান দাঁড়িয়ে আছে ওদের খোঁড়া চওড়া গর্তটার দিকে। দুজনেই রবারের দস্তানা পরেছে।

'দেখে যান, লেফটেন্যান্ট,' ডাক দিল কার্টার।

কি দেখেছে? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রবিন। ভাল করে দেখার জন্যে সামনে ঝুঁকল সোফি। স্তব্ধ হয়ে গেল জনতার গুঞ্জন।

একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করল ক্রাইম টেকনিশিয়ান। ধাতুর চিমটা দিয়ে গর্তের ভেতর থেকে কি যেন বের করল কার্টার।

জিনিসটা ব্যাগে রাখার আগে এক ঝলক দেখতে পেল রবিন। লাল কাপড়। পোশাকের বড় একটা টুকরো। মৃত্যুর সময় পরনে ছিল লাশটার।

অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল সোফি। হাত আঁকড়ে ধরল রবিনের।

'সোফি? কি হলো?' ফিরে তাকাল রবিন।

জবাব দিল না সোফি। চোখ বড় বড় করে, নীরবে তাকিয়ে আছে বাবার দিকে।

রবিনের হাতটা ছেড়ে দিল সে। আচমকা দুই হাতে মুখ ঢেকে শব্দ করে কেঁদে উঠে বসে পড়ল মাটিতে।

চার

'সোফি!' চিৎকার করে উঠল রবিন। বসে পড়ল সোফির পাশে। চোখ উল্টে দিয়েছে সোফি।

'সোফি! সোফি!' চিৎকার করে ডাকতে লাগল রবিন।

সাড়া নেই।

বেড়া ডিঙিয়ে দুই লাফে কাছে চলে এলেন লেফটেন্যান্ট জেনসেন। 'কি হয়েছে? দেখি, সরো তো।' হাঁটু গেড়ে মেয়ের পাশে বসে পড়লেন তিনি।

'মাথা ঘুরে পড়ে গেছে মনে হয়,' রবিন বলল।

হাত নেড়ে ডাকলেন জেনসেন, 'কার্টার, দেখে যাও তো।'

কার্টারও এসে বসল সোফির পাশে।

উঠে দাঁড়াল রবিন। তার হাতে নাক ঘষল রাফি।

সোফির নিথর দেহের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। হঠাৎ কি হলো ওর? এমন করে পড়ে গেল কেন?

'না, কিছু হয়নি,' কার্টার জানাল। 'পাল্‌স্‌ নরম্যাল। কোন কারণে বেহুঁশ হয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকালেন জেনসেন।

গুঙিয়ে উঠল সোফি। চোখ মিটমিট করে উঠে বসল। ঘোর লাগা চোখে তাকাল রবিনের দিকে।

'ভয় নেই, ঠিক হয়ে যাবে,' মৃদুকণ্ঠে বললেন মেয়েকে জেনসেন।

রবিনের দিকে তাকালেন তিনি। 'বাড়ি যাও, রবিন। সোফির জন্যে ভেবো না। ও ঠিক হয়ে যাবে।'

'না। আমি থাকি।'

'উঁহু! বাড়ি!' রবিনের কাঁধ চেপে ধরে ঘুরিয়ে দিলেন তাকে জেনসেন। 'অনেক রাত হয়ে গেছে।' ফিরে তাকিয়ে ডাকলেন, 'গ্রেনার, সবাইকে সরাও এখান থেকে। তারপর রবিনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো।'

'এক মিনিট!' জেনসেনের হাত চেপে ধরল রবিন। 'কি হয়েছে সোফির? ও ওরকম করল কেন?'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন জেনসেন। 'ঠিক হয়ে যাবে···বেহুঁশ হয়ে গেছিল···।'

হ্যাঁ। কিন্তু কেন? জানার খুব ইচ্ছে রবিনের। কিন্তু জেনসেন সেটা বলতে চাইছেন না।

'রবিন, চলো,' গ্রেনার বলল। 'তোমাকে দিয়ে আসি।'

যেখানে রয়েছে ওরা, জায়গাটা ঢালু। যাওয়ার সময় উঁচুতে উঠতে হয়। সেটা বেয়ে উঠতে উঠতে ফিরে তাকাল রবিন। ভিড় সরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ।

পাড়ের মাথায় উঠে শেষবারের মত ফিরে তাকাল রবিন। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখল, উঠে দাঁড়িয়েছে সোফি। তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুজন পুলিশ অফিসার। জেনসেনকে দেখা যাচ্ছে না। আবার বোধহয় ফিতেয় ঘেরা জায়গাটাতে গিয়ে ঢুকেছেন। কাপড়ের টুকরোটা পরীক্ষা করছেন।

লাল কাপড়ের টুকরো।

ওটা দেখেই চিৎকার করে উঠেছিল সোফি।

কেন?

এক টুকরো কাপড় কেন সোফিকে বেহুঁশ করে দিল?

গ্রেনারের পেছন পেছন রাস্তার দিকে এগিয়ে চলল রবিন।

'রবিন! আই, রবিন!'

খোলা লকারের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ফিরে তাকাল রবিন। হল ধরে তার দিকে দৌড়ে আসছে জিম ক্যামেরন। দুই হাতে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে ভিড় করে থাকা ছেলেমেয়েদের।

অবাক হলো রবিন। এমন করে দৌড়ে আসছে কেন জিম?

'কাল রাতে ঘটনাই ঘটালে একটা, তাই না?' কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জিম। ওর ফ্যাকাসে নীল চোখে হাসির ঝিলিক। ঢোলা শার্ট আর ফেড জিনস পরেছে। দুই হাঁটুর কাছে ইচ্ছে করে ছিঁড়ে রাখা। 'তুমি তো হীরো হয়ে গেছ হে!'

মাথা নাড়ল রবিন। 'হীরো? কই, আমার তো সেটা মনে হচ্ছে না।'
লকারে হেলান দিয়ে দাঁড়াল জিম। দরজাটা লাগিয়ে দিল রবিন।
'বলো কি হে, আমাদের স্কুলের একজন ছাত্রীর লাশ আবিষ্কার করলে, আর বলছ...'
হৃৎপিণ্ডে রক্ত ছলকে উঠল যেন রবিনের। 'আমাদের স্কুলের!'
'কেন, তুমি জানো না?'
বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়ল রবিন।
'জিম!' ভিড়ের ভেতর থেকে ডাক শোনা গেল। দৌড়ে এল লীলা। জিমের পাশে দাঁড়াল। নীল শার্ট গায়ে। তার পরনেও জিনস। রবিনের মুখের দিকে তাকাল একবার। জিমের দিকে ফিরল, 'কি হয়েছে?'
জিম বলল, 'ও জানে না!'
'জানে না মানে?'
'শেলি যে আমাদের স্কুলে পড়ত, জানে না ও।'
জিমের মত অবাক হলো না লীলা। 'জানবে কি করে? ও তো তখনও ব্ল্যাক ফরেস্টে আসেইনি। এ স্কুলে ভর্তি হয়নি। জিম, সোফি যে আজ স্কুলে আসেনি, লক্ষ করেছ?'
মাথা ঝাঁকাল জিম। 'হ্যাঁ। ইতিহাসের ক্লাসে আমার সামনেই তো বসে রোজ। না আসাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি হলেও আসতাম না।'
'শেলি কে?' জানতে চাইল রবিন।
'সোফির বোন। কেন, সোফি তো তোমার বন্ধু। বেশ খাতির-টাতিরও দেখি। ওর বোন যে দু'বছর আগে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল, বলেনি কখনও তোমাকে?'
ধীরে ধীরে আবার মাথা নাড়ল রবিন। 'নাহ্!'
মাথা ঝাঁকাল লীলা। 'হুঁ!...বছর দুই আগে একরাতে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল শেলি। সে-রাতে নাকি লাল শার্ট গায়ে ছিল তার।'
'তাই!' ভুরু কুঁচকে ফেলল রবিন।
লাল কাপড়!
এ জন্যেই বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল সোফি, বোঝা গেল এতক্ষণে। তার বাবার চোখে দেখা গিয়েছিল বেদনা।
রবিনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল লীলা। 'দিলাম তো চমকে!'
'তা দিয়েছ,' অস্বীকার করল না রবিন। 'কিন্তু লাশটা যে শেলির, তোমরা জানলে কি করে?'
এবার লীলার অবাক হওয়ার পালা। 'দুনিয়াসুদ্ধ লোক জানে, আর আমরা ব্ল্যাক ফরেস্টে থেকে জানব না! আমি তো ভাবলাম, আমাদের আগেই জেনে বসে আছ তুমি। পুলিশের কাছ থেকে।...খবরের কাগজ পড়োনি সকালে?'
হাবার মত মাথা নাড়ল রবিন। ফোঁস করে বেরিয়ে এল চেপে রাখা দমটা। 'না। রাতে ঘুম হয়নি। সকালে আর পত্রিকায় চোখ বোলানোর মেজাজ

ছিল না…ভুল করেছি…' একটানে ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিল সে।

হল ধরে প্রায় দৌড়ে চলল। স্কুলের অফিসের সামনের পে-ফোনটার সামনে থামল। ফোন করবে সোফিকে।

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বোতাম টিপতে শুরু করল সে। হাত কাঁপছে।

জবাব পেল না।

বিকেলে ছুটির শেষে চাকরিতে চলল রবিন। ব্ল্যাক সিটি পাবলিক লাইব্রেরিতে পার্টটাইম কাজ করে। টাকা তেমন দেয় না। তবে কাজটায় আনন্দ পায় সে। পুরানো বইয়ের গন্ধ যেন নেশা ধরায়। লাইব্রেরির নীরবতাটাও তার পছন্দ।

মেঝে থেকে একটা বই তুলে নিয়ে জুতোর ডগায় ভর দিয়ে উঁচু হলো সে, ওপরের তাকে ঢুকিয়ে রাখার জন্যে। সোয়েটারটা উঠে গিয়ে পেটের কাছে যেখানে ফাঁক হলো, সেখানে ঠাণ্ডা বাতাস লাগল।

'এক্সকিউজ মী,' বলে উঠল একটা শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠ। 'আদিম অস্ত্রশস্ত্রের ওপর লেখা কোন বই আছে তোমাদের কাছে?'

'এক সেকেন্ড,' বইটা ঠেলে ঢোকাতে ঢোকাতে জবাব দিল রবিন। ঢুকিয়ে রেখে ফিরে তাকাল।

মুখে মৃদু হাসি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে এক যুবক। কালো চোখ। লালচে-বাদামী লম্বা লম্বা চুল কাঁধের ওপর নেমে এসেছে।

রবিন তাকাতেই যুবক বলল, 'আমার নাম টম গ্যারিবাল্ডি। আদিম অস্ত্রশস্ত্রের ওপর লেখা একটা বই খুঁজছি আমি।'

'আদিম অস্ত্রশস্ত্র? তলোয়ার-বল্লম, তীর-ধনুক, এ সবের ওপর?' দুই তাকের মাঝখানে গলি। তার শেষ মাথাটা দেখাল সে। 'ছয়শোর সিরিজে আছে।'

'দেখেছি ওখানে।' কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল টম।

'ওখানেই তো থাকার কথা। কম্পিউটারের লিস্ট দেখেছেন?'

'না, তা দেখিনি,' জবাব দিল টম। 'ভাবলাম, ঝামেলায় না গিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো চুকে যায়।'

'সব বইয়ের নাম তো আমার মুখস্থ নেই,' গাল চুলকাল রবিন। 'আমি এখানে পার্ট টাইম কাজ করি। স্কুল ছুটির পর। চলুন, চেষ্টা করে দেখা যাক।'

'চলো। বেকারভিলে—যেখানে আমাদের বাড়ি—ওখানকার কলেজ লাইব্রেরির সমস্ত বইয়ের নাম আমার মুখস্থ ছিল। ওই কলেজেই পড়তাম আমি।'

'বেকারভিলে কলেজ আছে বলে তো জানতাম না,' গলিপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিল রবিন।

'চেনো নাকি?

'সামান্য। অনেক শহরেই গেছি আমি, বহু জায়গায় থেকেছি। বাবা করে পত্রিকায় চাকরি, মা একেক সময় একেক জায়গায়। বাবার পেশার কারণে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয় আমাদের। তবে সবচেয়ে বেশি থেকেছি

রকি বীচে।'

'জানি,' জবাব দিল টম। 'ব্ল্যাক ফরেস্টের বাড়িটা কিনেছিলেন তোমার বাবা তোমাদের রকি বীচের বাড়িটা ভূমিকম্পে ভেঙে গিয়েছিল বলে।'

হাসি মুছে গেল রবিনের। 'আপনি জানেন! কি করে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল মনে হলো টম। একটা তাক দেখাল, 'বইটা এখানেই থাকার কথা।'

'কি করে জানলেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'গ্রুপ দেখে মনে হচ্ছে।'

'আমি বইয়ের কথা বলছি না,' রবিন বলল। 'আমার বাবা কখন কি কারণে ব্ল্যাক ফরেস্টে বাড়ি কিনেছে, সেটা জানলেন কি করে?'

'ও, সেটা...' দ্বিধা করল টম। 'লাইব্রেরিতে আজই তোমাকে প্রথম দেখলাম।'

জবাবটা এবারও এড়িয়ে গেল টম, বুঝতে পারল রবিন। আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। করে লাভ নেই। ঠিক জবাব দেবে না টম।

তাকের দিকে তাকাল সে। ভুলে যেতে চাইল টমের কথা। বইটা খুঁজতে লাগল। 'এই যে একটা, পাওয়া গেছে।'

টান দিয়ে বইটা বের করে আনল সে। বইয়ের কভারে ভয়ঙ্কর চেহারার একটা ছুরি আঁকা।

হঠাৎ কেমন ঘুরে উঠল মাথাটা। চোখের সামনে অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল সব। অস্ফুট একটা শব্দ বেরোতে গিয়েও মাঝপথে আটকে গেল গলার মধ্যে।

রূপালী বাঁটের একটা ছুরি পড়ে আছে বইয়ের পেছনের ফাঁকা জায়গাটুকুতে।

চকচকে ফলাটায় তাজা রক্ত লেগে আছে। তাকে জমে থাকা রক্ত গড়িয়ে এসে ফোঁটা ফোঁটা পড়তে শুরু করল ওর পায়ের কাছে।

ছুরিটাও এগিয়ে আসতে শুরু করল। তীব্র গতিতে। তার বুক লক্ষ্য করে।

পাঁচ

চিৎকার দিয়ে পিছিয়ে এল রবিন। ধাক্কা খেল পেছনের তাকে। হাত থেকে পড়ে গেল বইটা।

'কি হলো?' তার হাত ধরে ফেলল টম।

হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন রবিনের বুকে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তাকের ফোকরটার দিকে।

শূন্য।

রক্ত নেই। চকচকে ছুরিটা নেই।

তারমানে আবার উল্টোপাল্টা দেখেছে।

'সরি!' ঘোরটা কেটে যেতে বলল রবিন। হাতটা ছাড়িয়ে নিল টমের হাত থেকে।

জোরে জোরে দম নিতে লাগল। নিজেকে শান্ত করার জন্যে। চোখ মুদল। কাল্পনিক দৃশ্যটা দূর করে দিতে চাইল মগজ থেকে।

চোখ মেলে টমের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ও কিছু না। বইটা সরাতে বিরাট এক ইঁদুর লাফ দিয়ে পড়ল। চলে গেছে।'

স্থির দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকিয়ে আছে টম। 'ইঁদুর দেখলে অত জোরে চিৎকার দেয় না মানুষ!'

'আমি দিই,' প্রসঙ্গটাকে হালকা করার চেষ্টা করল রবিন। নিচু হয়ে বইটা তুলে নিয়ে টমের হাতে গুঁজে দিল। 'বাই,' বলে ওর চোখের দিকে না তাকিয়ে দ্রুত গলি ধরে হাঁটতে শুরু করল।

আমাকে কি ভাবল ও, কে জানে!—যা ভাবে ভাবুকগে, বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রবিন।

কিন্তু উদ্ভট এই কাণ্ড কেন ঘটছে? এ থেকে কি মুক্তি নেই?

'রবিন, দাঁড়াও!' পেছন থেকে ডাক দিল টম।

কিন্তু দাঁড়াল না রবিন। অস্বস্তি বোধ করছে। লাইব্রেরিয়ানের কাউন্টারের পাশ কাটিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল অফিসে। দরজা লাগিয়ে দিল।

এখানে নিরাপদ। ওর উদ্ভট আচরণ চোখে পড়বে না আর কারও। দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছুরিটার কথা ভাবতে লাগল। ভয় লাগছে রীতিমত। আবার ঘটল এ রকম ঘটনা। কল্পিত দৃশ্য দেখা। কেন?

টমকে দেখে? উঁহু, মনে হয় না। হয়তো ছুরিটা দেখে। আদিম অস্ত্রশস্ত্রের ওপর লেখা বইয়ের কভারে ছাপা ছুরির ফটোটা তার কল্পনাকে উস্কে দিয়েছে। ডাক্তারের মতে, মগজের এ ধরনের ক্ষমতা মোটেও স্বাভাবিকের পর্যায়ে পড়ে না।

ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল পেশী। টম নিশ্চয় চলে গেছে এতক্ষণে।

বেরোতে গিয়ে আরেকটা কথা মনে পড়তেই স্থির হয়ে গেল আবার। ওকে 'রবিন' বলে ডেকেছে টম। কি করে তার নাম জানল? সে তো বলেনি!

ছ'টার সময় লাইব্রেরি থেকে বেরোল রবিন। কয়লা-কালো আকাশের দিকে তাকাল। দমকা বাতাসে বয়ে আনল কনকনে ঠাণ্ডা। রাস্তার ধারের গাছগুলোকে ধরে জোরে জোরে ঝাঁকি দিয়ে ঝরিয়ে দিয়ে গেল শুকনো পাতা। রবিনের পায়ের কাছ দিয়ে নীরবে উড়ে চলে গেল ফেলে দেয়া কয়েকটা বাতিল খবরের কাগজ। কেমন ভুতুড়ে দেখাল সেগুলো।

ব্যাকপ্যাকটা কাঁধে ঝুলিয়ে উইন্ডব্রেকারের জিপার টেনে দিল রবিন। সোফিদের বাড়ি এখান থেকে বেশ দূরে। হাঁটতে শুরু করল। বাতাসে পাক খাচ্ছে শুকনো বাদামী পাতা। সেদিক থেকে নজর সরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল

সে। সময় আছে। বাড়ি যাওয়ার আগে সোফিদের বাড়িতে ঘুরে আসাটা জরুরী মনে হলো তার।

বাতাসের মুখোমুখি ঝুঁকে হাঁটতে হাঁটতে মুখ তুলে দেখছে রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর নম্বর। বিশ মিনিট পর সোফিদের বাড়ির নম্বরটা দেখতে পেল। ব্ল্যাক ফরেস্টে বাস করলেও ওদের বাড়িতে আগে কখনও যায়নি সে।

মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে অন্ধকার বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। একটা আলোও নেই। এমনকি বারান্দারটাও না।

বাড়ি নেই নাকি কেউ? গেল কোথায়?

ব্যাকপ্যাকটা অন্য কাঁধে চালান করে দিয়ে ঢালু লন বেয়ে উঠে চলল কাঠের তৈরি ধূসর বাড়িটার দিকে। কাছে গিয়ে বোঝা গেল, অতিরিক্ত পুরানো বাড়ি। জীর্ণ, মলিন। সামনের সিঁড়ি ভাঙা। সামনের দেয়ালের রঙ চটে গেছে।

বেল বাজিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে। সাড়া এল না। কোন শব্দ নেই ভেতরে।

ঘুমাচ্ছে নাকি সোফি?

বারান্দা থেকে নেমে খানিকটা পিছিয়ে এসে মুখ তুলে তাকাল দোতলার দিকে। একটা জানালায় গোলাপী পর্দা দেখা যাচ্ছে। সোফির বেডরুম হবে হয়তো। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে একটা পাল্লা।

'সোফি!' চিৎকার করে ডাকল সে। 'আছ তুমি? সোফি?'

অন্ধকার জানালার দিকে তাকিয়ে জবাবের অপেক্ষা করল। তারপর আবার ডাকল, 'সোফি? আমি। আমি রবিন।'

নাহ্। কেউ নেই। থাকলে সাড়া দিত।

ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে যাবে, মাথার মধ্যে হঠাৎ বোঁ করে উঠল রবিনের। ঘোলাটে হয়ে এল দৃষ্টি। আবার পরিষ্কার হতেই দোতলার জানালায় একটা ছায়া নড়তে দেখল মনে হলো। সামান্য কেঁপে উঠল পর্দা।

পর্দা সরিয়ে একটা মুখ উঁকি দিল। ফ্যাকাসে, মরা মানুষের মুখের মত।

'সোফি?' চিৎকার করে ডাকল রবিন।

না! সোফি না। আরেকটু বেরিয়ে এল মুখটা। স্পষ্ট হলো। ধূসর, মাংসহীন কপাল। গোল গোল কালো অক্ষিকোটরে চোখ নেই। শূন্য। বিকট ভঙ্গিতে কঙ্কালের হাসি হাসছে দাঁতগুলো।

মরা মানুষের খুলি!

ছয়

চাপা একটা গোঙানি বেরিয়ে এল রবিনের মুখ থেকে। চোখ বুজে ফেলল সে।

আবার যখন খুলল, জানালা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে খুলিটা। বার কয়েক চোখ মিটমিট করে পরিষ্কার করে নিতে চাইল দৃষ্টিশক্তি। কিন্তু আর দেখা গেল

না। অন্ধকার জানালায় পর্দা নড়ছে বাতাসে।

আরেকটা কাল্পনিক দৃশ্য!

তা ছাড়া আর কি?—নিজেকে বোঝাল সে। কিন্তু কেন? কি মানে এ সবের? সোফি কি আছে ওই ঘরটাতে?

আবার সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এল রবিন। জোরে জোরে কিল মারতে শুরু করল দরজায়। বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়েছে। চিৎকার করে ডাকতে লাগল 'সোফি! সোফি!' বলে। বেলের বোতামটা টিপে ধরে রাখল। বাড়ির ভেতরে একটানা বেজে চলেছে বেল।

'সোফি? শুনতে পাচ্ছ?'

কঙ্কালের হাসি!—ভাবছে রবিন। আরেকটা কাল্পনিক দৃশ্য! মৃত্যুর!

কার মৃত্যু?

বেকি'জ কফি শপের কথা মনে পড়ল রবিনের। স্কুল ছুটির পর ওখানে কাজ করে সোফি। এখন হয়তো ওখানেই আছে। হ্যাঁ, তা-ই হবে। স্কুলে আসেনি বটে। কিন্তু চাকরি ফাঁকি দেয়নি। টাকাটা নিশ্চয় তার ভীষণ দরকার।

বারান্দা থেকে দ্বিতীয়বারের মত নেমে এল রবিন। রাস্তায় নেমে বাতাসের মুখোমুখি হলো আবার। বেকি'জ কফি শপে চলল। সোফির সঙ্গে দেখা না করে যাবে না। এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে গিয়েই বা কি হবে। খালি বাড়ি।

তিন-চার ব্লক গিয়েছে, এ সময় কালো একটা জীপ গাড়ি এসে থামল তার পাশে। চলার গতি বাড়িয়ে দিল রবিন। কালো জীপওয়ালা কাউকে সে চেনে না।

কিন্তু জীপটা চলতে থাকল তার পাশে পাশে। নেমে গেল প্যাসেঞ্জার সীটের পাশের জানালার কাঁচ। উঁকি দিল একটা মুখ। 'রবিন, আমি। লাইব্রেরিতে দেখা হয়েছিল।'

থামল রবিন। ফিরে তাকাল। টম গ্যারিবাল্ডি।

গাড়ি থামিয়ে প্যাসেঞ্জার সীটের ওপর দিয়ে ঝুঁকে এল টম। হেসে বলল, 'ভয় পেলে নাকি?'

'না, তা কেন পাব?' গম্ভীর জবাব দিল রবিন।

'এসো, ওঠো,' ডাকল টম। 'কোথায় যাচ্ছ?'

'বেকি'জ কফি শপে। কিন্তু অপরিচিত মানুষের গাড়িতে উঠতে ভাল লাগে না আমার।'

'ঠিক আছে, ওঠো। যেতে যেতে পরিচিত হয়ে নেব,' টম বলল। তার কালো চোখের তারায় রাস্তার আলো পড়ে ঝিক করে উঠল। চেনা চেনা লাগল রবিনের। কোথায় দেখেছে ওই চোখ!

'কিন্তু আমার নাম জানলেন কি করে?' ফুটপাথ থেকে নেমে এল রবিন। 'কখনও আপনাকে বলেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'তাই?' চিবুক ডলল টম। 'লাইব্রেরিয়ানকে ওই নামে তোমায় ডাকতে শুনেছি।'

সরু সরু হয়ে এল রবিনের চোখের পাতা। 'উঁহু, ওখানে শোনেননি।

লাইব্রেরিয়ান আমাকে রবিন বলে ডাকে না, মাস্টার মিলফোর্ড বলে।'

'ঠিক আছে, নাহয় মিথ্যেই বলেছি। কফি শপে তোমার বন্ধু আমাকে বলেছে।'

'মিথ্যে বললেন কেন?' কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছে না রবিন। 'প্রথমেই সত্যিটা বললে পারতেন।'

হেসে উঠল টম। 'এমন জেরা শুরু করলে কেন? নাও, উঠে পড়ো।'

কিন্তু উঠল না রবিন।

সামনেই দেখা যাচ্ছে কফি শপটা। সেটার দিকে হাত তুলে বলল, 'ওই তো, এটুকু হেঁটেই যেতে পারব।' টমকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল সে।

চলতে শুরু করল জীপ। মোড় নিয়ে চলে গেল আরেক দিকে।

দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে এসে কফি শপে ঢুকল রবিন। ঢোকার সময় দরজার ঘণ্টার শব্দ, ভেতরের কোলাহল, অস্বস্তি দূর করে দিল তার।

কিন্তু কিছুতেই টমের কথা মন থেকে দূর করতে পারছে না। লোকটার রহস্যময় আচরণ, মিথ্যে বলা, সতর্ক করে তুলেছে তাকে।

টমের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল রবিন। কাউন্টারের শেষ মাথার সামনে একটা টুলে গিয়ে বসল। ব্যাকপ্যাকটা নামিয়ে রাখল মাটিতে, পায়ের কাছে। কফি শপটা এখন প্রায় শূন্য। একটা বুদে বসে কফি খাচ্ছে একজোড়া বয়স্ক দম্পতি। কাউন্টারের অন্য মাথায় বসে স্যান্ডউইচ খাচ্ছে শ্রমিকের পোশাক পরা একজন মোটাসোটা লোক।

সোফি কোথায়?

বকের মত গলা লম্বা করে রান্নাঘরের দেয়ালের আয়তাকার ফোকরটা দিয়ে দেখার চেষ্টা করল রবিন, যেটা দিয়ে ওয়েইটারের কাছে খাবার সরবরাহ করে বাবুর্চি। শিকে গাঁথা কাবাবের গন্ধ ভেসে আসছে রান্নাঘর থেকে।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল রান্নাঘরের সুইং ডোরটা। বেরিয়ে এল কফি শপের মালিক ডগলাস আর বাবুর্চি। ডগলাসের বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, মাথায় টাক, চোখে ভারী লেন্সের চশমা। কাবাবের প্লেটটা শ্রমিক গোছের লোকটার সামনে রাখতে রাখতে গান গাওয়ার মত সুর করে জিজ্ঞেস করল, 'স্যান্ডউইচটা কেমন?'

'একেবারে পচা,' রসিকতা করল লোকটা। 'সে-জন্যেই তো এখানে না এসে পারি না।'

কয়েক সেকেন্ড লোকটার সঙ্গে কথা বলল ডগ—নামটাকে সংক্ষিপ্ত করে এই নামেই ডাকে তাকে এখানে পরিচিতরা। ডগলাসই বলে দেয় এই নামে ডাকতে। রবিনের দিকে এগিয়ে এল সে। 'রবিন, তোমার বন্ধু কোথায়?'

একটা পেপার ন্যাপকিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কার কথা বলছেন?'

'সোফি।'

'আমি তো তার কথাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম আপনাকে,'

ন্যাপকিনটা দলামোচড়া করে ফেলল রবিন।
'আসেনি। ফোন করেও জানায়নি যে আসতে পারবে না। এ রকম তো করে না কখনও।'
জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'স্কুলেও যায়নি আজ।'
ন্যাপকিনটা ট্র্যাশ বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলল সে। 'কাল রাতের খবর তো নিশ্চয় শুনেছেন? বনের মধ্যে লাশ পাওয়ার কথা?'
টাক মাথা ডলল ডগ। 'হ্যাঁ। সকাল বেলায়ই পত্রিকায় পড়লাম।'
'তাহলে তো জানেনই, পুলিশ সন্দেহ করছে, লাশটা সোফির বোন শেলির,' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল রবিন। ব্ল্যাক ফরেস্টের এমন কোন ছেলেমেয়ে নেই, বেকি'জ কফি শপে খাবার খেতে কিংবা আড্ডা দিতে আসে না। ডগের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার আশায় বলল, 'বহুকাল ধরেই তো আছেন এখানে। শেলির উধাও হওয়ার ব্যাপারে কোন গুজব কানে এসেছিল আপনার? কেন নিরুদ্দেশ হলো?'
মাথা নাড়ল ডগ। 'না, খবরের কাগজে যতখানি পড়েছি।'
'ডগ,' কাপ তুলে ডাকল শ্রমিক, 'তোমার ওই কাদা-গোলা গরম পানি দাও তো আরেক কাপ, কফি বলে যেটাকে চালাও তুমি।'
'দিচ্ছি, দিচ্ছি,' হেসে উঠে গিয়ে কফিপট তুলে নিল ডগ।
কাউন্টারে দুই হাত রেখে সামনে ঝুঁকে বসে তার ফেরার অপেক্ষা করতে লাগল রবিন।
'এক্সকিউজ মি,' কানের কাছে বলে উঠল একটা পরিচিত শ্লেষ্মাজড়ানো কণ্ঠ, 'এ সীটটা কি কারও জন্যে রিজার্ভ করা?'
ফিরে তাকাল রবিন। টম গ্যারিবাল্ডি। হাসিমুখে ইঙ্গিত করল রবিনের পাশের টুলটার দিকে।
'হ্যাঁ হ্যাঁ, রিজার্ভ তো বটেই,' তিক্তকণ্ঠে রসিকতা করল রবিন, 'ইংল্যান্ডের রাজার জন্যে।'
হাসল টম। বসে পড়ল টুলটাতে। 'ঠিক আছে, রাজা এলে জায়গা ছেড়ে দেব। তো, কি খাবে?'
'আপনি এখানে এসেছেন কেন? ডিনার করবেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
'তুমিও কি এ জন্যেই এসেছ?'
মাথা নাড়ল রবিন। 'না, আমাকে বাড়ি যেতে হবে। নিজেই রান্না করে নেব। রাফিকে একা ফেলে এসেছি। কষ্ট পাবে সে।'
'তোমার কুকুর?'
'মানুষের নামও তো রাফি হয়। কুকুর যে জানলেন কি করে?'
হাত তুলল টম, 'কেন, পত্রিকায় লিখেছে না–রবিন নামে একটা ছেলে তার কুকুর রাফিয়ানের সাহায্যে বনের মধ্যে একটা লাশ উদ্ধার করেছে...'
'ও!' বাঁকা চোখে টমের দিকে তাকাল রবিন। 'কাল রাতে আপনিও বনে ঢুকেছিলেন নাকি?'
'আমি? নাহ্,' সহজ জবাব দিল টম। ডান হাতের কনুই কাউন্টারে রেখে

হাতের তালুতে থুতনি রাখল সে। 'তা লাশটা কি করে খুঁজে পেলে, বিস্তারিত বলবে আমাকে?'

কঙ্কালের হাতটার কথা মনে করে গায়ে কাঁটা দিল রবিনের। 'না। ওই বিষয়ে কথা বলার আগ্রহ আমার নেই এখন। ভাবলেই কেমন লাগে। বেকারভিল কলেজ ম্যাগাজিনের রিপোর্টার-টিপোর্টার যদি হয়ে থাকেন আপনি, আমার কাছ থেকে তথ্য জোগাড়ের আশা বাদ দিন।'

মাথা নাড়ল টম, 'আমি রিপোর্টার নই।'

তার দিকে ঘুরে বসল রবিন। 'তাহলে ব্ল্যাক ফরেস্টে ঘোরাঘুরি করছেন কেন? এখানে বাসা নিয়েছেন?'

আবার মাথা নাড়ল টম। 'না। আমি বেকারভিলেই। গাড়ি নিয়ে ওখান থেকে এখানে আসতে আর কতক্ষণ?...যাকগে, কি খাবে বললে না তো। বার্গার আনতে বলি?'

রবিনের সম্মতির অপেক্ষা করল না টম। দুটো বার্গার দিতে বলল।

আধঘণ্টা পর ঘড়ি দেখল রবিন। 'বাপরে, সাতটা বাজে! সেই সকালে বেরিয়েছি বাড়ি থেকে, রাফি নিশ্চয় অস্থির হয়ে গেছে।'

'চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই...'

কথা শেষ হলো না টমের। দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল টুংটাং করে। কেউ ঢুকছে।

ঘরে ঢুকলেন লেফটেন্যান্ট জেনসেন।

তাঁকে দেখেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন। ছুটে গেল জেনসেনের দিকে। 'আঙ্কেল, সোফি কোথায়? ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি। ও ঠিক আছে তো?'

শূন্য দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন জেনসেন, যেন তাকে চিনতে পারছেন না। তারপর মাথা ঝাঁকালেন। 'হ্যাঁ, ভালই আছে। ওর ফুফুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি কয়েক দিনের জন্যে। সেটাই জানাতে এলাম ডগকে।'

'আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল,' রবিন বলল। লাশটার কথা জিজ্ঞেস করতে যাবে, কিন্তু সুযোগ দিলেন না জেনসেন। সরে গেলেন। কাউন্টারে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন ডগের সঙ্গে।

দুই হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। খানিক পর যখন ফিরে তাকাল, অবাক হয়ে দেখে টম নেই।

কোথায় গেল ও? বাথরুমে?

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে যাবার আগে রবিনের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন জেনসেন।

'আঙ্কেল, সোফিকে বলবেন আমাকে ফোন করতে,' ডেকে বলল রবিন। ফিরে তাকাল বাথরুমের দিকে। চুমুক দিয়ে শেষ করতে লাগল বাকি সোডাটুকু।

'আর কিছু লাগবে তোমার?' রবিনকে জিজ্ঞেস করল ডগ। 'ব্যানানা ক্রীম পাই, পচতে এখনও দেরি আছে।' এ রকম করেই কথা বলে ডগ।

'না,' মাথা নাড়ল রবিন, 'ওসব খেতে আর ইচ্ছে করছে না এখন। বাড়ি যাব। টম কোথায় গেল?'

'টম? তোমার সঙ্গে বসে যে লোকটা খাচ্ছিল?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

দরজার দিকে ইঙ্গিত করল ডগ, 'ও তো কখন চলে গেছে।'

দম আটকে ফেলল রবিন। 'চলে গেছে!'

'হ্যাঁ। তুমি যখন জেনসেনের সঙ্গে কথা বলছ, কয়েকটা টাকা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে এমন ভাবে বেরিয়ে গেল, যেন ভূতে তাড়া করেছে।'

হেঁটে বাড়ি ফিরে এল রবিন।

লিভিং রুমে আলো জ্বলতে দেখে অবাক হলো। সকালে আলো জ্বেলে রেখে গিয়েছিল বলে তো মনে পড়ে না! বাবা-মা ফিরে এল? এত সকালে আসার কথা নয়।

তাড়াহুড়ো করে এসে ঘরে ঢুকল সে। দেখে মুসা বসে আছে। খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছে।

রবিনকে দেখে কাগজটা সরিয়ে রাখল মুসা। 'সকালেই পড়েছি খবরটা,' বলল সে। 'সারাদিন আর সময় পাইনি। স্কুল সেরেই ছুটলাম।'

'কিশোর শুনেছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ও-ই তো আমাকে ফোন করে জানাল।'

'ও এল না?'

'নেই তো, আসবে কি? জরুরী খবর পাঠিয়েছেন মেরিচাচীর এক বোন। মেরিচাচী যেতে পারেননি। কিশোর যেতে বাধ্য হয়েছে। আমাকে বলেছে, যত তাড়াতাড়ি পারে কাজ সেরে চলে আসবে। তোমাকে চিন্তা করতে মানা করেছে। আমাকে বলে দিয়েছে, কোন কিছুর দরকার হলে আমি যেন তোমাকে সাহায্য করি।'

'অ!' কিশোর নেই শুনে হতাশই হলো রবিন। তবে মুসা আসাতে খুশি হয়েছে। একা একা রাত কাটাতে ভাল লাগত না।

'কিন্তু সন্ধ্যাবেলা বনে গিয়েছিলে কেন, বলো তো?' জানতে চাইল মুসা।

'এই এমনি। রাফিকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। ও-ই খুঁজে বের করেছে।'

ব্যাকপ্যাকটা নামিয়ে রেখে মুসার পাশে এসে বসে পড়ল রবিন। সব কথা খুলে বলতে লাগল ওকে।

সাত

সকাল বেলা মুসা ফিরে গেল আবার রকি বীচে। রবিন রওনা হলো স্কুলে। ওরা

এখন আলাদা স্কুলে পড়ে। ব্ল্যাক ফরেস্ট থেকে রকি বীচ অনেকটাই দূর। রকি বীচ স্কুলে যেতে সময় লাগে বলে আপাতত ছেড়ে দিয়েছে রবিন। রকি বীচের বাড়িতে আবার ফিরে গেলে তখন ওখানকার স্কুলে যাবে।

সোফিকে সেদিনও স্কুলে দেখা গেল না। আজ আর অবাক হলো না রবিন। সোফি কোথায়, জানা আছে তার।

বিকেল বেলা স্কুল ছুটির পর লাইব্রেরিতে রওনা হলো।

'গুড আফটারনূন, মাস্টার রবিন,' স্বাগত জানালেন তাকে হেড লাইব্রেরিয়ান। 'আজ অনেক কাজ জমিয়ে রেখেছি তোমার জন্যে।'

'ভাল,' খুশিই হলো রবিন। কাজের মধ্যে থাকলে অন্যমনস্ক হওয়ার সুযোগ কম, দুশ্চিন্তা দূরে থাকে, ভয়াবহ কাল্পনিক দৃশ্যগুলোও হয়তো দেখতে পাবে না।

ভালই কাটল সময়টা। কাজ সেরে বেরোনোর আগে মনে হলো, লেফটেন্যান্ট জেনসেনকে ফোন করে সোফির ফুফুর নম্বরটা জেনে নেয়।

ফোন করল সে।

কেউ একজন ধরল ওপাশ থেকে। এক সেকেন্ড ধরে রেখে কিছুই না বলে নামিয়ে রাখল।

লাইন কেটে গেছে মনে করে আবার ফোন করল রবিন। কিন্তু আর ধরল না কেউ। অবাক লাগল। ফিরে এল নাকি সোফি? জেনসেন হলে কথা বলতেন। সোফিই বা বলল না কেন? সন্দেহ দেখা দিল তার মনে। ঠিক করল, আজও যাবে সোফিদের বাড়িতে। জেনে আসবে, ঘটনাটা কি?

আজ আর গত সন্ধ্যার মত ঝোড়ো হাওয়া নেই। তবে ঠাণ্ডা আছে।

বাড়িটা আগের রাতের মতই অন্ধকার দেখল রবিন। বারান্দায় উঠে বেল বাজানোর বোতাম টিপে ধরে রাখল।

কিন্তু গতদিনের মতই সাড়া পেল না।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে জোরে জোরে ডাকল, 'সোফি! খোলো! আমি রবিন!'

নব ধরে মোচড় দিল। তাকে অবাক করে দিয়ে ঘুরে গেল নবটা। তালা দেয়া নেই।

একবার দ্বিধা করে দরজা খুলে ফেলল রবিন। অন্ধকার হলওয়ের দিকে তাকাল।

'সোফি?' ডাক দিল সে।

হলের ভেতরে বদ্ধ বাতাসের ভাপসা গন্ধ।

ভেতরে পা রাখল রবিন। ভারী নীরবতা যেন গিলে নিল ওকে।

'সোফি?' আবার ডাক দিয়ে অন্ধকারটা চোখে সইয়ে নিতে লাগল রবিন।

কান খাড়া। পুরো বাড়ি নীরব।

'সোফি? কোথায় তুমি?' সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল রবিন। পায়ের চাপে ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল সিঁড়ি।

সোফির ঘর কোনটা? দোতলার ঘরটার কথা ভাবল সে।

'সোফি?' দোতলায় উঠে আন্দাজে রওনা হলো রবিন। দেখতে পেল

একটা দরজার অর্ধেকটা খোলা। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'সোফি, ভেতরে আছ?'

জবাব নেই।

ভারী করে দম নিয়ে ঠেলা মেরে পাল্লাটা পুরো খুলে ফেলল সে। দরজায় দাঁড়িয়ে থেকেই ভেতরে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল।

ঘরে আলো জ্বলছে না। তবে জানালা দিয়ে আসা সন্ধ্যার আবছা আলোতে বিছানাটা ঠিকই চোখে পড়ল।

বিছানার ওপর মানুষটাকেও দেখা গেল। পড়ে থাকার ভঙ্গিটা ভাল মনে হলো না রবিনের। দম আটকে এল তার। চিৎকার করে উঠল, 'সোফি! সোফি!'

দরজার নব চেপে ধরল সে। ভাঁজ হয়ে যেতে চাইছে হাঁটু। অস্পষ্ট আলোয় সোফির এলিয়ে পড়া কালো চুল দেখতে পাচ্ছে।

উপুড় হয়ে আছে সোফি। দুই হাত দুই পাশে ছড়ানো। নিথর। নিস্তব্ধ।

বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে রবিনের। মরে গেল নাকি!

সোফির নাম ধরে চিৎকার করতেই থাকল রবিন।

অবশেষে নড়ে উঠল দেহটা।

মাথা উঁচু করল সোফি। হাত দিয়ে সরিয়ে দিল কালো চুলের বোঝা। রবিনের দিকে তাকাল। জড়ানো স্বরে বলল, 'তুমি?'

এতক্ষণে আলো জ্বালার সাহস পেল রবিন। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে দিল। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে বসল বিছানার সামনে, সোফির মুখোমুখি।

'খোদা!' এখনও গলা কাঁপছে রবিনের। 'আমি তো ভাবলাম...'

'ঢুকলে কি করে?' উঠে বসল সোফি।

'সোফি, কি হয়েছে তোমার?' সোফির প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'ঘটনাটা কি?'

'ঘটনা খুব খারাপ,' কথা বলতে গিয়ে কান্নার মত ফোঁপানি বেরোল সোফির গলা দিয়ে।

বিছানায় ফেলে রাখা একটা বড় খেলনা ভালুক তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরল সোফি। রবিন লক্ষ করল, তার পরনে সেই ওয়েইট্রেসের পোশাকই রয়েছে এখনও, তার ওপর সোয়েটার, বনের মধ্যে যে পোশাকে দেখা গিয়েছিল তাকে। বন থেকে আসার পর আর বদলায়নি মনে হচ্ছে।

মেঝেতে দলামোচড়া হয়ে পড়ে আছে বিছানার চাদর, কম্বল। দেয়ালে কোন ছবি নেই, পোস্টার নেই, কোন রকমের অলঙ্করণ নেই।

'সোফি...তোমার জন্যে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল আমার,' কিভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না রবিন। 'তোমাকে না দেখে তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তুমি কোথায়, তিনি বললেন ফুফুর বাড়িতে গেছ। কিন্তু...'

নাক দিয়ে খোঁৎ-খোঁৎ শব্দ করল সোফি। 'ফুফু? আমার কোন ফুফু নেই!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তার কণ্ঠ। হাতের আঙুলগুলো শক্ত হয়ে গেল ভালুকটার

ওপর। দেয়ালের দিকে মুখ ঘোরাল সে।

আরেকটু সামনে ঝুঁকল রবিন। 'বলো তো ঘটনাটা কি? সব খুলে বলো, যাতে তোমাকে সাহায্য করতে পারি আমি।'

'কি আর সাহায্য করবে? আমার বোনকে তো আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না,' ফোঁপাতে শুরু করল সোফি।

সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে তার কাঁধে হাত রাখল রবিন।

'লাশটা কার জানার পর বাবা উন্মাদের মত হয়ে গেছে,' সোফি জানাল। 'সেদিন রাতের পর তার সঙ্গে আর কোন কথা হয়নি আমার। বাড়ি আসে, কোনমতে নাকেমুখে কিছু খাবার গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। একটা কথাও বলে না। কিচ্ছু না। এমনকি শেলির সম্পর্কেও না।'

আবার ফোঁপাতে শুরু করল সে। কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তার শরীরটা। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ভালুকটার পেটে মুখ গুঁজল।

তাকে শান্ত হবার সময় দিল রবিন।

সময় কাটছে। সোফির কাঁধের কাঁপুনি কমে এল। দুজনের কেউ কথা বলছে না।

অস্বাভাবিক ভারী নীরবতা। শীতল। অসহ্য।

অবশেষে সহজ হয়ে এল সোফির দেহ। ভালুকের ওপর শিথিল হলো আঙুল।

রবিনের মনে হলো সোফি ঘুমিয়ে পড়েছে। মেঝে থেকে কম্বলটা তুলে নিয়ে ঢেকে দিল সোফিকে। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বেচারি সোফি! ভয়ানক পরিস্থিতিতে আছে ও। কিন্তু ওর জন্যে কি করতে পারে সে?

একা বাড়িতে তাকে ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কিন্তু যদি তার বাবা ফিরে আসেন, কি জবাব দেবে? এমনিতেই তাঁর মানসিক অবস্থা ভীষণ খারাপ, তাঁকে আরও উত্যক্ত করতে চায় না রবিন।

এক কাজ করা যেতে পারে। বাড়ি ফিরে ফোন করে তাদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে বলতে পারে সোফিকে।

দ্রুতপায়ে হলে ফিরে চলল রবিন। সোফির ঘরের উল্টো দিকে আরেকটা দরজা চোখে পড়ল। পাল্লা খোলা। নিশ্চয় শেলির ঘর। কৌতূহল যেন চুম্বকের মত আকর্ষণ করতে লাগল রবিনকে।

এগিয়ে গেল সে। ঠেলা দিয়ে পুরো খুলে ফেলল পাল্লাটা। ঘরে উঁকি দিল। বড় বড় ফুলওয়ালা চাদরে ঢাকা বিছানা। পুরানো ধাঁচের ঝালরওয়ালা বালিশ। বিছানায় পড়ে আছে ধুলো ঝাড়ার একটা ঝাড়ন। কাঁচের টপওয়ালা ছোট একটা টেবিলে সুন্দর করে সাজানো চুল আঁচড়ানোর ব্রাশ, চিরুনি, পারফিউম, আর মেকআপের সরঞ্জাম। জানালায় গোলাপী পর্দা। নিচ থেকে সেদিন এই জানালার দিকেই তাকিয়েছিল, বুঝতে পারল রবিন।

এতটুকু ময়লা নেই ঘরে।

নিশ্চয় সোফিই পরিষ্কার করে রাখে।

ড্রেসারের ওপর রাখা একটা বাঁধানো ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করল রবিনের। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল ওটা। স্কুলে পড়ার সময়কার ছবি।

হাসি হাসি মুখটা দেখতে অবিকল সোফির মত, কেবল নীল চোখ দুটো বাদে। কাঁধ ছাড়িয়ে নেমে এসেছে ঘন কালো চুল।

কিভাবে মারা গেল শেলি–ভাবছে রবিন।

বনের মধ্যে ওই নিঃসঙ্গ অন্ধকারে কে কবর দিল তাকে?

এতকাল তার কবরটা দেখতে পেল না কেউ! আশ্চর্য! সম্ভবত বনের ওদিকটাতে যায়-টায় না কেউ। ব্ল্যাক ফরেস্টের বনকে এমনিতেই লোকে ভয়ের চোখে দেখে। তার ওপর গোরস্থানের পাশের এলাকা। গোরস্থানটাকে তো আরও ভয় করে লোকে। ভূত-প্রেত-পিশাচের নাকি অভাব নেই ওখানে। যখন-তখন নানা রকম অদ্ভুত, ভুতুড়ে কাণ্ড-কারখানা ঘটে। ভয়েতেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক, ওদিকে কেউ যায়নি বলেই কবরটা এতদিন অনাবিষ্কৃত থেকেছে বলে মনে হলো ওর।

ছবিটা ভাল করে দেখতে লাগল রবিন, সূত্রের আশায়। হাসিমুখের সুন্দরী মেয়েটাকে দেখেই বোঝা গেল, স্কুলে খুব জ প্রিয় ছিল সে, সবাই তাকে পছন্দ করত। এ রকম মেয়ের শত্রু থাকার কথা নয়।

তারপরেও মরতে হলো!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রবিন। তার চোখের সামনে পরিবর্তিত হতে শুরু করল ছবিটা। মিলিয়ে গেল শেলির হাসি। গাঢ় রঙের লিপস্টিক লাগানো ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল।

চোখ মিটমিট করল রবিন।

কি ঘটছে? কি দেখছি আমি?–ঘাবড়ে গেল সে। কল্পনা করছে? নাকি দৈব-দর্শন!

ফাঁক হলো শেলির ঠোঁট। তার চকচকে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল, আতঙ্কে।

রবিনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল সে।

চিৎকার! চিৎকার! করেই চলেছে!

আতঙ্কিত; নীরব চিৎকার। শব্দ হচ্ছে না। কিন্তু অনুভব করতে পারছে যেন রবিন।

হাত থেকে পড়ে গেল ছবিটা। ঝনঝন করে কাঁচ ভেঙে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

দৌড় দেয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল রবিন।

ঢোকার পর দরজাটা লাগিয়ে দিয়েছিল। ডোরনব ধরে মোচড় দিয়ে হ্যাঁচকা টান মারল। খুলে গেল পাল্লা। ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ লাগল গালে। পাগলের মত দৌড়াতে শুরু করল সে। যত জোরে সম্ভব।

কিভাবে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে, ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল, বলতে পারবে না।

বোধহয় ঘোরের মধ্যে ছিল বলেই পেছনের ছুটন্ত পদশব্দটা কানে আসেনি

প্রথমে। তার নিজের পায়ের শব্দও অন্য শব্দটাকে আলাদা করে বুঝতে দেয়নি।

যখন বুঝল, অনুসরণ করা হচ্ছে তাকে, দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে।

কে আসছে দেখতে গিয়ে সামনের দিকে নজর রইল না, বেরিয়ে থাকা গাছের শিকড়ে পা বেধে উড়ে গিয়ে পড়ল রাস্তার ওপরে। পাকা রাস্তায় না পড়ে পাশের ঘাসে ঢাকা অংশে পড়াতে রক্ষা, নইলে হাঁটু-কনুই সব ছিলে যেত।

ধুড়ুস করে তার গায়ের ওপর এসে পড়ল আরেকটা দেহ।

ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল তার। মনে হলো শেলির ভূত তাড়া করে এসে চেপে ধরেছে তাকে। ঝাড়া দিয়ে ওটাকে সরানোর চেষ্টা করতে লাগল সে। গড়িয়ে সরে গেল। উঠে বসল হাঁচড়ে-পাঁচড়ে।

দম নেয়ার জন্যে আইঢাই করছে ফুসফুসটা।

কে তার ওপর পড়েছে দেখার জন্যে ফিরে তাকাল। চিৎকার করে উঠল, 'আপনি!'

আট

'তুমি কার কথা ভেবেছিলে?' জানতে চাইল টম গ্যারিবাল্ডি। রবিনের মতই সে-ও শিকড়ে পা বেধে পড়েছে। টেনেটুনে খাড়া করল নিজেকে। কালো জিনস থেকে ঝেড়েঝুড়ে বালি আর শুকনো কুটো-পাতা ফেলতে লাগল।

'আমি...' চুপ হয়ে গেল রবিন। ভূতের ভয়ে যে দৌড় দিয়েছিল, সেটা আর জানাল না টমকে। কিন্তু কি দেখল? রোগাক্রান্ত মগজের কল্পনা, নাকি সত্যি সত্যি দৈব-দর্শন! প্রায় অলৌকিক এই ক্ষমতাটা সত্যি কি তৈরি হয়েছে তার মধ্যে? বলল, 'আসলে...আসলে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আপনি এর জন্যে দায়ী। অন্ধকার রাস্তায় কেউ তাড়া করলে ভয় পাবারই কথা, তাই না?'

মিথ্যে কথাটা নিজের কানেই কেমন ফোঁপরা শোনাল।

রবিনের মাথায় ঠোকর লেগে ঠোঁট কেটে গেছে টমের। আঙুল দিয়ে চেপে ধরল। 'তোমার নাম ধরে যে ডাকলাম শুনতে পাওনি?'

জবাব না দিয়ে আচমকা রেগে উঠল রবিন, 'আমার পিছু নিয়েছেন কেন?' উঠে বসেছে সে। পাঁজরে ব্যথা পেয়েছে। হাঁটুও ব্যথা করছে। 'আপনাকে কি আমার বডিগার্ড বানিয়েছি? যেখানেই যাচ্ছি, অনুসরণ করে চলেছেন!'

ঠোঁটের কাটাটায় আঙুল বুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল টম। 'তোমার রাগের কারণ বুঝতে পারছি—কাল রাতে কিছু না বলে চুপচাপ পালিয়েছি বলে নিশ্চয়...'

'না, পালানোর জন্যে রাগিনি। সব সময় কেউ আমার পিছু নিতে থাকলে সেটা আমার ভাল লাগে না।' রাগ কমানোর চেষ্টা করল রবিন। 'তা, পালিয়েছিলেন কেন?'

শ্রাগ করল টম। 'জরুরী কারণ ছিল। এখন বলা যাবে না।' পকেট থেকে একটা লাল রুমাল বের করে ঠোঁটের কাটায় চেপে ধরল। 'কিন্তু তুমি ওভাবে ছুটছিলে কেন? মনে হলো যেন ভূতে তাড়া করেছে।'

'উঁ...' কথা খুঁজে পেল না রবিন। কেন পালাচ্ছিল, সেটা বললে তাকে পাগল ভাববে টম। তার মগজে গোলমাল হয়েছে, বুঝে যাবে। অথচ সেই কথাটাই যেন শোনার জন্যে চাপাচাপি করছে টম।

দুই হাতে হাঁটু পেঁচিয়ে ধরে ঘাসের ওপর বসে রইল সে। বেকি'জ কফি শপ থেকে টমের পালানোর কথাটা ভাবল। হুট করে ওভাবে চলে যাওয়াটা অবাক লেগেছিল তার, কিছুটা রাগও যে হয়নি তা নয়। মাত্র গতকালকের কথা। অথচ মনে হচ্ছে কতকাল আগে!

মুখ তুলে তাকাল টমের দিকে। 'আমাকে কি পাগল ভাবছেন আপনি?'

'কেন?' রবিনের মুখোমুখি বসে পড়ল টম। চুলে আটকে থাকা একটা মরা পাতা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল। 'পাগল ভাবব কেন?'

'এই যে পাগলের মত দৌড়ালাম?'

'না, পাগল ভাবছি না। দৌড়াচ্ছিলে কেন?'

বলবে কিনা ভাবতে লাগল রবিন। বড় করে দম নিয়ে বলল, 'জেনসেনদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সোফির সঙ্গে কথা বলতে।'

মাথা ঝাঁকাল টম। 'আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তোমাদের বাড়িতে ফোন করেছিলাম। জবাব না পেয়ে বুঝলাম, নিশ্চয় সোফির সঙ্গে দেখা করতে গেছ। আমিও সেজন্যে ওখানে গিয়েছিলাম। তোমাকে বেরোতে দেখে পিছু নিলাম।'

সামনে গলা বাড়িয়ে দিল টম। রবিনের চোখে চোখে তাকাল। 'কি ঘটেছে সোফিদের বাড়িতে? খারাপ কিছু?'

'অন্ধকারে বিছানায় পড়ে আছে সোফি। পাগলের মত অবস্থা। ওর বাবাও নাকি ওর সঙ্গে কথা বলে না। বড় মুষড়ে পড়েছে বেচারি!'

কথা বলতে বলতে অবচেতন ভাবেই টান দিয়ে একমুঠো ঘাস ছিঁড়ে নিল রবিন। 'ওকে সান্ত্বনা দেয়া প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কি সান্ত্বনা দেব?' টমকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল সে। 'চুপচাপ বসে থাকলাম একটা চেয়ারে, ওর মুখোমুখি। কাহিলও হয়ে পড়েছে বেচারি। একেবারে বিধ্বস্ত। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল আমার সামনেই। চুপচাপ উঠে বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম বাড়ি গিয়ে একটা ফোন করব, আমাদের ওখানে গিয়ে থাকতে। তারপর...' শেলির চিৎকারের দৃশ্যটা কল্পনায় আসতেই শিউরে উঠল সে। 'মনে হয় অতিকল্পনার রোগে ধরেছে ইদানীং আমাকে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে রবিনের দিকে তাকিয়ে আছে টম। চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না ও কি ভাবছে।

'সব তো বললাম,' বলল রবিন। 'এবার প্রশ্ন করার পালা আমার, কি বলেন? আমার পিছু নিয়েছিলেন কেন?'

ঠোঁটের কাটা জায়গাটায় আঙুল রাখল টম। রক্ত বেরোনো বন্ধ হয়েছে। 'ক্ষমা চাইতে। কাল কফি শপে কিছু না বলে পালিয়ে আসার জন্যে।'

রবিনের মনে হলো, এটা কোন যুক্তি নয়। বলল, 'বলে যান, আমি শুনছি।'

চোখ নামাল টম। ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী সহ পাশের বড় আঙুলের ডগা এক করে মোচার মত বানিয়ে তাকিয়ে রইল সেটার দিকে। 'কাল ওভাবে পালানোর জন্যে সত্যি দুঃখিত। কফি শপে পুলিশ দেখে…মনে পড়ল, গাড়িটা নো-পার্কিং এলাকায় রেখে এসেছি। ভয় হলো, গাড়িটা বেআইনী জায়গায় দেখলে একটা টিকেট লাগিয়ে দেবে। এমনিতেই বহুত টিকেট খেয়েছি। জরিমানা দেয়ার মত টাকা আর নেই এখন আমার কাছে। কাজেই পালালাম। গাড়িটা সরিয়ে রেখেই আবার কফি শপে ঢুকেছিলাম, কিন্তু তুমি তখন চলে গেছ।'

'বহুত টিকেট খেয়েছেন মানে?' টমের কথা সন্দেহ দূর করা তো দূরের কথা, আরও বাড়াচ্ছে রবিনের।

হাসল টম। বোকা-বোকা দেখাল হাসিটা। 'ওই তো, ক্যাম্পাসে। যেখানে সেখানে গাড়ি রেখে বহুত জরিমানা দিয়েছি।'

'হুঁম!' টমের এ কথাটাও বিশ্বাস করল না রবিন। তবে কেন যেন লোকটাকে খারাপ বলেও ভাবতে পারছে না। তাহলে এত কথা বলত না তার সঙ্গে।

'আজ তোমাকে খোঁজাখুঁজি করেছি কালকের ঘটনাটার জন্যে মাপ চেয়ে নিতে। কেন পালিয়েছি, জানাতে,' টম বলল। 'কিন্তু তুমি যা কাণ্ড করলে না!' শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে, 'মাথা খারাপ নাকি তোমার?'

'হয়ে গিয়েছিল,' অস্বীকার করল না রবিন। 'তবে এখন কাটিয়ে উঠেছি।'

'গুড।' উঠে দাঁড়াল টম। একটা হাত বাড়িয়ে দিল রবিনের দিকে।

দ্বিধা করল রবিন। তবে ধরল হাতটা। তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল টম।

প্যান্টে লেগে যাওয়া মাটি ঝাড়তে লাগল রবিন। অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন এখন?'

'চলো কোনখান থেকে ঘুরে আসি,' টম বলল। 'সিনেমা দেখা যেতে পারে। রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়া যায়। মগজের ঘোলাটে ভাবটা কাটবে তোমার।'

এতক্ষণে হাসল রবিন। 'তারমানে সত্যি সত্যি পাগল ভাবছেন আমাকে?'

'না, তা ভাবছি না,' টমও হেসে পরিবেশটাকে হালকা করার চেষ্টা করল। 'অতিরিক্ত ভয় পেলে উল্টোপাল্টা কত কিছুই দেখে মানুষ, উদ্ভট কাণ্ডও করে বসে।'

অবাক লাগছে রবিনের। তার মনের কথা আন্দাজ করে নিচ্ছে কি করে টম! সত্যিই তো ভয় পেয়েছে সে। মগজটাও যেন কেমন হয়ে আছে। ভাল করার চেষ্টা করছে সে। পারছে না। কি যে ঘটে যাচ্ছে, ব্যাখ্যা করে বোঝানোও বড় কঠিন।

'না, সিনেমায় যেতে ইচ্ছে করছে না, টম।'

'কেন? কারণ তো একটা নিশ্চয় আছে। খারাপ লাগছে?'

'না, কোন কারণ নেই। ভালও লাগছে না, খারাপও লাগছে না। কি লাগছে সেটা বোঝানো যাবে না।' নখ কামড়াল সে। 'তা ছাড়া গত দুদিনে যা সব কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে!'

'বনের মধ্যে লাশ খুঁজে পাওয়ার কথা বলছ তো? নাকি আর কোন কারণ? বহুকাল আগে ঘটে যাওয়া কোন দুর্ঘটনা, মাথায় আঘাত পাওয়া...'

ঝট করে ফিরে তাকাল রবিন। 'আপনি কি করে জানলেন!'

'না, জানি না!' তাড়াতাড়ি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল টম। 'এমনি বললাম। মাথায় আঘাত পেলে অনেক সময় এ ধরনের সমস্যা হয় মানুষের, তোমার যেটা হচ্ছে।...যাকগে, কোথাও যেতে না চাইলে নেই। বরং বাড়িই চলে যাও। গিয়ে একটা ঘুম দাও। ভাল ঘুম হলে দেখবে সকালে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

নয়

রবিবার সকালে নাস্তা খেতে খেতে কাউন্টারের ওপর রাখা ছোট টেলিভিশনটার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। রাফি তার পায়ের কাছে বসে হাড় চিবুচ্ছে। সকালের রোদ চুইয়ে ঢুকছে রান্নাঘরে।

আবহাওয়া রিপোর্ট বলেছে, দিনটা ভাল যাবে। রোদ থাকবে। তারপর পর্দায় দেখা দিল খবর পাঠক। হৃৎপিণ্ডটা প্রায় গলার কাছে লাফিয়ে উঠল রবিনের যখন শুনল লোকটা বলছে: আমাদের খবর পর্যালোচনায় আবার ফেরত যাচ্ছি; এখনকার আলোচ্য বিষয় ব্ল্যাক ফরেস্টের বনে একজন তরুণীর লাশ উদ্ধার।

টুল থেকে লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে শব্দ বাড়িয়ে দিল রবিন। বদলে গেল ছবি। ব্ল্যাক ফরেস্ট থানার সামনের অংশটা চিনতে পারল সে। ছোটখাট, ছিমছাম পোশাক পরা একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির কাছে। হাতে মাইক্রোফোন। ইঙ্গিত করল ঘরের সামনের দরজার দিকে।

'বছর দুই আগে ব্ল্যাক ফরেস্টের একজন জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের জীবনে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে,' মহিলা বলল। 'লেফটেন্যান্ট স্যামুয়েল জেনসেনের তরুণী কন্যা রহস্যময় ভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল, কোন সূত্র না রেখে। দুদিন আগে বনের মধ্যে একটা কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে প্রায় কঙ্কাল হয়ে যাওয়া যে লাশটা পাওয়া গেছে, সেটা শেলি জেনসেনের বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ।'

পর্দায় ফুটে উঠল শেলির স্কুল জীবনের ছবি।

বদলে গেল দৃশ্যপট। ব্ল্যাক ফরেস্ট গোরস্থান থেকে সরতে সরতে ঢুকে গেল বনের মধ্যে, কবরটার কাছে, যেটা খুঁজে পেয়েছে রবিন।

আবার বসে পড়ল সে। চামচটা তুলে নিল। কিন্তু টেলিভিশনের দিকেই নজর, খাওয়া আর হচ্ছে না। ক্যামেরার চোখ ফিরে গেল প্রতিবেদকের কাছে। থানার সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে নেমে এলেন জেনসেন আর গাঢ় রঙের স্যুট পরা একজন লোক।

তাঁদের কাছাকাছি উঠে গেল প্রতিবেদক। 'লেফটেন্যান্ট জেনসেন, দুই বছর আগে আপনার মেয়ের নিরুদ্দেশের ঘটনাটাকে "ঘর পালানো"দের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, তাই না?'

রুক্ষ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন জেনসেন। সিঁড়ি বেয়ে নামা বন্ধ হলো না। তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে পাশে পাশে দৌড়ে চলল প্রতিবেদক। 'আর আপনি তখন সন্দেহ করেছিলেন, এর মধ্যে অন্য কোন ব্যাপার আছে। আপনি নিজেও তো গোয়েন্দা। এ ব্যাপারে তদন্ত থামিয়ে দিলেন কেন?'

দাঁড়িয়ে গেলেন জেনসেন। 'অন্য কিছু যে আছে, সে-ব্যাপারে শিওর হওয়ার জন্যে তখন কোন সূত্র ছিল না আমাদের হাতে,' ক্লান্ত, নীরস শোনাল তাঁর কণ্ঠ। 'তা ছাড়া শেলির বন্ধুরা তদন্তকারী অফিসারকে বলেছিল, সে তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। এ কারণেই ঘর-পালানোদের তালিকায় নাম লেখা হয়েছিল তার।'

'সেই বয়ফ্রেন্ডকে কি পাওয়া গেছে? কখনও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ?'

'না। একই দিনে উধাও হয়ে গিয়েছিল সে-ও। বেকারভিলে তার বাড়িতে, আরও নানা জায়গায় প্রচুর খোঁজা হয়েছে। পাওয়া যায়নি। তাকে খুঁজে বের করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আমার বিশ্বাস, একই দিনে খুন করা হয়েছে তাকেও।' চোখের পাতা সরু হয়ে এল জেনসেনের। 'আপনার কথা শেষ হয়েছে নিশ্চয়। এখন আমাকে যেতে দিন।'

জবাবের অপেক্ষা না করে ঘুরে দাঁড়ালেন জেনসেন। সাইডওয়াক ধরে তাঁর পাশে পাশে দৌড়ে চলল প্রতিবেদক। 'লেফটেন্যান্ট জেনসেন, আপনার মেয়ে কিভাবে মারা গেছে?'

'সম্ভবত ছুরি মেরে!' কালো একটা গাড়ির সামনের সীটে বসে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিলেন জেনসেন।

ক্যামেরার দিকে ঘুরে দাঁড়াল প্রতিবেদক। 'এতক্ষণ দেখলেন শেলি জেনসেনের বাবা লেফটেন্যান্ট স্যামুয়েল জেনসেনের সাক্ষাৎকার। ব্ল্যাক ফরেস্টের পুলিশ ঘটনাটাকে খুনের কেস হিসেবে সন্দেহ করছে এখন। শেলি জেনসেনের বয়ফ্রেন্ডকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা। বয়ফ্রেন্ডের নাম ফ্রেডেরিক হুফার। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে পুলিশ এখন ওকে খুঁজে বের করার জন্যে কম্পিউটার টেকনোলজি ব্যবহার করছে। ফ্রেড হুফারের ব্যাপারে কারও কিছু জানা থাকলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।'

শেলির বয়ফ্রেন্ডকে খুঁজে বেড়াচ্ছে!—বিড়বিড় করল রবিন

ফ্রেড হুফার! বেকারভিল! টম গ্যারিবাল্ডি জানিয়েছে, ওদের বাড়ি বেকারভিলে। কথাটা ভাবতেই হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেল রবিনের। নাম

গোপন করে ছদ্মনাম বলাটা কঠিন কোন ব্যাপার না। কফি শপে জেনসেনকে দেখে টমের পালানোর জবাবটাও পেয়ে গেছে বলে মনে হলো তার।

লেফটেন্যান্ট জেনসেনের ক্লান্ত চেহারাটা কল্পনা করল সে। শেলির খুনিকে ধরার জন্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তিনি। তাই বলে সোফির প্রতি একেবারে নজর না দেয়াটা ঠিক হচ্ছে না তাঁর, রবিনের মনে হলো। শেলি মৃত, আর সোফি জীবিত।

ফোনটা টেনে নিয়ে সোফিদের বাড়ির নম্বর টিপল রবিন। অন্যপাশে রিঙ হতে থাকল। ধরল না কেউ।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রবিন।

আগের রাতেই ফোন করেছিল সে। অফিসে জেনসেনের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল। জবাব দিচ্ছে না কেন সোফি? তার বাবাই বা কথা বলতে নারাজ কেন? তিনি কি এখনও ভাবছেন, সোফিকে ফুফুর বাড়িতে পাঠানোর কথা বিশ্বাস করে বসে আছে রবিন?

দেয়ালে লাগানো ঘড়িটার দিকে তাকাল সে। ন'টার বেশি। কি করবে এখন? স্কুলে যাবে? নাকি থানায়? সামনে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো কথা না বলে পারবেন না জেনসেন। ভেবেচিন্তে ঠিক করল, থানায়ই যাবে।

দশ

বেঞ্চে বসে সামনে ঝুঁকে টালিতে ছাওয়া লম্বা হলঘরটার শেষ প্রান্তের দিকে তাকাল রবিন। পাশের ঘরে কম্পিউটারের কী-বোর্ডের শব্দ শোনা যাচ্ছে। চাপা স্বরে কথা বলছে পুলিশ অফিসারেরা।

থানার ওয়েইটিং রুম। শক্ত কাঠের বেঞ্চ। উজ্জ্বল আলো। নড়েচড়ে বসল সে। ভাবছে, কি বলবে সোফির বাবাকে?

অবশেষে দেখা করার অনুমতি মিলল। ডেস্ক সার্জেন্ট তাকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল জেনসেনের অফিসে। ডেস্কে রাখা একগাদা কাগজের দিকে তাঁর মনোযোগ। রবিনের ঢোকার শব্দ শুনে ধীরে ধীরে মুখ তুললেন।

চমকে গেল রবিন। রাতারাতি দশ বছর বেড়ে গেছে যেন জেনসেনের বয়েস। চোখ টকটকে লাল। চারপাশে কালি জমেছে। শার্টটা কুঁচকে গেছে। টাইয়ের নট ঢিলা, একপাশে কাত হয়ে ঝুলছে।

'কি জন্যে এসেছ বুঝতে পারছি, রবিন,' বললেন তিনি। 'সোফির জন্যে উদ্বিগ্ন।...ও তার ফুফুর বাড়ি গেছে বলে তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম আমি, তার কারণ ওর এখন বিশ্রাম দরকার। পূর্ণ বিশ্রাম...'

'কিন্তু আমার ফোন ধরে না কেন?' রবিনের প্রশ্ন। 'কতবার যে ফোন করলাম।'

'ভীষণ মুষড়ে পড়েছে,' বিষণ্ন ভঙ্গিতে জবাব দিলেন জেনসেন। চোখ

বুজে দুই আঙুল দিয়ে নাকের ডগা ডললেন। 'খুব কষ্ট হচ্ছে—আমাদের দুজনেরই।'

দ্বিধা করল রবিন। যে কথাটা বলতে এসেছিল, কোন রকম ভূমিকা না করে বলে ফেলল, 'শেলির বয়ফ্রেন্ডের ব্যাপারে জানতে চাই আমি।'

চোখ মেলে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন জেনসেন। 'ফ্রেড হুফার?'

'হ্যাঁ।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নড়াচড়া একেবারেই করলেন না জেনসেন। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন রবিনের দিকে। তারপর তাঁর ডেস্কের সামনে রাখা একটা কাঠের চেয়ার দেখালেন। 'বসো। ঘটনাটা কি, খুলে বলো আমাকে। ফ্রেডের কথা কেন জানতে চাও?'

জেনসেনের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে করে চেয়ারে বসল রবিন। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল।

'রবিন, তোমার চেহারা অমন হয়ে যাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ লাগছে?' নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন জেনসেন। 'কোক-টোক কিছু খাবে?'

মাথা নাড়ল রবিন। একটা সেকেন্ড তাকিয়ে রইল নিজের কোলে ফেলে রাখা দুই হাতের তালুর দিকে। মুখ তুলল আবার। 'শেলির বয়ফ্রেন্ডের কথা বলতে কোন অসুবিধে আছে?'

'ফ্রেড হুফার,' মৃদুকণ্ঠে শুরু করলেন জেনসেন, 'সম্ভবত এখন মৃত। ওকে খুঁজে পাইনি আমরা। দুই বছর ধরে খুঁজছি।' মাথা নাড়তে নাড়তে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। 'ওর লাশও হয়তো পাওয়া যাবে একদিন ব্ল্যাক ফরেস্টের বনেই। শেলির মত।' শেষ দিকে স্বরটা কেমন ভেঙে গেল তাঁর।

চুপ করে তাকিয়ে আছে রবিন। বলে দেবে নাকি টম গ্যারিবাল্ডির কথা? না, থাক। পরে। আগে শোনা যাক সব।

'জ্যান্ত অবস্থায় সবার শেষে শেলিকে দেখেছে একমাত্র ফ্রেডই,' জেনসেন বললেন। 'শেলিকে যে খুন করেছে, হয়তো সেই একই লোক খুন করেছে ফ্রেডকেও।'

পেটের মধ্যে উথালপাতাল শুরু হয়ে গেল রবিনের। হঠাৎ করে অসুস্থ বোধ করতে লাগল। 'টম গ্যারিবাল্ডি নামে কোন লোককে কি চিনত শেলি?' এত নিচু স্বরে প্রশ্নটা করল সে, জেনসেন বুঝতে পারলেন না। কাজেই দ্বিতীয়বার বলতে হলো কথাটা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে চিবুক ডললেন জেনসেন। 'টম? ব্ল্যাক ফরেস্টের লোক?'

মাথা নাড়ল রবিন। 'বেকারভিলের।'

'না,' কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দিলেন জেনসেন, 'ওরকম কারও নাম মনে করতে পারছি না। কেন?'

টমকে সন্দেহ করে—কথাটা বলতে গিয়েও বলল না রবিন। বললেই হয়তো তাকে ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবে পুলিশ। রবিনের বোকামির জন্যে অকারণ হেনস্তা হতে হবে টমকে। পুলিশকে কিছু জানানোর আগে ওর

ব্যাপারে আরও খোঁজ-খবর নেয়া দরকার।

'না, এমনি,' উঠে দাঁড়াল রবিন। 'আপনার সময় নষ্ট করলাম। আমি এসেছিলাম...'

'কেন এসেছিলে?'

'টেলিভিশনে আপনার সাক্ষাৎকারটা দেখলাম,' বলল রবিন। 'ফ্রেড হুফারের নাম শুনলাম। ভাবলাম, তার কোন ছবিটবি থাকলে দেখে যাব। বলা যায় না, চিনেও ফেলতে পারি। তাহলে সাহায্য করতে পারব পুলিশকে...'

'হুঁ!' মাথা দোলালেন জেনসেন। 'আছে একটা।' ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বের করলেন। সেটা খুলে ছোট একটা ছবি তুলে নিয়ে ঠেলে দিলেন টেবিলের ওপর দিয়ে। 'ভাল ওঠেনি। শেলি গায়েব হয়ে যাবার পর তার জিনিসপত্র ঘেঁটে পেয়েছি এটা। এটার কপি করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম থানায় থানায়। লাভ হয়নি।'

ছবিটা তুলে নিল রবিন। হাত কাঁপছে। দেখার জন্যে চোখের সামনে নিয়ে এল। একটা মোটর সাইকেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে। আর একজন যুবক। যুবকের হাত মেয়েটার কাঁধে রাখা।

শেলিকে চিনতে পারল রবিন। যুবকের চেহারাটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

কুচকুচে কালো চুল পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে বেঁধেছে মেয়েদের মত করে। পরনে টাইট জিনস, গায়ে কালো চামড়ার জ্যাকেট, পায়ে কাউবয় বুট। হাসিটা মিষ্টি।

আর চোখ দুটো...

রবিনের হৃৎপিণ্ডটাকে খামচে ধরল যেন শীতল আঙুল।

মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেল মুহূর্তে।

টম গ্যারিবাল্ডির চোখের সঙ্গে অনেক মিল!

তার অনুমান ঠিক। টম গ্যারিবাল্ডিই ফ্রেড হুফার!

এগারো

ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। চোখ সরাতে পারছে না। শেলির কাঁধে হাত রেখে তার দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে টম।

অস্পষ্ট হয়ে যেতে শুরু করল ছবিটা। মুখ তুলে তাকাল রবিন। অফিসের দেয়ালটাও অস্পষ্ট। মুছে যাচ্ছে সব কিছু। তার জায়গায় সৃষ্টি হচ্ছে ঘন, সাদা কুয়াশার পর্দা।

সামনে বসে কথা বলছেন লেফটেন্যান্ট। কিন্তু তার মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে কানে আসছে কথাগুলো। কুয়াশার চাদরের ওপার থেকে। বুঝতেও পারছে না শব্দগুলো।

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল রবিন। হাত থেকে পড়ে গেল ছবিটা। নিচে তাকাল। চোখের সামনে মুছে গেল যেন কার্পেটটা। তার জায়গায় পাতা দেখতে পেল। ছড়িয়ে রয়েছে বাদামী মরা পাতা।

কি ঘটছে!

চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা গাঢ় বাদামী রঙের গাছ। পুরানো হতে হতে কালচে হয়ে গেছে গাছটা। ঘন হয়ে পাতা জমে আছে গোড়ায়। মরা পাতার গন্ধ লাগছে নাকে। শিকড়ের কাছে কালো একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে।

নিচে নেমে যাচ্ছে দৃষ্টি। নিচে। আরও নিচে।

জিনিসটা কি? গর্তের গভীরে চাপা দেয়া। মাটি আর পাতায় ঢেকে রয়েছে।

আরও এগিয়ে গেল রবিনের দৃষ্টি। কাছে। আরও কাছে। যতক্ষণ না স্পষ্ট হলো জিনিসটা।

রূপালী-বাঁটওয়ালা একটা ছুরি! লাইব্রেরিতে কল্পনায় যেটা দেখেছিল।

ছুরিটা ধরার জন্যে হাত বাড়াল সে। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওটা। হাতে ঠেকল শুধু বাতাস।

কুয়াশার ভেতর দিয়ে কানে আসছে জেনসেনের কথা, এখনও বহুদূরে, 'ছুরি মেরে মারা হয়েছে শেলিকে।'

গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল রবিনের দৃষ্টি। কুয়াশার মধ্যে।

'কে খুন করল আমার বাচ্চা মেয়েটাকে!' কুয়াশার চাদর চিরে দিল যেন জেনসেনের ছুরির মত ধারাল তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।

চোখ মিটমিট করল রবিন। তুলে নিল মেঝেতে পড়ে যাওয়া ছবিটা। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'মনে হয় আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন জেনসেন। চোখের পাতা সরু হয়ে এল। 'মানে? তুমি কিছু জানো মনে হচ্ছে?' ঘুরে এসে দাঁড়ালেন রবিনের মুখোমুখি। 'বলো!'

তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। কল্পনার জগৎ থেকে পুরোপুরি ফেরত আসতে পারেনি এখনও। কুয়াশার মধ্যে ভাসছে। তবে পাতলা হয়ে আসছে কুয়াশা।

কাঁধ ঝাঁকালেন জেনসেন। 'বলো, রবিন, কি জানো তুমি? কে আমার মেয়েকে খুন করেছে? কোন সে দানব?'

'কে করেছে, জানি না। তবে যে অস্ত্র দিয়ে খুনটা করেছে, সেটা কোথায় আছে দেখেছি।'

'কি করে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন জেনসেন।

'বললে বিশ্বাস করবেন না,' ধীরে ধীরে বলল রবিন। মুখ তুলে তাকাল জেনসেনের চোখের দিকে। সত্যি কথাটাই বলল, 'একটা অদ্ভুত ক্ষমতা তৈরি হয়েছে আমার মধ্যে। চেষ্টা করলে এমন সব দৃশ্য দেখতে পাই আমি, যেটা হয়তো বাস্তবে আছে, কিংবা ঘটেছে।'

'দৈব-দর্শন! স্বপ্ন?'

'অনেকটা ওরকমই। কিন্তু স্বপ্নটা আমি জেগে জেগে দেখি। স্পষ্ট দেখি ছবিগুলো। চোখের সামনে দেখতে থাকি...

থেমে গেল সে। ব্যাখ্যা করে বোঝানো কঠিন।

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন জেনসেন। চোখের পাতা ফেলছেন না। 'কি দেখো? আমার মেয়েকে দেখেছ?'

'দেখেছি, আপনাদের বাড়িতে। তবে তার কঙ্কাল। জানালা দিয়ে মাথা বের করে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। দেখা দিয়েই সরে গেল।' অদ্ভুত স্বরে কথা বলতে শুরু করল রবিন, যেন সে বলছে না, তাকে দিয়ে কেউ বলাচ্ছে। 'হয়তো অদৃশ্য থেকে শেলিই নানা রকম মেসেজ পাঠাচ্ছে আমার মগজে। আমার অদ্ভুত ক্ষমতাটাকে ব্যবহার করে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তার কবরের কাছে। নইলে এতদিন পর তার কবর আবিষ্কার হলো কি করে? আর হলোই যদি, আমাকে দিয়ে কেন? ব্যাখ্যার বাইরে কত কিছুই তো ঘটে পৃথিবীতে, ঘটে না? হয়তো এতদিন অপেক্ষা করার পর কাউকে দিয়ে তার লাশটা আবিষ্কার করানোর সুযোগ পেয়েছিল...' থেমে গেল রবিন। ফিরে এল যেন বাস্তবে।

বেদনার ছাপ ফুটল জেনসেনের মুখে। ক্ষণিকের জন্যে ভুলে গেলেন যেন তাঁর সামনে বসে রয়েছে রবিন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কল্পনাতেই কি দেখতে পেয়েছ অস্ত্রটা?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'কল্পনা না, সচল ছবি। এইমাত্র দেখলাম। ছবিটা দেখে...' থেমে গেল সে। টমের নাম বলার সময় আসেনি এখনও। সামলে নিয়ে বলল, 'ফ্রেড হুফারের ছবির দিকে তাকাতেই শুরু হলো কল্পনা। ছুরিটা দেখতে পেয়েছি একটা গর্তের মধ্যে।'

রবিনের হাত চেপে ধরলেন জেনসেন। 'ছুরি? কি ধরনের ছুরি? নিয়ে যেতে পারবে আমাকে ওখানে?'

আঙুলগুলো চেপে বসল রবিনের হাতে। ব্যথা লাগল। হাতটা সরিয়ে নিল সে। 'মনে হয় পারব। থাকলে বনের মধ্যেই আছে ওটা। শেলির কবরের কাছে।'

ডেস্কের ওপাশে তাঁর চেয়ারের পেছনে ঝোলানো কোটটা তুলে নিয়ে গায়ে চাপালেন জেনসেন। লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে গিয়ে খুলে দিলেন দরজা। রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন অফিস থেকে। ডেস্ক সার্জেন্টের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, 'বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি আমি। কবরের কাছে যাচ্ছি। কোন দরকার পড়লে রেডিওতে যোগাযোগ কোরো।'

বারো

কবরের কাছে যখন পৌঁছল ওরা, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বেগুনী আকাশের গা থেকে

যেন ভেসে আসছে গোলাপী আলোর ছটা বাতাস উষ্ণ। গুমোট।

পুলিশের গাড়ি থেকে নামল রবিন। পা দুটোকে মনে হচ্ছে রবারের তৈরি কত দ্রুত কেটে গেছে দিনটা, ভেবে অবাক লাগছে তার। সকালে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠাতেই এমন হয়েছে।

গোরস্থানের পাশের পথটা ধরে এগিয়ে চলল দুজনে। রাস্তার দুই পাশের ঘাস আর ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ভর্তা করেছে সে-রাতে পুলিশ আর কৌতূহলী জনতা মিলে। শেলির কবরটার কাছে পৌঁছল ওরা। নতুন খোঁড়া লম্বা গর্তের পাশে আলগা মাটির স্তূপ।

গর্তটার দিকে তাকাল রবিন। মোচড় দিয়ে উঠল পেটের মধ্যে।

'ভাবো, রবিন,' জেনসেন বললেন। 'ভেবে, কিংবা অন্য যে কোন উপায়ে, যে ভাবে তুমি পারো, খুঁজে বের করো অস্ত্রটা। শেলির খুনীকে ধরার এই একমাত্র সুযোগটা কোনমতেই হাতছাড়া করা উচিত হবে না আমাদের।'

'ঠিক আছে,' বড় করে দম নিল রবিন।

ইচ্ছে করে কি ভাবে স্বপ্নটা আনা যায়, জানা নেই তার। এক জিপসি ওঝাকে একবার যা করতে দেখেছিল, সেটাই করল–কবরটার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে ফাঁকা করে দিল মনটাকে। আকাশের গোলাপী রঙ বদলে বেগুনী হয়ে এল। ঘনিয়ে আসতে থাকল অন্ধকার। বাতাসও ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

থানায় বসে যে ছবিটা দেখেছে, তাতে যা যা দেখেছে মনে করার চেষ্টা করল সে। বড়, পুরানো একটা গাছ। জট পাকানো, গাঁটওয়ালা শিকড়।

মুখ তুলে তাকাল সে। পাইনগুচ্ছটার কিনারে অনেক বড় একটা ওক গাছ। বিশাল স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে মাথা তুলে। কাণ্ডটা দেখল সে ভালমত। শিকড়গুলোর দিকে তাকাল। কল্পনায় দেখা শিকড়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

'ওই গাছটাই,' ফিসফিস করে বলল রবিন, জোরে বলতে যেন ভয় পাচ্ছে। এগিয়ে গেল গাছটার দিকে।

পেছন পেছন চললেন জেনসেন।

গাছটার গোড়ায় গিয়ে বসল রবিন। হাত দিয়ে পাতা সরাল প্রথমে। তারপর মাটি সরাতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্তের মুখটা চোখে পড়ল তার। সরু মুখ, হাতটা ঢোকানো যায় কোনমতে।

ঘাড় ঘুরিয়ে জেনসেনের দিকে তাকাল সে।

তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন লেফটেন্যান্ট। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন গর্তটার দিকে।

'আমার বিশ্বাস এর ভেতরেই পাওয়া যাবে জিনিসটা,' বলল রবিন।

'হুঁ!' শক্ত হয়ে গেছে তাঁর মুখের পেশি। 'আমার হাত তোমার চেয়ে মোটা। মনে হয় ঢুকবে না। তুমি বের করে আনতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'মূল্যবান সূত্র এটা,' বললেন তিনি। 'হাতে গ্লাভস পরে নাও।' পকেট থেকে একজোড়া পাতলা রবারের দস্তানা টেনে বের করলেন তিনি। রবিনের

হাতে দিয়ে বললেন, 'জিনিসটা পাওয়া গেলে এভিডেন্স ব্যাগের মধ্যে রাখতে হবে। হাতের ছাপ থেকে থাকলে কোনমতেই নষ্ট হতে দেয়া চলবে না।'

দস্তানা দুটো পরে নিল রবিন। পাশে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছেন জেনসেন।

ডান হাতটা গর্তে ঢুকিয়ে দিল রবিন। ভেতরে পাতা পড়েছে প্রচুর। মাটিও জমে আছে। কব্জি মোচড় দিয়ে দিয়ে সেগুলো ফাঁক করে যতটা সম্ভব গভীরে ঢোকাতে লাগল হাতটা।

ঢোকাচ্ছে...ঢোকাচ্ছে...

আঙুলে শক্ত কিছুর স্পর্শ লাগল। লম্বা কোন জিনিস।

দম বন্ধ করে ফেলল সে।

শক্ত করে চেপে ধরল জিনিসটা। সাবধানে বের করে আনতে শুরু করল। ধীরে ধীরে।

বাইরে নিয়ে এল।

একটা ছুরি।

মরচে আর মাটিতে মাখামাখি।

তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে ফলাটা চেপে ধরে, তুলে ধরল জেনসেনের দিকে।

বড় বড় চোখ করে ছুরিটার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন জেনসেন। বেরিয়ে এল বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস। 'চিনেছি,' কাঁপা কাঁপা স্বরে কথা বললেন তিনি। 'চিনতে পেরেছি। এটা হুফারের। তার হাতে দেখেছি।'

হাত থেকে ছুরিটা আরেকটু হলেই ফেলে দিচ্ছিল রবিন।

চোখ সরিয়ে নিলেন জেনসেন। আবেগজড়িত স্বরে বললেন, 'আমার ধারণা, ফ্রেড মারা গেছে। শেলিকে খুন করেছে ও, এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার। কিন্তু এই যে, চোখের সামনে জলজ্যান্ত প্রমাণ, তার ছুরি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইলেন জেনসেন। তারপর পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের এভিডেন্স ব্যাগ টেনে বের করলেন।

ওটার মধ্যে ছুরিটা ছেড়ে দিল রবিন।

'কেন শেলিকে খুন করল ও, বুঝতে পারছি না আমি,' বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই বললেন জেনসেন। 'আমি তো ভেবেছিলাম সে-ও খুন হয়েছে। কিন্তু ও-ই যে খুনী, বিশ্বাস করতাম না।'

গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসল রবিন। এতক্ষণে ফাঁস করতে লাগল টমের কথা। 'ওর খবর জানি আমি।'

'জানো!' তির্যকদৃষ্টিতে তাকালেন জেনসেন। 'কি করে জানলে? আরেকটা স্বপ্ন?'

'না,' মাথা নাড়ল রবিন। সত্যটা জেনে গেছে। এখন এর ইতি ঘটানো দরকার। 'লাইব্রেরিতে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। নাম বলেছে টম গ্যারিবাল্ডি। এখন বুঝতে পারছি, আমার পেছনে কেন লেগে আছে, যেচে এসে পরিচিত হওয়ার কারণ—শেলির খুনের ব্যাপারে পুলিশ কি করছে জানার

জন্যে। ও জেনে গিয়েছিল, সোফি আমার বন্ধু। তা ছাড়া লাশটা আমি খুঁজে পেয়েছি বলে পুলিশও যোগাযোগ রাখবে আমার সঙ্গে। ভেতরের কথা জানতে পারব।'

ভারী দম নিলেন জেনসেন। এত সামান্য আলোতেও তাঁর ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়াটা দৃষ্টি এড়াল না রবিনের। 'টম গ্যারিবাল্ডি, না? ওর বাসায় নিয়ে যেতে পারবে আমাকে?'

'বাসা কোথায় তা তো জানি না,' জবাব দিল রবিন। 'আমাকে বলেছে বেকারভিলে ওর দাদা-দাদীর সঙ্গে থাকে। মিথ্যে কথাও হতে পারে।'

মাথা ঝাঁকালেন জেনসেন। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, রবিন। তুমি দুদিনেই যা করে ফেললে, দুই বছর ধরে চেষ্টা করেও এতটা এগোতে পারিনি আমরা।' রবিনের হাত ধরে মৃদু ঝাঁকি দিলেন তিনি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। ব্যাগটা নিয়ে রওনা হলেন বন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। ক্লান্ত পায়ে পেছন পেছন চলল রবিন।

গাড়ির কাছে পৌঁছে রেডিওতে থানার সঙ্গে কথা বললেন জেনসেন। কি বললেন তিনি, শোনার ধৈর্যও আর নেই রবিনের। সে বাড়ি ফিরে যেতে চায়। সারাটা দিন উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। কেসটা নিয়ে এ মুহূর্তে আর মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করছে না।

তাকে গাড়িতে উঠতে বললেন জেনসেন।

মাথা নাড়ল রবিন। 'আমি হেঁটেই যেতে পারব। না হাঁটলে মাথার ঘোরটা কাটবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'টম কিন্তু বিপজ্জনক লোক,' সাবধান করলেন জেনসেন।

'আমার জন্যে নয়,' জবাব দিল রবিন। 'ও জানেই না আমি কি করেছি। সন্দেহও করতে পারবে না।'

'আবার যদি দেখা হয় বা ফোন করে, ওর ঠিকানা জোগাড়ের চেষ্টা করবে,' জেনসেন বললেন। 'সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে জানাবে আমাকে। বুঝলে?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। জেনসেনকে 'গুড নাইট' জানিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

গোস্ট লেনের কাছে পৌঁছতে বনের মধ্যে খসখস শব্দ কানে এল। দাঁড়িয়ে গেল রবিন। 'কে! কে ওখানে?' টের পেল হাতের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে।

'রবিন!' একটা গাছের আড়াল থেকে ডাক শোনা গেল।

চমকে গেল রবিন। ছোট্ট একটা চিৎকার আপনাআপনি বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

আড়াল থেকে বেরোল সোফি। এগিয়ে এল। কালো চুলে মাটি-কুটো লেগে আছে। পরনে একটা ছেঁড়া গাউন। খালি পা।

'সোফি? তুমি এখানে কি করছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন

রবিনের সামনে এসে দাঁড়াল সোফি। 'বাবাকে খুঁজছি। কোথায় গেছে?'

'কেন?' অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রবিন। 'এই ঠাণ্ডার মধ্যে কাপড় পর্যন্ত পরোনি...'

'থানায় ফোন করেছিলাম,' বাধা দিয়ে বলল সোফি। 'ডেস্ক সার্জেন্ট জানাল, কেসটার নাকি সমাধান করে ফেলেছে বাবা।' সোফির চোখে বন্য দৃষ্টি। 'তুমি তাকে সাহায্য করছ, তাই না? তোমরা তো আবার নামকরা গোয়েন্দা—শেলির মৃত্যুরহস্য ভেদ করে ফেলেছ নাকি?'

সোফির কাঁধে হাত রেখে তাকে ভরসা দেয়ার চেষ্টা করল রবিন। 'ভেদ এখনও পুরোপুরি করতে পারিনি। তবে খুব দ্রুত এগোচ্ছে তদন্ত।'

'মানে?'

দ্বিধা করতে লাগল রবিন। কতটা জানানো ঠিক হবে বুঝতে পারছে না। 'শেলির বয়ফ্রেন্ডের খোঁজ পাওয়া গেছে। তোমার বাবার ধারণা, ও-ই তোমার বোনকে খুন করেছে।'

'কি বললে?' চমকে গেল সোফি। টলে উঠল। সেদিন রাতের মত বেহুঁশ হয়ে যাবে যেন।

তাকে ধরে ফেলল রবিন। 'সোফি, কি হয়েছে তোমার? পুলিশ খুনীকে ধরতে যাচ্ছে, এটা তো সুসংবাদ। তোমার খুশি হওয়ার কথা!'

'না! না!' গুঙিয়ে উঠল সোফি। জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল।

এমন করছে কেন! ঘটনাটা?

'সোফি?' ওর দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল রবিন। 'কি হলো তোমার?'

'না!' পাগলের মত চিৎকার করে উঠে ঝাড়া দিয়ে রবিনের হাত ছাড়িয়ে নিল সোফি। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে ছুটতে শুরু করল।

'সোফি! সোফি!' বলে চিৎকার করে উঠল রবিন।

তাকাল না সোফি। রাস্তার মাঝখান ধরে ছুটে চলেছে। পাকা রাস্তায় তার খালি পায়ের থপ্‌থপ্‌ শব্দ হচ্ছে। গাউনের নিচের দিকটা বাড়ি খাচ্ছে পায়ের সঙ্গে।

এ কি কাণ্ড! সোফি কি চায় না তার বোনের মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটিত হোক? ধরা পড়ুক খুনী? এ তো দেখা যাচ্ছে আরেক রহস্য!

নাকি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছে বলে এ রকম উল্টোপাল্টা কাণ্ড করছে? ঠিক মানতে পারছে না রবিন।

চিন্তিত ভঙ্গিতে আবার বাড়ির দিকে পা বাড়াল সে। একটা মোড় পেরোনোর সময় তীব্র গতিতে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল জেনসেনের গাড়ি। তাকে তিনি দেখলেন বলেও মনে হলো না। গতি কমালেন না সামান্যতম।

পাশ দিয়ে গাড়িটা চলে যাওয়ার সময় পলকের জন্যে জেনসেনের মূর্তিটা দৃষ্টিগোচর হলো রবিনের। শক্ত হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছেন, দুই হাতে স্টিয়ারিং ধরা, নজর সামনের দিকে।

রবিনের মনে হলো অনন্তকাল ধরে হেঁটেই চলেছে। বাড়ি আর আসে না।

কিন্তু এল অবশেষে। সামনের দরজাটা ঠেলে খুলতেই ছুটে এল রাফি। ঘেউ ঘেউ করে স্বাগত জানাল। এপাশ ওপাশ লেজ নাড়ছে প্রবল ভাবে।

ঘরে আজও কেউ আছে। নিশ্চয় মুসা গলা চড়িয়ে ডাকল, 'মুসা? তুমি এসেছ?'

জবাব এল না।

অন্ধকার লিভিং রুমে ঢুকল সে। জানালা দিয়ে এসে পড়া অস্পষ্ট আলোয় দেখল আর্মচেয়ারে বসে আছে কেউ।

'মুসা, আলো জ্বালোনি কেন?' আর্মচেয়ারটার দিকে এগোল রবিন।

লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল ছায়ামূর্তিটা।

মুসা নয়। চিনতে পারল অন্ধকারেও।

'টম!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

তেরো

পাথর হয়ে গেছে যেন রবিন। এখানে টমকে দেখতে পাবে কল্পনাই করেনি। আরও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার, রাফি কিছু করছে না ওকে। ঢুকতেও নিশ্চয় বাধা দেয়নি।

'বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে,' টম বলল।

সংবিৎ ফিরল যেন রবিনের। টম খুনী। তার কাছে ছুরি-পিস্তল থাকতে পারে।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে শুরু করল রবিন। দরজার কাছে পৌঁছতে পারলেই একদৌড়ে বেরিয়ে যাবে।

লাফ দিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল টম।

দরজা খোলার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল রবিন। পারল না। ধাক্কা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গিয়ে দরজার ওপর। চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। তার মুখ চেপে ধরল টম। চিৎকারটা রুদ্ধ হয়ে গেল মাঝপথে।

রবিনকে দরজার গায়ে ঠেসে ধরল টম। চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'পালাতে চাও কেন? আমি তো কিছু করছি না!'

গরম নিঃশ্বাস লাগছে রবিনের মুখে।

হাতটা সরিয়ে নিল টম।

হাঁ করে নাক-মুখ দিয়ে বাতাস টানতে লাগল রবিন। 'আপনি আমাকে আটকাতে চাইছেন কেন?' চিৎকার করে উঠল সে।

ভ্রূকুটি করল টম। চোখে অন্ধকার সয়ে আসাতে তার চেহারা এখন অনেক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রবিন। জ্বলজ্বলে চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে টম। 'গাছের গোড়া থেকে যে ছুরিটা বের করে দিলে, ওটা দিয়েই খুন করা হয়েছে শেলিকে? জেনসেন কি বললেন?'

অবাক হয়ে গেল রবিন। টম জানল কি করে ছুরিটা বের করার কথা! 'আপনি জানলেন কি করে? তারমানে আপনি পিছু নিয়েছিলেন আমাদের। বনের

মধ্যে লুকিয়ে থেকে দেখেছেন বের করতে।'

দরজার ছিটকানি লাগিয়ে দিল টম।

ফাঁদে পড়ে গেছে, বুঝতে পারছে রবিন। ভয় পাচ্ছে এখন একবার যে খুন করেছে, দ্বিতীয়বার করতে কোন দ্বিধা থাকবে না তার।

'আপনিই ওকে খুন করেছেন, তাই না?' গলা দিয়ে কোলাব্যাঙের স্বর বেরোল রবিনের। 'তারপর ছুরিটা লুকিয়ে ফেলেছিলেন গাছের গোড়ায়।'

'তোমার তাই মনে হচ্ছে?'

'শুধু আমার না, জেনসেনেরও তা-ই ধারণা। ছুরিটা চিনতে পেরেছেন তিনি। আপনার হাতে নাকি দেখেছিলেন।'

'কারও হাতে ছুরি দেখে থাকলে সেটাই খুনের অস্ত্র, এমন ভাবার কোন কারণ নেই। এর গভীরে আরও ব্যাপার থাকতে পারে,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল টম।

ওর কথার ফাঁদে আটকা পড়তে চাইল না রবিন। পালানো দরকার। শেলিকে খুন করেছে। পুলিশকে সাহায্য করছে বলে তাকেও করতে পারে। বেরোনো দরকার। তারপর কোনখান থেকে একটা ফোন করবে জেনসেনকে।

আচমকা দুই হাতে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল টমের বুকে। প্রস্তুত ছিল না টম। উল্টে গিয়ে পড়ল কফি টেবিলটার ওপর।

তীরবেগে তার পাশ দিয়ে পেছনের দরজাটার দিকে ছুটে গেল রবিন। কিন্তু ডাইনিং রূমে ঢোকার আগেই তার কাছে পৌঁছে গেল টম। পেছন থেকে হাত চেপে ধরল।

কিছু বলতে যাচ্ছিল টম, থেমে গেল রাফির ঘেউ ঘেউ শুনে।

জোরে জোরে কিল পড়ল দরজায়। 'পুলিশ! দরজা খোলো!'

চিৎকার করে জবাব দিল রবিন, 'আমি এখানে!'

মুক্ত হাতটা ব্যবহার করল সে। কনুই তুলে গুঁতো মারল টমের গলায়।

আর্ত-গোঙানি বেরিয়ে এল টমের মুখ থেকে। রবিনকে ছেড়ে দিল। ঝটকা দিয়ে দুই হাত উঠে গেল গলার কাছে।

সুযোগটা কাজে লাগাতে এক মুহূর্ত দেরি করল না রবিন। দরজার ওপর এসে পড়ল। মরিয়া হয়ে হাতড়ানো শুরু করল তার আঙুলগুলো। তালা খোলার চেষ্টা করছে।

তার পেছনে গলা চেপে ধরে গোঙাচ্ছে টম। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। নিঃশ্বাসের সঙ্গে খসখস আওয়াজ বেরোচ্ছে নাক দিয়ে।

একটানে পাল্লাটা খুলে ফেলল রবিন। টলতে টলতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল পেছনের আঙিনায়।

পড়ে যাচ্ছিল। ধরে ফেললেন তাকে জেনসেন।

'কোথায় ও?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'ফ্রেড হুফার কোনখানে?'

'ভেতরে,' ঘরের দিকে দেখাল রবিন। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে।

দরজায় এসে দাঁড়াল ফ্রেড। গলায় হাত। 'রবিন…'

জেনসেনের ওপর চোখ পড়তেই থেমে গেল সে। দৌড় দিল না। পালানোর চেষ্টা করল না নড়লও না। বোধহয় বুঝতে পেরেছে, দৌড় দিয়ে লাভ নেই।

একটানে খাপ থেকে পিস্তল খুলে নিলেন জেনসেন। 'বহুদিন অপেক্ষা করেছি এ সময়টার জন্যে,' কাঁপা কণ্ঠে বললেন তিনি। 'নড়বে না, ফ্রেড। গুলি খেয়ে মরবে।'

'আপনি...কি করে জানলেন, ও এখানে আছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

পাশের বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করলেন জেনসেন। 'তোমার পড়শী চিৎকার শুনতে পেয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে এ বাড়িতে মারামারি চলছে। থানায় ফোন করেছেন। যখন জানলাম, তোমাদের বাড়ির কথা বলছেন, বুঝে গেলাম কি হয়েছে।'

ফ্রেডের দিকে পিস্তল স্থির করে রেখে রবিনের দিকে তাকালেন তিনি। 'একটা কাজের কাজই করলে তুমি, রবিন। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তুমি ঠিক আছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'চলো, ফ্রেড,' শীতল কণ্ঠে বললেন জেনসেন। 'ভেবেছিলাম, তোমাকে ধরতে পারলে শান্তি আসবে আমার মনে। কিন্তু আসছে না। বরং আরও বেশি খারাপ লাগছে। অসুস্থ বোধ করছি আমি।'

সিঁড়ি বেয়ে নীরবে নেমে এল ফ্রেড। তার কলার চেপে ধরলেন জেনসেন। ঠেলে নিয়ে চললেন ড্রাইভওয়েের দিকে। বাধা দিল না ফ্রেড। বাড়ির কোণ ঘোরার সময় কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল সে। কোন কথা বলল না। চোখ দুটো কেবল স্থির হয়ে রইল রবিনের ওপর।

ফ্রেডকে নিয়ে চলে গেলেন জেনসেন। তাঁর গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যেতে, ওখানে, সিঁড়ির ওপরই বসে পড়ল রবিন। প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছে এখন। ঘরে যেতেও ইচ্ছে করছে না। সমস্ত উত্তেজনার সমাপ্তি।

পেছন থেকে তার গাল চেটে দিতে লাগল রাফি। রবিনের ঘাড়ে লাগছে তপ্ত নিঃশ্বাস।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল আবার কুকুরটা। রবিনের মনে হলো, কানের পর্দা ফেটে যাবে। চমকে গেল সে। আবার কে এল!

ততক্ষণে চত্বরে নেমে দৌড় দিয়েছে রাফি।

কে এসেছে, দেখতে যেতেও ইচ্ছে করল না রবিনের। যে আসে আসুক। রাফি যখন গেছে, নিয়ে আসবে এখানেই।

খানিক পরেই বাড়ির কোণ ঘুরে হেঁটে আসতে দেখা গেল মুসাকে।

খুশি হলো রবিন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সময়মত এসেছে।

চোদ্দ

মুসার সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত দশটা বেজে গেল। ঘুমাতে যাওয়ার আগে গরম পানি দিয়ে ভালমত গোসল করে নেয়ার জন্যে বাথরুমে রওনা হলো রবিন। কানে এল নিচতলায় ফোনের শব্দ। মুসা ধরল। কানে এল তার কণ্ঠ, 'হালো!'

কান খাড়া করে বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে রইল রবিন। হয়তো সোফি করেছে।

'রবিন?' সিঁড়ির গোড়া থেকে ডাকল মুসা। মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করে দিল রবিন।

'লেফটেন্যান্ট জেনসেন,' মুসা বলল। চোখে-মুখে উত্তেজনা। 'তোমাকে নিয়ে এক্ষুণি থানায় যেতে বলেছেন। সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে!'

'সাংঘাতিক!' ভুরু কুঁচকে গেল রবিনের।

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'জেনসেন বললেন, ফ্রেড হুফার নাকি পালিয়েছে। সাবধান থাকতে বলেছে তোমাকে। তাঁর সন্দেহ, সুযোগ পেলেই হুফার তোমাকে খুন করবে।'

'কি বলছ!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'তিনি বললেন এ কথা? কি করে পালাল হুফার?'

সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল সে।

'ফ্রেডকে আদালতে নিয়ে গিয়েছিলেন জেনসেন, তার নাম বুক করানোর জন্যে,' মুসা জানাল। 'তারপর নিয়ে যাচ্ছিলেন জেলে। কি ভাবে যেন হাতকড়া খুলে ফেলল ফ্রেড। তাকে নামানোর জন্যে জেনসেন যেই গাড়ির দরজা খুলেছেন, অমনি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দৌড় মারল ফ্রেড। তাকে থামতে বলেছেন জেনসেন। দু'বার গুলিও চালিয়েছেন। কিন্তু থামেনি ফ্রেড। বোধহয় গুলি লাগেনি। পালিয়েছে।'

পা দুটো অবশ হয়ে এল রবিনের। শক্তি পাচ্ছে না। বসে পড়ল একটা সোফায়।

'খারাপ লাগছে?' তার পাশে বসল মুসা। 'আমি অবশ্য জেনসেনকে বলেছি, তুমি খুব ক্লান্ত। এখন থানায় যাওয়ার মত অবস্থা নেই। গোসল করেই শুয়ে পড়বে।'

'কিন্তু আমাকে যেতেই হবে,' শুকনো গলায় বলল রবিন। 'যে করেই হোক, ফ্রেডকে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে কখন এসে হাজির হয় এখানে...'

'আসে আসুক!' হাত নেড়ে উড়িয়ে দিল যেন মুসা। 'কি করবে এসে? দুজনকে খুন করবে? পারলে করুক।'

'পিস্তল নিয়ে এসে জানালা দিয়ে যদি গুলি মেরে দেয়, কি করবে? সব সময় তো আর সাবধান থাকা যায় না। ওকে জেলে না ভরা পর্যন্ত নিরাপদ নই আমরা।'

রবিনের কথা ভেবে দেখল মুসা। মাথা ঝাঁকাল। 'হুঁ, ঠিকই বলেছ। চলো, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।' হাত বাড়াল সে, 'দেখি গ্যারেজের চাবিটা দাও।'

ব্ল্যাক ফরেস্ট থানায় কিছুটা লজ্জিত ভঙ্গিতেই স্বাগত জানালেন জেনসেন, 'এ সময় তোমাকে ডেকে আনার জন্যে আমি দুঃখিত, রবিন।' মুসাকে ওয়েইটিং রূমে অপেক্ষা করতে বলে রবিনকে নিয়ে এসে ঢুকলেন তাঁর ছোট্ট অফিস ঘরে। বিধ্বস্ত চেহারা, টকটকে লাল চোখ। 'কল্পনাই করিনি এ ঘটনা ঘটবে। নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে আমার।'

জবাব খুঁজে পেল না রবিন। কি বলবে? জেনসেনের ডেস্কের সামনে চেয়ারে বসে ভাবতে লাগল সে। কিন্তু খোলসা হচ্ছে না ভাবনাগুলো। মাথার মধ্যে সব কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ঘুমানো দরকার, বুঝতে পারল সে।

'ফ্রেড আমাকে শিক্ষা দিয়ে ছেড়েছে,' তিক্তকণ্ঠে বললেন লেফটেন্যান্ট। আস্তে করে চেয়ারে নামিয়ে দিলেন শরীরটা। চাপা একটা গোঙানির মত শব্দ বেরোল গলা দিয়ে। 'ও যে এতটা চালাক, কল্পনা করিনি। তাই সতর্ক ছিলাম না ততটা।'

'আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি?' চেয়ারে অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে বসল রবিন।

টেবিলে কনুই রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন জেনসেন। 'ভাবলাম, ওর ব্যাপারে কিছু মনে করতে পারবে তুমি। কোন ধরনের তথ্য। পালিয়ে ও কোনদিকে যেতে পারে, কোন ধারণা।'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল রবিন, 'কোথায় যাবে কোন ধারণাই নেই আমার। ও আসে-যায়, আমার সঙ্গে দেখা করে, কখন কোথায় থাকে কিছু জানি না; বলেও না, বুঝতেও পারি না।'

ক্লান্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন জেনসেনঃ ওর কোন বন্ধুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে? বাড়ির ঠিকানা বলেছে? কি ধরনের গাড়িতে চড়ত সে? গাড়ির লাইসেন্স প্লেটের নম্বর বলতে পারবে?

যতটা সম্ভব জবাব দেয়ার চেষ্টা করল রবিন। কিন্তু কোনমতেই আন্দাজ করতে পারল না, ফ্রেড হুফার কোথায় যেতে পারে।

হতাশ ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবশেষে চেয়ারে হেলান দিলেন জেনসেন। 'তাহলে তোমার কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে দেখলে কেমন হয়? ছুরিটা যে ভাবে বের করলে?'

ঢোক গিলল রবিন। 'ইচ্ছেমত ক্ষমতাটা ব্যবহার করতে জানি না আমি। বরং ক্ষমতাটাই ওটার ইচ্ছেমত যায় আর আসে। তবে একটা জিনিস লক্ষ করেছি, কোন কিছুর দিকে একাগ্র ভাবে তাকিয়ে থাকলে…'

রবিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই টেবিলের ওপর দিয়ে ছবিটা ঠেলে দিলেন জেনসেন। 'এই নাও। খুনের অস্ত্র উদ্ধার করতে এটা তোমাকে সাহায্য করেছিল। আরেকবার চেষ্টা করে দেখো। আমি এখন মরিয়া, রবিন, নইলে এ ধরনের আজগুবী ক্ষমতার ওপর নির্ভর করা তো দূরের কথা, বিশ্বাসই করতাম না। ওই লোকটাকে আমি ফেরত চাই। আমার মেয়ের খুনীকে কোনমতেই পালাতে দেব না আমি।'

ছবিটা তুলে চোখের সামনে নিয়ে এল রবিন। আগের বারের মত ছবির ওপর মনোযোগ একাগ্র করে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। শেলি আর ফ্রেডের যুগল ছবি। শেলির দিকে তাকিয়ে হাসছে ফ্রেড। খুব সুখী লাগছে তাকে। দুজনকেই লাগছে।

ফোঁপানির মত একটা শব্দ বেরিয়ে এল রবিনের মুখ থেকে। 'উঁহু! পারছি না!'

'চেষ্টা করো, প্লীজ!' অনুরোধের সুরে বললেন জেনসেন। 'যে ভাবে পারো। বের করো ওকে।'

ছবিটার দিকে তাকাল আবার রবিন। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল। তাকিয়ে রইল ফ্রেডের হাসিমুখের দিকে। কাজ হলো না। ছবিটা আবার ফিরিয়ে দিল সে।

হতাশ ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিলেন জেনসেন। তার দিকে তাকিয়ে দুঃখই লাগল রবিনের। চোখে চোখে তাকিয়ে থাকতে পারল না। চোখ নামাল। বুকের ওপর স্থির হলো দৃষ্টিটা। ইউনিফর্মের ওপর। ইস্, কোনমতে যদি আবার কাজে লাগানো যেত ক্ষমতাটা! একবার। শুধু একবার। যদি দেখতে পারত ফ্রেড কোথায় আছে।

অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল দৃষ্টি। ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগল জেনসেন, ইউনিফর্ম, অফিস ঘর···

পুরোপুরি মুছে গেল এক সময়। সমস্ত রঙ মুছে গিয়ে কাঁপা কাঁপা হলুদ রঙ ভেসে উঠল চোখের সামনে। উজ্জ্বল সূর্যালোকের মত রঙ।

ফিরে এল এক সময় আবার বাস্তবে।

'কি দেখলে?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে পড়লেন জেনসেন। 'দেখা গেল কোন কিছু?'

'একটা রঙ,' গলা কাঁপছে রবিনের। 'শুধুই হলুদ। সোনালিও বলা যেতে পারে। আর কিছু না। আমি দুঃখিত, মিস্টার জেনসেন, পারলাম না!'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল জেনসেনের। 'সোনালি? শুধু এই? আর কিছু দেখোনি! কি মানে এই সোনালির?'

'জানি না!' একই কথার প্রতিধ্বনি করল যেন রবিন, 'আমি দুঃখিত, মিস্টার জেনসেন!'

পনেরো

বাড়ি ফিরে চলল রবিন আর মুসা। গাড়ি চালাচ্ছে মুসা। রবিনের বাবার গাড়িটা। দুই পাশে ছায়ার মত লাফ দিয়ে দিয়ে যেন সরে যাচ্ছে অন্ধকার বাড়িঘরগুলো।

রাস্তাটা এ সময় একেবারেই নির্জন। তাড়াতাড়ি দোকানপাট সব বন্ধ করে দিয়ে গিয়ে ঘরে ঢোকে ব্ল্যাক ফরেস্টের বাসিন্দারা, রাতে পারতপক্ষে আর বেরোতে চায় না।

বাড়ি ফিরে সোজা ঘুমাতে চলল রবিন। বিছানায় শুয়ে কম্বল টেনে দিল গলা পর্যন্ত। ঘুম প্রায় এসে পড়েছে, এই সময় চোখের সামনে ভেসে উঠল সোফির মুখ। নিঃশব্দে বাতাসে ভেসে যেন উড়ে এল তার সামনে সোফি।

সোফি!

বেচারি সোফি!

হঠাৎ মনে হলো, নিশ্চয় কিছু গোপন করছে সে।

লাশটা পাওয়ার পর থেকেই অদ্ভুত আচরণ করছে।

কেমন যেন নিশিতে পাওয়া মানুষের মত হয়ে গেছে।

ঘর থেকে বেরোয় না। ফোন ধরে না। পরে যে ফোনের জবাব দেবে, তা-ও দেয় না।

এর মানেই হলো, গোপন কোন কথা জানা আছে তার।

কথা বলা দরকার ওর সঙ্গে। লাফ দিয়ে উঠে বসল রবিন। ঘুমের লেশমাত্রও নেই আর চোখে। পোশাক বদলে নেমে এল নিচতলায়। মুসা গেস্টরুমে। ঘুমাচ্ছে কিনা জানা নেই। ডাকল না তাকে। ঘরের এককোণে শুয়ে ছিল শিকলে বাঁধা রাফি। ধড়মড় করে উঠে বসল। রবিনকে দেখে কুঁই-কুঁই করতে লাগল চাপা স্বরে। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে শান্ত হতে বলল রবিন। টেবিলে রাখা আছে গাড়ির চাবিটা। তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এতরাতে আর হেঁটে যেতে সাহস করল না। ফ্রেডের ভয়টা চেপে রয়েছে মগজে।

সোফি কি জানে, জানতেই হবে ওকে। শেলির কথা। ফ্রেডের কথা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল সোফিদের বাড়ির ড্রাইভওয়েতে। হেডলাইট নিভিয়ে, ইঞ্জিন বন্ধ করে, নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। মুখ তুলে তাকাল অন্ধকার বাড়িটার দিকে।

কি জানো তুমি, সোফি? মনে মনে নিজেকেই প্রশ্ন করল রবিন।

আজ রাতে আমি সেটা জেনে নেবই!

সামনের দরজার দিকে এগোতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিল ওর। শিহরণ বয়ে গেল মেরুদণ্ডে বাড়ির ওই অন্ধকার কোণটায় লুকিয়ে নেই তো ফ্রেড?

এখনই হয়তো এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর।

নাহ্, এ ভাবে ভয় পেলে চলবে না। বাকি জীবন কি ফ্রেডের ভয়েই জড়সড় হয়ে থাকবে নাকি!

বেল বাজাল রবিন। থাবা দিল দরজায়। সোফির বেডরুমের জানালার দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে তার নাম ধরে ডাকল।

সাড়া নেই।

সামনের দরজা খোলার জন্যে নব ঘোরাল। খোলা। আগের বারের মতই দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

অন্ধকার প্রবেশপথের ভেতরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকল, 'সোফি? আছ তুমি? জেগে আছ?'

নীরবতা।

কাঠের রেলিঙটায় ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে চলল রবিন। সোফির ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। অর্ধেক খোলা। বাইরে থেকে ডাকল সে, 'সোফি? ওঠো! আমি, রবিন! ওঠো!'

জবাব নেই।

হলঘর ধরে ভেসে এল একটা গোঙানির শব্দ।

ঝট করে ফিরে তাকাল রবিন।

কোনদিক থেকে আসছে?

শেলির ঘর!

'সোফি!' দৌড়ে এসে নব ধরে মোচড় দিল রবিন। তালা লাগানো। জোরে জোরে কিল মারতে শুরু করল দরজায়। 'সোফি, খোলো! খোলো!'

জবাব এল না।

দরজায় কান চেপে ধরল রবিন। আশা করল, সোফির নিঃশ্বাসের খসখসে শব্দ শুনতে পাবে।

'সোফি, আমাকে ঢুকতে দাও! আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব। সোফি?'

'না, কিছুই করতে পারবে না তুমি!' জবাব শোনা গেল এতক্ষণে। 'তুমি ওকে খুঁজে পেয়েছ। সব কিছু ভজকট হয়ে গেছে তোমার কারণে!'

বিদ্যুতের শক্ খেল যেন রবিন। ঝটকা দিয়ে কান সরিয়ে আনল দরজা থেকে। 'কি বলছ তুমি?'

কঠিন কিছু একটা এসে পড়ল দরজায়। ধাতব শব্দ ভেসে এল ভেতর থেকে। ফুলদানি-টানি কিছু ছুঁড়ে মেরেছে সোফি।

'রবিন, দোহাই তোমার, তুমি যাও এখান থেকে!'

পিছিয়ে এল রবিন। পাগল হয়ে গেল নাকি সোফি! ঘরে ঢোকা দরকার। বাধা দেয়া দরকার ওকে, অঘটন ঘটিয়ে ফেলার আগেই।

ডান পা তুলে তালার ঠিক নিচেটায় প্রচণ্ড এক লাথি মারল। ভেঙে গেল পুরানো কাঠ। হাঁ হয়ে খুলে গেল পাল্লা। দড়াম করে গিয়ে বাড়ি খেল দেয়ালে। বই, ছবি, কাপড়-চোপড় সব ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। সে-সবের মাঝখানে

হাঁটু ভাঁজ করে বসে আছে সোফি। কোলের ওপর একটা বালিশ। তাতে চেপে রেখেছে দুই কনুই।

সামনে এসে দাঁড়াল রবিন। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলল, 'সোফি, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার। ফ্রেড হুফার আর শেলির সম্পর্কে।'

'না!' চিৎকার করে উঠল সোফি। 'কোন কথা নেই! ওদের সম্পর্কে কোন কথা বলতে চাই না আমি।' ফুঁপিয়ে উঠল সে।

'কিন্তু আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব,' বোঝানোর চেষ্টা করল রবিন। বসে পড়ল সোফির মুখোমুখি। 'যা যা জানো, সব যদি আমাকে বলো...'

'না!' তপ্তকণ্ঠে চিৎকার করে বলল সোফি। 'আমি বলব না! কিচ্ছু বলব না!'

'কিন্তু, সোফি...'

'তুমি কিছু বোঝোনি?' উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বলল সোফি। 'এখনও যদি না বুঝে থাকো, কি সাহায্য করবে? সব ধ্বংস করে দিয়েছ তুমি!'

'কি করলাম, বলো তো?' অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন। 'কি ধ্বংস করলাম?'

'কে তোমাকে লাশটা খুঁজে বের করতে বলেছিল?' হিসিয়ে উঠল সোফি। 'খোঁচাখুঁচি করে এ পরিস্থিতি তৈরি করতে বলেছিল কেউ! বলেনি অকারণ নাক গলাতে!'

'কিন্তু, সোফি,' কথাগুলো ভাল লাগল না রবিনের। 'শেলি তোমার বোন। শেলির কি হয়েছিল জানতে ইচ্ছে করে না তোমার? তুমি চাও না তোমার বোনের খুনী ধরা পড়ুক?'

'না, চাই না!' জ্বলন্ত চোখে রবিনের দিকে তাকিয়ে থেকে চিৎকার করে বলল সোফি, 'চাই না! চাই না! চাই না!' বসে পড়ল আবার সে।

'আমি...কিছু বুঝতে পারছি না...'

'পারবে তো না-ই,' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল সোফি। 'পারবে আর কি করে? তুমি তো আর জানো না, শেলিকে ঘৃণা করতাম আমি। দুচোখে দেখতে পারতাম না ওকে। প্রচণ্ড ঘৃণা করতাম।'

হতবাক হয়ে গেল রবিন। 'বলো কি!'

'এত ঘৃণা ছিল ওর ওপর আমার, শেষ পর্যন্ত খুনই করে বসলাম!' পাগলের মত চিৎকার করে উঠল সোফি। 'আমি ওকে খুন করেছি, রবিন! শেলিকে আমি খুন করেছি!'

ষোলো

কঠিন দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকিয়ে আছে সোফি। তার প্রতিক্রিয়া বোঝার

চেষ্টা করছে।

কিন্তু এতটাই চমকে গেছে রবিন, প্রতিক্রিয়াও যেন প্রকাশ পেতে চাইছে না তার।

ভারী নীরবতা চেপে বসল যেন দুজনের ওপর। জানালার বাইরে একটা বিড়াল ডাকল। ডাক শুনে মনে হচ্ছে, মানুষ। মানবশিশুর কান্নার মত আওয়াজ।

আবার ডাকল বিড়ালটা।

এখনও কথা বলছে না দুজনের কেউ। সোফির কথা কণ্ঠরুদ্ধ করে দিয়েছে যেন দুজনেরই।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল আবার সোফিই, 'যা বললাম সত্যি। শেলিকে ঘৃণা করতাম আমি।'

'কিন্তু তুমি তো ওকে ভালওবাসতে,' মৃদুকণ্ঠে বলল রবিন।

'হয়তো বাসতাম। কিন্তু ওর ওপর ভালবাসা রাখাটা কঠিন হয়ে গিয়েছিল আমার জন্যে। সব ছিল ওর। সুন্দরী, স্মার্ট, শত শত বন্ধু,' গলা কেঁপে উঠল সোফির। 'বাবাও বেশি ভালবাসত ওকে। সবচেয়ে বেশি। আমাকে বাসত না।'

চোখের পাতা সরু করে ফেলল রবিন। 'তোমার বাবা তোমাকে ভালবাসে না?'

মাথা নাড়ল সোফি। 'শেলিকে যতটা বাসত, ততটা না। দেখেশুনে আমার মনে হত, দুনিয়াটাই ঘুরছে শেলিকে ঘিরে। বাবার মন পাওয়ার জন্যে সব রকম ভাবে চেষ্টা করে দেখেছি আমি। আমার মা মারা যাবার পর রান্নাবান্না থেকে শুরু করে কাপড় ধোয়া, ঘর পরিষ্কার, বাজার-সদাই, সব করেছি। কত আর তখন বয়েস আমার। চোদ্দ। কিন্তু তারপরেও আস্ত একটা সংসার সামলানোর দায়িত্ব নিয়েছিলাম।'

'হুঁ, কঠিন দায়িত্ব,' মোলায়েম কণ্ঠে জবাব দিল রবিন।

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে থাকল সোফি। চোখের কোণে পানি টলমল করছে। 'কিন্তু সে-সব কোন কিছুই বাবার চোখে পড়ত না। অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই আগে শেলির খোঁজ করত। আমি সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও যেন দেখত না আমাকে। অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল, যখন ফ্রেড হুফার এসে ঢুকল এর মধ্যে।'

'ফ্রেডকে তোমার বাবা পছন্দ করতেন না?'

মাথা নাড়ল সোফি। 'না। একদিন তো এ নিয়ে মস্ত ঝগড়া হয়ে গেল শেলির সঙ্গে বাবার। স্পষ্ট করে শেলিকে জানিয়ে দিল বাবা, ফ্রেডের সঙ্গে তার মেলামেশা চলবে না। তারপরেই ঘটল অঘটন–কাউকে কোন কিছু নিয়ে বেশি চাপাচাপি করলে কিংবা বাধ্য করতে গেলে যা হয়–বাড়ি থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নিল শেলি। ফ্রেডের সঙ্গে।'

পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকাল সোফি। মাথা এলিয়ে দিল। নিঃশ্বাস ফেলল জোরে। 'স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, তাতে আমি খুশিই হয়েছিলাম

আবেগে উদ্বেলিত আমি তখন। মনে হয়েছিল, শেলি চলে গেলে তখন বাবা আমার দিকে বেশি বেশি করে নজর দেবে তাই শেলি যখন তার পালানোয় সাহায্য করতে অনুরোধ করল আমাকে, সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম...'

চুপ হয়ে গেল সোফি।

'তারপর?' সব কথা শুনতে চাইছে রবিন।

'শেলিকে বিদেয় করার জন্যে এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম, আমার সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাও দিয়েছিলাম তাকে। শেলি যেদিন পালানোর সিদ্ধান্ত নিল, বাবার সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ডিউটি। বাবা তখনও ডিটেকটিভ হয়নি, সার্জেন্ট ছিল। রাত আটটায় ব্ল্যাক ফরেস্টের ডানকান মলে দেখা করার কথা ছিল শেলির।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'দেখা করতে পেরেছিল?'

মাথা নাড়ল সোফি। 'স্কোয়াড কার থেকে ফোন করেছিল বাবা। জানাল, হঠাৎ করে ডিউটির পরিবর্তন হয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসবে। আমাদের তৈরি হয়ে থাকতে বলল, বাইরে খাওয়াতে নিয়ে যাবে। তাতে খুশি তো হলামই না, শঙ্কিত হয়ে গেলাম দু'বোনেই। ফ্রেডকে ফোন করার চেষ্টা করল শেলি। পেল না ওকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। আতঙ্কিত হয়ে জিনিসপত্র সব সুটকেসে ভরতে শুরু করল শেলি।'

নতুন করে পানি দেখা দিল সোফির চোখে। তার দিকে তাকিয়ে হাসল রবিন। তাকে বলার জন্যে উৎসাহিত করার চেষ্টা করল। কাহিনীর বাকিটা শোনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।

'আমি শেলিকে বললাম,' বলতে লাগল আবার সোফি, 'বাড়ি নেই যখন, নিশ্চয় মলে চলে গেছে ফ্রেড। আমি গিয়ে তাকে সাবধান করে দেব। বলব, ওখানে তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না শেলি। সে যেন রাস্তার মোড়ের অন্ধকারে অপেক্ষা করে। ওখানে থাকবে শেলি। যত দ্রুত পারল, সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। আমিও বেরোলাম তার সঙ্গে,' চোখ মুদল সোফি। ওভাবে থেকেই বলল, 'মলে ছুটলাম। ফ্রেডকে পাওয়া গেল ওখানে। সব কথা জানালাম। বললাম কোথায় দেখা করতে হবে। আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে গেল ফ্রেড। আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ির দিকে ছুটল। খুশি মনে বাড়ি ফিরে এলাম। একা বাড়িতে। শেলি নেই। বাবা আর আমার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে আসবে না...সত্যি আর আসেনি...'

গলা ধরে এল সোফির। চোখ মেলল। টিস্যু পেপারে নাক মুছল। চোখে চোখে তাকাল রবিনের। 'শেলির সঙ্গে সে-ই আমার শেষ দেখা।'

নখ কামড়াল রবিন। 'সোফি। আমি বুঝতে পারছি না, তাকে তুমি খুন করেছ এ কথা বললে কেন?'

'সরাসরি হয়তো করিনি। কিন্তু তার মৃত্যুর জন্যে তো আমিই দায়ী,' ফোঁপাতে শুরু করল সোফি। 'বাবা ঠিকই বলেছিল। ফ্রেড লোক ভাল না। ও একটা খুনী। ওর মত একটা শয়তানকে কিনা আমি সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। শেলিকে বাড়ি থেকে তাড়ানোর জন্যে এতটাই খেপে উঠেছিলাম

আমি, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ঠেলে দিয়েছিলাম তাকে মৃত্যুর মুখে। আমি ওকে সে-রাতে সাহায্য না করলে পালানোর চেষ্টা করত না সে, হয়তো বাড়ি থেকেই বেরোত না। না বেরোলে খুনও হত না। বেঁচে থাকত।'

'হুঁ!' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রবিন। কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

পানিতে ভরে গেছে সোফির চোখ। ওর কষ্টটা অনুভব করতে পারছে রবিন। দুই বছর শেলির কাছ থেকে কোন খবর পায়নি সোফি। জানত না বেঁচে আছে না মরে গেছে, ভাল আছে না মন্দ। খবর যেহেতু পায়নি, খারাপটাই ধরে নিয়েছিল, আর সব সময় নিজেকে দোষারোপ করে মনে মনে কষ্ট পেয়েছিল।

কিন্তু একটা ব্যাপার অবাক করছে রবিনকে।

ফ্রেড শেলিকে খুন করতে গেল কেন?

শেষ মুহূর্তে কি মত বদল করে ফেলেছিল শেলি? যেতে চাইছিল না ফ্রেডের সঙ্গে? তাতে রেগে গিয়েছিল ফ্রেড, ঝগড়া বাধিয়েছিল? মাথা গরম অবস্থায় শেলিকে ছুরি মেরেছিল? কিন্তু ম[illegible]াচ্ছে না। কোথায় যেন একটা খটকা!

যাকে এত ভালবাসত, তাকে কেন খুন করবে ফ্রেড? কোনই যুক্তি নেই।

কেঁপে উঠল রবিন। দুই হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি চেপে ধরে শীত কমানোর চেষ্টা করল। সেটা লক্ষ করল সোফি। বিছানার কিনার থেকে ঝুলতে থাকা কম্বলটা টেনে এনে রবিনের গায়ের ওপর ফেলল।

গায়ে জড়াল সেটা রবিন। তাকিয়ে আছে কম্বলটার দিকে। শেলির কম্বল।

আলো কমে আসতে লাগল। ঘরের মধ্যে লম্বা লম্বা ছায়া পড়ল। কাঠের মেঝে থেকে উঠে আসছে ভেজা মাটির গন্ধ।

চোখ মিটমিট করল রবিন।

কি ঘটছে?

ধীরে ধীরে ধূসর মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল যেন সোফি।

গর্তের মধ্যে যেন ছুঁড়ে দেয়া হলো রবিনকে। ঝুরঝুর করে সারা গায়ে ঝরে পড়তে লাগল বাদামী মাটি। ভেজা ভেজা। ভারী। ক্রমশ ঢেকে ফেলছে ওকে। চেপে ধরে রাখছে।

চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল সে।

বাদামী ভেজা মাটির ছোট ছোট টুকরো ঢুকে গেল মুখের মধ্যে। গলায় ঢুকে গিয়ে দম আটকে দিল।

বাঁচার তাগিদে দুই হাতে মাটি সরিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। হাতে ঠেকল একটা ছোট, গোল, শক্ত জিনিস। ধাতব কোন কিছু।

নড়চড়ায় মাটি ঢুকে যাচ্ছে নাকের ফুটোয়, চোখের মধ্যে।

দম নিতে পারছে না।

জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হচ্ছে তাকে মাটিতে।

সতেরো

গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠল সে।

টের পেল, কাঁধ ধরে জোরে জোরে ঝাঁকি দেয়া হচ্ছে তার।

'রবিন! রবিন!' সোফির কণ্ঠটা বহু দূর থেকে আসছে মনে হলো।

ধস্তাধস্তি করে, দুই হাতে মাটি খামচে সরিয়ে কবর থেকে বেরিয়ে এল রবিন।

চোখ মেলে দেখল মেঝেতে পড়ে আছে। চিৎ হয়ে। কম্বলটা অনেকখানি সরে গেছে গায়ের ওপর থেকে। তার কাঁধ চেপে ধরে মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সোফি। বিহ্বল। হতবাক। রবিন চোখ মেলতেই জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে তোমার, রবিন?'

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল রবিন। 'ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন দেখলাম। মনে হলো যেন জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হচ্ছে আমাকে। একটা কবরের মধ্যে।'

'বলো কি!' ঝট করে হাতটা সরিয়ে নিল সোফি।

রবিনও উঠে বসল। মাথা ঘুরছে। শক্ত, মসৃণ, ধাতব জিনিসের অনুভূতিটা এখনও লেগে আছে হাতের তালুতে।

মুঠোটা খুলল। শূন্য হাত। স্বপ্নের মধ্যে কিছু একটা ধরেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জরুরী কোন সূত্র কি তার হাতে তুলে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল?

'কবরে পুঁতে ফেলা হচ্ছিল!' রবিনের কথাটার প্রতিধ্বনি করল যেন সোফি। 'শেলিকে কবর দেয়ার মত?'

হাতের শূন্য তালুটার দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হ্যাঁ। ওই কবরে নিশ্চয় কিছু আছে। এমন কিছু, যেটা তোমার বোনের হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করবে। নইলে শুধু শুধু স্বপ্নটা দেখতাম না আমি।'

'এমন করে বলছ, যেন জরুরী সূত্রগুলো স্বপ্নে দেখিয়ে দেয়া হয় তোমাকে।'

'অবিশ্বাস করি কি করে? কিছু কিছু যে পাচ্ছি কয়েক দিন ধরে–অন্তত তোমার বোনের ক্ষেত্রে, সেটা তো প্রমাণিত।' চোখ তুলে সোফির দিকে তাকাল রবিন। 'সোফি, আরও একটা কথা, হয়তো উদ্ভট লাগবে শুনতে, কিন্তু আমার কেবলই মনে হচ্ছে কোনভাবে মৃত্যুর ওপার থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছে তোমার বোন। আমার দৈব-দর্শনের ক্ষমতাটা ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সময়মত তুলে দিচ্ছে আমার হাতে। ওর কবর আবিষ্কারের কথাটাই ধরো। এতদিন ধরে পড়ে রইল, কেউ দেখল না, কিন্তু অকারণে, অবেলায় আমি গিয়ে হাজির হলাম জায়গামত। রাফিও গিয়ে তুলে নিয়ে এল হাড়টা। সব কেমন কাকতালীয় মনে হয় না?'

'না, হয় না। এ রকম রহস্যময় বহু ঘটনা ঘটে পৃথিবীতে, যেগুলোর ব্যাখ্যা মানুষের অজানা,' সোফি বলল। 'কিন্তু তোমার এই ক্ষমতার কথা আগে বলোনি কেন আমাকে?'

'কারণ, ভেবেছিলাম, তুমি বিশ্বাস করবে না,' জবাব দিল রবিন। 'পাগল ভাববে।'

'কিন্তু ভাবলাম না, দেখলে তো? কারণ, বুঝতে পারছি, তুমি পাগল নও। সাংঘাতিক একটা ক্ষমতা কেবল তৈরি হয়েছে তোমার মধ্যে। মানুষের সেটা হতেই পারে, কত মানুষেরই কত রকম ক্ষমতা জন্মায়।' একটা সেকেন্ড চুপ থেকে বিড়বিড় করে বলল সোফি, 'এতক্ষণে বুঝলাম, তুমি জানলে কোত্থেকে। বাবা যখন বলল, তুমি তদন্তে সাহায্য করছ, মেলাতেই পারছিলাম না কিছু। বুঝতে পারছিলাম না, কথাটা তুমি জানলে কি করে।'

'কথাটা মানে?'

'ছুরির কথা। ওটা কোথায় আছে, তোমার তো জানার কথা ছিল না।'

'ছুরিটা দেখেছি আমি আমার দিবাস্বপ্নের মধ্যে।'

'হ্যাঁ, এখন সেটা বুঝতে পারছি।' সোফি জিজ্ঞেস করল, 'এখন স্বপ্নে নতুন আর কি দেখলে?'

'গায়ের ওপর চাপা দেয়া মাটি ঠেলে সরানোর চেষ্টা করছিলাম,' রবিন বলল। 'শক্ত কি যেন একটা হাতে ঠেকল। দেখতেও পেলাম না জিনিসটা কি, বুঝলামও না।'

'আমার বোনের কবরে?' আগ্রহী হয়ে উঠল সোফি। 'এমন কিছু, যেটা ফ্রেডকে ধরতে সাহায্য করবে?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'করতে পারে।'

উঠে দাঁড়াল সোফি। 'চলো তাহলে। খুঁজে বের করব ওটা।'

'সত্যি যাবে?'

'যাব। শেলির কাছে আমার মস্ত ঋণ,' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে জবাব দিল সোফি। 'খুনীকে ধরিয়ে দিয়ে তার কিছুটা অন্তত যদি শোধ করতে পারি...'

দ্রুত পোশাক পরে রেডি হয়ে নিতে লাগল সে। যেগুলো পরা ছিল, বদলে নিয়ে মাথার ওপর দিয়ে টেনে দিল একটা ভারী নীল সোয়েটার। কালো, খাটো চুলগুলোতে ব্রাশ চালিয়ে সোজা করে নিল। রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।

সোফির পিছু পিছু নিচতলায় নেমে এল রবিন। ওর গায়ে শীতের পোশাক তেমন নেই, আগেই লক্ষ করেছে সোফি। লিভিংরুমের বাতি জ্বালল। আলমারি থেকে দুটো উইন্ডব্রেকার বের করে একটা দিল রবিনকে, আরেকটা নিজে পরল।

উইন্ডব্রেকারটা পরতে পরতে লক্ষ করল রবিন, নিচু একটা ছোট টেবিলের ড্রয়ার খুলছে সোফি।

যে জিনিসটা বের করল, দেখে চমকে গেল রবিন।

ছোট একটা রিভলভার। রূপালী বাঁট।

ঘুরে দাঁড়াল সে। অস্ত্রটা তাক করল রবিনের দিকে। বুড়ো আঙুল দিয়ে আস্তে করে টেনে নামিয়ে দিল হ্যামারটা।

'সোফি!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

'বাবার জিনিস এটা,' সোফি বলল। 'বাড়তি অস্ত্র। নিয়ে নিলাম। সাবধানতা। যদি ফ্রেড গিয়ে হাজির হয়!'

রিভলভারটা উইন্ডব্রেকারের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সোফি। 'চলো। এবার বেরোনো যাক।'

আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নেয়াটা ভাল লাগছে না রবিনের। এ সব জিনিস বড় বিপজ্জনক। কি ঘটতে কি ঘটে যায়, কোন ঠিক নেই। তবে হুফারের মত একজন খুনী যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে আত্মরক্ষার জন্যে একটা কিছু থাকাও দরকার। নিতে বাধা দিল না সোফিকে।

সামনের দরজা দিয়ে ঘর থেকে বেরোল ওরা। সোফিকে অনুসরণ করে বাড়ির পাশ ঘুরে চলে এল পেছন দিকে, গ্যারেজে। বেলচা আর টর্চ নেয়ার জন্যে।

আঠারো

নীরব, নিথর বনের চারপাশটা টর্চের আলো ফেলে দেখল সোফি। তারপর আলো নামাল মাটির দিকে। উঁচু হয়ে থাকা আলগা মাটির স্তূপগুলো দেখল।

'কি খুঁজতে এসেছি আমরা, বলো তো?' জিজ্ঞেস করল সোফি। কণ্ঠস্বর খাদে নামানো।

'শক্ত কিছু,' কবরের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে জবাব দিল রবিন। 'দেখতে তো পাইনি জিনিসটা। কেবল অনুভব করেছি হাতের তালুতে। পেলে, স্পর্শ করলেই বুঝে যাব ওটা কিনা।' কবরের মধ্যে মাটি চাপা থাকার যন্ত্রণাটা অনুভব করে শিউরে উঠল সে।

এ রকম দৃশ্য কেন দেখল? জরুরী কোন সূত্র পাবে? নাকি সাবধান করে দিল তাকে অবচেতন মন, কবরের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যে?

খাড়া হয়ে যাচ্ছে হাতের লোম। ভাবনাটা জোর করে সরিয়ে রাখতে চাইল সে। পারছে না। মনে হচ্ছে, শেলি যেন অদৃশ্য থেকে তাকে অনুরোধ করছে কবরের মধ্যে থেকে জিনিসটা তুলে নেয়ার জন্যে। নিশ্চয় কোন জরুরী সূত্র, খুনের রহস্যভেদে কাজে লাগবে–নইলে দেখতে পাবে কেন?

'খুব ছোট। গোল একটা জিনিস,' সোফিকে বলল সে। 'সরো তো দেখি। আলোটা ধরে রাখো।'

নরম মাটিতে ঘ্যাঁচ করে বেলচা ঢুকিয়ে দিল সে। খুঁড়তে শুরু করল।

এক বেলচা মাটি তুলে ছুঁড়ে ফেলল একধারে।

গুঙিয়ে উঠল সোফি।

ফিরে তাকাল রবিন। 'কি হলো তোমার?'

'খারাপ লাগছে,' ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবে আবার সোফি। 'আমার জন্যেই শেলির আজ এ অবস্থা...ভাবতে পারছি না, ওকে ওখানে মাটিচাপা দিয়ে রেখেছিল ফ্রেড...উফ্, কি ভয়ানক!'

'যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কাজ সেরে এখান থেকে চলে যেতে হবে,' রবিন বলল। 'যতই দেখবে, কষ্ট বাড়বে তোমার। কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না। দেখি, আলোটা ধরো ভালমত।'

মাথা ঝাঁকাল সোফি। দুই হাতে টর্চ ধরে আলোটা স্থির রাখার চেষ্টা করল।

কবরের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে রবিন। বেলচার পর বেলচা মাটি নিয়ে ছুঁড়ে ফেলছে একধারে।

গাছের পাতায় ফিসফিসানি তুলে বয়ে যাচ্ছে বাতাস। ডাল থেকে খসা শুকনো বাদামী মরা পাতা নিঃশব্দে ভেসে নেমে আসছে মাটিতে।

খানিকক্ষণ খোঁড়ার পর তুলে আনা আলগা মাটিগুলো পরীক্ষা করতে বসল রবিন। বেলচা রেখে মুঠো মুঠো মাটি তুলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে ছাড়তে লাগল চালনি দিয়ে চালার মত করে। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দেখছে সোফি। আলোটা ধরে রেখেছে রবিনের হাতের ওপর।

ভেজা, নরম একটা কিছু আঙুল ছুঁয়ে গেল রবিনের। 'এহ্!' ঝেড়ে ফেলে দিল সে।

'কি হলো?'

'কেঁচো!'

আবার মাটি চালা শুরু করল রবিন। সাবধান রইল, যাতে কেঁচো না উঠে আসে হাতে।

হাতের আলোটা স্থির রাখতে পারছে না সোফি। খুব বেশি কাঁপছে। সরে গেল। হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে উঠল সে।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

আলো নেড়ে দেখাল সোফি। আতঙ্কিত স্বরে বলল, 'হাড়! মানুষের!'

ছোট্ট ধূসর জিনিসটার ওপর দৃষ্টি স্থির করল রবিন। হাত বাড়িয়ে আঙুলের মাথা দিয়ে আলতো করে ছুঁয়ে দেখল। ঠাণ্ডা, কঠিন স্পর্শ। একটা পাথর।

চেপে রাখা দমটা ছেড়ে দিল সে। সোফিকে বলল, 'হাড় না, পাথর।' বেলচাটা ঠেলে দিয়ে বলল, 'বসে না থেকে, মাটি খোঁড়ো। কাজের মধ্যে থাকলে উল্টোপাল্টা দেখাটা হয়তো বন্ধ হবে।'

বেলচা তুলে নিয়ে খুঁড়তে শুরু করল সোফি। একহাতে টর্চ নিয়ে আরেক হাতে খুঁড়ে তোলা মাটি পরীক্ষা করতে লাগল রবিন। বেলচা দিয়ে মাটি তুলে রবিনের আঙুল ছড়ানো হাতের তালুতে ফেলে সোফি, রবিন সেগুলোকে ধীরে ধীরে ছেড়ে দেয় আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

এ ভাবে চলল কিছুক্ষণ।

আলো কমে আসতে লাগল।

'ব্যাটারি ফুরাচ্ছে,' রবিন বলল।
'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল সোফি। 'জলদি করা দরকার।'
আরেক বেলচা মাটি তুলে রবিনের হাতে ফেলল সোফি। আঙুলের ফাঁক দিয়ে সেগুলো ফেলে হঠাৎ থমকে গেল রবিন। মসৃণ কোন ছোট জিনিসের স্পর্শ পেয়েছে। পড়ে গেছে মাটিতে।
'আই, দাঁড়াও, দাঁড়াও!'
'পাওয়া গেছে?' হাত থেকে বেলচাটা ছেড়ে দিয়ে রবিনের পাশে বসে পড়ল সোফি।
জিনিসটা তুলে নিয়েছে ততক্ষণে রবিন। টর্চটা সোফির হাতে দিয়ে প্যান্টের কাপড়ে ঘসে ঘসে পরিষ্কার করতে শুরু করল জিনিসটা। হাত কাঁপছে সোফির। আলোটা স্থির রাখতে পারছে না এক জায়গায়।
মাটি সরিয়ে পরিষ্কার করতেই চেনা গেল জিনিসটা।
একটা বোতাম।
সোনার বোতাম।
'দূর!' হতাশা চাপা দিতে পারল না সোফি। 'এ জিনিস দিয়ে কি হবে?'
'জানি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বোতামটার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। আলোয় চকচক করছে ওটা। 'শেলিকে যে কবর দিয়েছে, তার জিনিস হতে পারে। নিজের অজান্তে ফেলে গেছে।'
'তা হতে পারে,' মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল সোফি। 'কিন্তু সে তো দুই বছর আগের ঘটনা। এতকাল পরে কি করে প্রমাণ করব সে-রাতে এ রঙের বোতামওয়ালা কোন পোশাক পরেছিল কিনা ফ্রেড?'
'হয়তো পারব,' রবিন বলল। 'পুলিশ যদি তার বাড়ির আলমারি ঘেঁটে পুরানো পোশাক বের করতে পারে, যেটাতে…'
মট করে একটা শব্দ। কথা বন্ধ হয়ে গেল তার।
পায়ের চাপে শুকনো ডাল ভেঙেছে।
কাছেই।
'কে?' চিৎকার করে উঠল রবিন।
গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি।
'ফ্রেড!'
একসঙ্গে বেরিয়ে এল সোফি আর রবিনের মুখ থেকে।
দৃঢ় পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ফ্রেড। চোখ রবিনের হাতের দিকে। 'কি পেলে?' শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে। 'বোতাম?'

উনিশ

বোতামটার কথা জানে নাকি ও, ভাবছে রবিন। মুঠোটা শক্ত করে ফেলল।

তাকিয়ে আছে এগিয়ে আসতে থাকা ফ্রেডের দিকে। পড়ল কি করে বোতামটা? নিশ্চয় খুন করার আগে ধস্তাধস্তি হয়েছিল, টানাটানিতে ছিঁড়ে গিয়েছিল।

ফ্রেডের লম্বা লালচে-বাদামী চুলগুলো কপালের ওপর এসে পড়েছে। এলোমেলো। ময়লা লেগে থাকা। জ্যাকেটটাও ময়লা। দোমড়ানো। প্যান্টের দু'হাঁটুতেই দাগ।

বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল সে, অনুমান করল রবিন। হাঁটার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে, ক্লান্ত। ভীষণ ক্লান্ত।

হবেই। দুই বছর ধরে লুকোচুরি খেলছে পুলিশের সঙ্গে। খেলতে হয়েছে।

এখন সে মরিয়া।

যা খুশি করে বসতে পারে। আরও দুটো খুন করাও অসম্ভব নয় ওর পক্ষে। ভয়টা বেড়ে গেল রবিনের।

হাত বাড়াল ফ্রেড। 'রবিন, দেখি তো ওটা?'

পিছাতে গিয়ে সোফির গায়ে ধাক্কা খেল রবিন।

তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল সোফি, 'ফ্রেড, তুমি যাও এখান থেকে! আবার কেন এলে?' গলা কাঁপছে ওর। রবিনের পেছনে আড়াল করে ফেলতে চাইল নিজেকে। 'পাগলের মত খুঁজছে তোমাকে বাবা। যে কোন মুহূর্তে এসে হাজির হতে পারে। ভাল চাও তো পালাও।'

ওর কথা কানে তুলল না ফ্রেড। বাড়ানো হাতটা আরও ঠেলে দিল রবিনের দিকে, একেবারে থুতনির কাছে নিয়ে এল। 'বোতামটা। দাও, দেখি।'

'বাবা আসছে,' মিথ্যে কথা বলল সোফি। 'পালাও, ফ্রেড। জলদি ভাগো!'

'আমি বোতামটা দেখতে চাই,' কঠিন, আবেগহীন কণ্ঠে বলল ফ্রেড। চোখের দৃষ্টি রবিনের ওপর স্থির।

না দেখিয়ে পারবে না, বুঝতে পারছে রবিন। ঝামেলা করে ওকে না রাগিয়ে বরং দেখিয়ে দেয়াটাই ভাল।

ডান হাতটা ওপরে তুলল সে। মেলে ধরল ফ্রেডের দেখার জন্যে। বোতামটার দিকে সে নিজেও তাকাল। অদ্ভুত আভা ছড়ানো শুরু করেছে ওটা।

জ্বলছে। তাকিয়ে আছে রবিন। মনে হচ্ছে, জ্বলে উঠেছে তার পুরো তালুটাই। মাঝখানে খুদে একটা সূর্যের মত বোতামটা জ্বলছে।

উজ্জ্বল হচ্ছে আরও। আরও। যতক্ষণ না কালো অন্ধকারে ঢাকা গাছপালা, রাতের গাঢ় বেগুনী আকাশ, পাতার কার্পেট বিছানো বনভূমি সাঁতরাতে শুরু করল সোনালী রঙের মধ্যে। অস্পষ্ট হতে হতে হারিয়ে গেল সব সোনালী চাদরের ওপাশে।

ঝলমলে সোনালী চাদর ফুঁড়ে বেরিয়ে এল যেন এক ছোপ লাল রঙ। ছড়াতে শুরু করল রঙটা। লাল রঙের একটা শার্টের সামনের অংশ হয়ে যাচ্ছে।

শেলির লাল শার্ট।

শেলিকে দেখতে পেল রবিন। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে যাচ্ছে নীরব চিৎকারের ভঙ্গিতে। কারও সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে সে। তার কাঁধ খামচে ধরে আছে কঠিন একটা থাবা।

কে? কার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে শেলি? দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে উজ্জ্বল সোনালী চাদরের পটভূমিতে দেখার চেষ্টা করছে রবিন।

লোকটার মুখ দেখতে পেল না কোনমতেই। কেবল কাঁধ চেপে ধরে থাকা হাত। শরীরটাও নজরে এল। পেছন ফিরে আছে। শেলির মুখ এদিকে ফেরানো। ভয়ে, আতঙ্কে বিকৃত হয়ে যাওয়া চেহারা।

তারপর শেলির চেহারাটাও মুছে যেতে শুরু করল। নীরব চিৎকারের ভঙ্গিতে ফাঁক হয়ে আছে এখনও ঠোঁট দুটো। মুছে যেতে লাগল সোনালী রঙ। ক্রমশ গোল হয়ে, ছোট হয়ে আসতে থাকল চাদরটা। মিলিয়ে যাচ্ছে...মিলিয়ে যাচ্ছে...অন্ধকারে...তার হাতের তালুর মধ্যে।

আবার চোখের সামনে ফুটে উঠল ছোট একটা গোল বোতাম।

মুখ তুলে ফ্রেডের দিকে তাকাল সে।

'দেখি, বোতামটা,' ফ্রেড বলল, 'আমার হাতে দাও।'

বোতামটা নিতে গেল ফ্রেড। হাত সরাতে গেল রবিন। ঝাড়া লেগে বোতামটা মাটিতে পড়ে গেল। আলগা মাটির মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে তুলে নিল ওটা সোফি। চোখের সামনে এনে ভালমত দেখল। পরক্ষণে ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। মনে হলো চিনতে পেরেছে। 'বোতামটা...'

'দেখি, দাও আমাকে!' হাত বাড়াল ফ্রেড। 'আমার দেখা দরকার।'

'কি দেখবে?' রবিনের প্রশ্ন। 'তোমার জিনিস কিনা, শিওর হতে চাও?'

ফ্রেডের চোখে বিরক্তি। কথা বলার জন্যে মুখ খুলল।

কিন্তু বলার আগেই তাকে বাধা দিল আরেকটা কণ্ঠ। গমগম করে উঠল আদেশের সুর, 'নোড়ো না! খবরদার!'

কিন্তু না নড়ে পারল না ফ্রেড। বাড়ানো হাতটা নামিয়ে নিয়ে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

গাছের আড়াল থেকে সোফির বাবাকে বেরিয়ে আসতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন।

'বাবা!' বিস্ময় চাপা দিতে পারল না সোফি। 'কি করে জানলে তুমি...?'

'আমাদের একজন অফিসার টহল দেয়ার সময় তোমাদের এদিকে আসতে দেখেছে,' সোফির সঙ্গে কথা বলছেন, কিন্তু জেনসেনের নজর ফ্রেডের দিকে। হাতের উদ্যত রিভলভারটাও তার ওপর স্থির।

'গুলি করবেন না!' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুই হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়াল ফ্রেড। 'আমি পালাব না।'

'আর পালাতে দিলে তো,' শান্ত, আবেগহীন কণ্ঠে বললেন জেনসেন। 'দুই-দুইবার ফসকেছ। আর না।'

'লেফটেন্যান্ট জেনসেন,'সোফির কাছ থেকে সরে আসতে আসতে বলল

রবিন, 'একটা বোতাম খুঁজে পেয়েছি আমরা। শেলির কবরে।'

'সরো!' রিভলভার নেড়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'সামনে আসবে না। সুযোগ দিলেই পালাবে ও। ভয়ঙ্কর লোক!'

'কিন্তু, বাবা...'

সোফিকেও কথা বলতে দিলেন না জেনসেন। 'যাও, গাড়িতে গিয়ে বসো। দুজনেই। এখান থেকে সরে যাও। যাও!'

দ্বিধা করতে লাগল রবিন আর সোফি দুজনেই। ফ্রেডের চোখের দিকে তাকাল রবিন। ভয় নেই সে-চোখে, আছে অস্বস্তি।

হাত তোলা অবস্থাতেই এক পা পিছিয়ে গেল ফ্রেড।

'যাচ্ছ না কেন!' ধমকে উঠলেন জেনসেন। 'যাও জলদি! গাড়িতে গিয়ে বসো!'

রবিন আর সোফি নড়ল না এবারেও। কিন্তু আরও এক পা পিছিয়ে গেল ফ্রেড।

তার দিকে রিভলভার সোজা করে ধরলেন জেনসেন। 'তুমি নড়বে না বলে দিলাম!...রবিন, যাও তোমরা! চলে যাও!'

'না, বাবা!' বাবার উদ্দেশ্য বুঝে চিৎকার করে উঠল সোফি। খুন করতে চাইছে ফ্রেডকে।

রবিনের নজর ফ্রেডের দিক থেকে সরছে না।

'দে-দে-দেখুন,' অনুনয় করল ফ্রেড, 'আমাকে গুলি করবেন না! প্লীজ!'

'আর পালাতে দেব না!' নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললেন জেনসেন। মনে হলো রোবটের কণ্ঠ।

'না না, প্লীজ!' আবার অনুনয় করল ফ্রেড।

'আমার বাচ্চা মেয়েটাকে খুন করেছ! কি ভেবেছ? ছেড়ে দেব আমি তোমাকে?' ফ্রেডের বুকের দিকে রিভলভার তাক করলেন জেনসেন।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান...' চিৎকার করে উঠল ফ্রেড।

কথা শেষ হলো না তার। প্রচণ্ড শব্দে গুলি ফুটল। বনের গাছে গাছে প্রতিধ্বনি তুলল সে-শব্দ।

বিশ

চিৎকার করে উঠল রবিন। তাকিয়ে আছে ফ্রেডের দিকে। তার টলে পড়ে যাওয়ার অপেক্ষা করছে।

চমকের ধাক্কায় পাথর হয়ে গেছে যেন ফ্রেড। ধীরে ধীরে হাত দুটো নেমে এল দুই পাশে। সামান্য বাঁকা হয়ে গেল পিঠটা।

কিন্তু মাটিতে পড়ল না সে।

রবিনকে অবাক করে দিয়ে গুঙিয়ে উঠলেন জেনসেন।

ফিরে তাকাল রবিন। রক্তে ভিজে যাচ্ছে তাঁর কোটের কাঁধ। হাঁ হয়ে গেছে মুখ।

সোফির দিকে ঘুরল রবিন। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সে। হাতে ধরা রিভলভারটা এখনও তাক করা রয়েছে তার বাবার দিকে।

আবার গুঙিয়ে উঠলেন জেনসেন। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। মেয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সোফি…কেন?' আবার গোঙালেন তিনি।

রিভলভার সরাল না সোফি। 'সব আমি বুঝে ফেলেছি, বাবা।' প্রাণহীন, ভোঁতা কণ্ঠস্বর। চঞ্চল হয়ে নড়ে বেড়াচ্ছে শুধু চোখ দুটো। বাকি চেহারা ভাবলেশহীন।

'সোফি…তুই আমাকে গুলি করেছিস!' আহত কাঁধ চেপে ধরে বললেন জেনসেন। রক্ত বেরিয়ে আসছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

'করেছি, কারণ আমি সব বুঝে ফেলেছি,' বরফের মত শীতল সোফির কণ্ঠ। 'বোতামটা ভাল করে দেখার পর মনে পড়ে গেছে আমার। চিনতে পেরেছি, বাবা। তোমার ইউনিফর্মের বোতাম। সে-রাতে বোতামটার জন্যে অস্থির হয়ে গিয়েছিলে তুমি। যে রাতে হারিয়ে গেল শেলি।'

'সোফি…' দুর্বল কণ্ঠে প্রতিবাদ করতে গেলেন জেনসেন।

'শেলি চলে গেল,' বাবার কথা কানে তুলল না সোফি। 'শেলি চলে গেল, আর তুমি অস্থির হয়ে উঠলে সামান্য একটা বোতামের জন্যে। আমার মনের অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে তখনই ব্যাপারটা খেয়াল করতাম। কিন্তু আজ আর ফাঁকি দিতে পারবে না। সব বুঝে ফেলেছি। শেলিকে তুমিই খুন করেছ, বাবা।'

'খুন না, দুর্ঘটনা! সব কিছুর জন্যে ওই শয়তানটা দায়ী!' চোখের ইশারায় ফ্রেডকে দেখালেন জেনসেন। সোজা হতে গিয়ে ককিয়ে উঠলেন ব্যথায়। রক্তাক্ত কাঁধটা চেপে ধরে আস্তে করে বসে পড়লেন মাটির স্তূপের ওপর।

'তুমি তোমার নিজের মেয়েকে হত্যা করেছ, বাবা,' রিভলভার সরাচ্ছে না সোফি।

রবিনের মনে হলো, আরেকটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। দেখল, দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে যেন ফ্রেডও বসে পড়েছে। জেনসেনের দিকে চোখ।

'স্রেফ দুর্ঘটনা!' জেনসেন বললেন। 'ওই পাজীটার সঙ্গে যেতে দেয়ার ইচ্ছে ছিল না আমার।' ফ্রেডের দিকে তাকালেন তিনি। দু'চোখে আগুন। 'শেলিকে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করল ও। ধাক্কাটাও দিতে চাইনি। কিন্তু দিয়ে ফেললাম। মাটিতে পড়ে গেল সে। পাথরে মাথা ঠুকে গেল। অ্যাক্সিডেন্ট। বিশ্বাস কর, সোফি। আমি ওকে ভালবাসতাম। দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালবাসতাম।'

'জানি,' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল সোফি। 'তারপর তুমি এমন করে সাজালে কেসটা, যেন মাথায় বাড়ি খেয়ে নয়, ছুরি খেয়ে মারা গেছে শেলি। ফ্রেডের ছুরিটা তার গাড়ি থেকে এনে লাশটার বুকে ছুরি মারলে। কবর দিলে এখানে। ছুরিটা নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখলে গাছের গোড়ায় গর্তে। যাতে সবাই ভাবে

ফ্রেডই শেলিকে খুন করেছে। তারপর লাগলে ফ্রেডের পেছনে। তুমি মানুষ না, বাবা, পিশাচ! মানুষ হলে খুনটা করার পর ফ্রেডকে ছেড়ে দিতে। মেয়ের শোকে পাগল হয়ে গিয়ে অন্য কিছু করতে...'

'তাই তো করেছি! ফ্রেড আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে! আমার সংসারটাকে ছারখার করে দিয়েছে! কেন ছাড়ব ওকে?' পাগলের মত চিৎকার করে উঠলেন জেনসেন। 'সব ওর দোষ! ওর কারণেই সব ছারখার হয়ে গেছে আমার!'

'যতই আবেগে ভরা কথা বলুন মিস্টার জেনসেন,' মুখ খুলল ফ্রেড, 'আমাকে ফাঁকি দিতে পারবেন না। মাথা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা আপনার। আপনি জানতেন, আদালতে আবেগ দেখিয়ে খুনের দায় থেকে পার পাবেন না। তাই এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিলেন–ফ্রেডের ওপর প্রতিশোধ এবং নিজেকে খুনের দায় থেকে বাঁচানো। সে-জন্যেই কেসটা এমন ভাবে সাজিয়েছিলেন, যাতে আপনাকে কেউ সন্দেহ করতে না পারে। কেসটা ফ্রেডের বিপক্ষেই যেত। কেউ কি আর কল্পনা করত, নিজের মেয়েকে খুন করেছেন আপনি। ফ্রেডের কথা কেউ বিশ্বাস করত না। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। আপনার ভয় ছিল, ফ্রেড বেঁচে থাকলে আপনি নিরাপদ নন, সত্যি কথাটা প্রমাণ হয়ে যেতে পারে যে কোন দিন। নিরাপদ একমাত্র যদি তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পারেন। সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন এতদিন। সে-জন্যেই তাকে আজ সন্ধ্যায় হাতে পাওয়ার পরেও ইচ্ছে করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। হাতকড়াটা খুলে রেখেছিলেন। চেয়েছিলেন সাক্ষী-প্রমাণ রেখে খুন করতে, নইলে তখনই গুলি করে মারতেন–এত কাছে থেকে দুই-দুইবার গুলি মিস হওয়ার কথা নয় আপনার মত ঝানু পুলিশ অফিসারের। এমন করে সাজাতে চেয়েছিলেন কেসটা, যেন পালানোর সময় আপনার গুলি খেয়ে মরেছে ফ্রেড, এবং সেটা অন্য কারও সামনে, আদালতে যাতে আপনার সামনে সাক্ষী দিতে পারে। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, মিস্টার জেনসেন। আপনার নিজের মেয়ের চোখেই ধুলো দিতে পারলেন না। ঠিকই বুঝে ফেলল সোফি, আপনিই তার বোনকে খুন করেছেন...'

জ্বলন্ত চোখে ফ্রেডের দিকে তাকালেন জেনসেন। চোখে তীব্র ঘৃণা। 'তুমি আমাদের শান্তি নষ্ট করেছ, ফ্রেড। মরতে তোমাকে হবেই। তারপর আমার যা হয় হোক। আর আমি কেয়ার করি না।'

জেনসেনকে আবার রিভলভার তুলতে দেখে অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল রবিনের মুখ থেকে। দুই হাতে ধরে রিভলভারটা ফ্রেডের দিকে সোজা রাখার চেষ্টা করলেন তিনি। ট্রিগারে চেপে বসতে শুরু করল আঙুল।

ঠিক এই সময় গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে উড়ে এসে পড়ল একটা বিরাট ছায়া। ঝাঁপিয়ে পড়ল জেনসেনের ওপর।

একুশ

আরও একবার গুলির শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল বনের গাছে গাছে।

লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল রবিন। ধাক্কা দিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিল ফ্রেডকে। 'গুলি লেগেছে...'

লাগেনি। ফ্রেডকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখেই বোঝা গেল।

উত্তেজিত ঘেউ ঘেউ শোনা যাচ্ছে। ফিরে তাকাল রবিন। জেনসেনের হাত কামড়ে ধরে রেখেছে রাফিয়ান, কোনমতেই তুলতে দিচ্ছে না। পিস্তলটা পড়ে গেছে জেনসেনের হাত থেকে। কুকুরটা সময়মত এসে ঝাঁপিয়ে না পড়লে গুলি মিস হত না জেনসেনের।

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা। রাফিকে থামানোর চেষ্টা করছে না। কিছুটা হতবাক হয়েই তাকিয়ে আছে।

জেনসেনের কাছে এসে দাঁড়াল ফ্রেড। তাঁর হাতের কাছে পড়ে থাকা রিভলভারটা লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিল। ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলল, 'আপনার পরিবার ছারেখারে গেল বলে এত রাগ আপনার, ফ্রেডের পরিবারকে যে বিনা দোষে দুই দুইটা বছর ভয়ঙ্কর মানসিক কষ্টের মধ্যে রাখলেন তার কি হবে, মিস্টার জেনসেন? দুটো বছর বেচারা ফ্রেডকে দৌড়ের মধ্যে রেখেছিলেন। ছোটাছুটি, পালিয়ে বেড়ানো–একটা সেকেন্ডের জন্যে স্বস্তি পায়নি বেচারা এবং এর জন্যে পুরোপুরি দায়ী আপনি। আপনার জেদ, আপনার আক্রোশ। আপনি মানুষ না, মিস্টার জেনসেন। পিতা নামের অযোগ্য।'

হাঁ করে ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। জেনসেনও অবাক। ফ্রেডের কণ্ঠস্বর এ রকম আমূল বদলে গেল কিভাবে!

বিমূঢ়ের মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল রবিন, 'কিশোর, তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ফ্রেডের অভিনয় করে এসেছি এ ক'দিন, ভয়ানক এক খুনীকে ফাঁদে ফেলার জন্যে। এ ভাবে নাটক সৃষ্টি করে এখানে টেনে আনতে না পারলে কোনভাবেই প্রমাণ করা যেত না কে খুন করেছে শেলিকে। কেউ বিশ্বাস করত না।' টান দিয়ে মাথা থেকে পরচুলাটা খুলে আনল কিশোর। বেরিয়ে পড়ল কোঁকড়া কালো চুল। প্লাস্টিকের আলগা নাকটা খুলে নিল। মুখের ভেতর থেকে প্যাড খুলে ফেলতেই বসে গেল 'ফ্রেডের' ফোলা গাল। রাফির দিকে তাকাল। 'এই রাফি, সর্। ছেড়ে দে।'

বিনা প্রতিবাদে নির্বিকার ভাবে জেনসেনের হাত ছেড়ে দিয়ে সরে গেল বুদ্ধিমান কুকুরটা।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে সোফি। জেনসেনও চুপ। ককানোও বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর। হঠাৎ গুঙিয়ে উঠলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি! কে

তুমি?'

'আমি কিশোর পাশা, মিস্টার জেনসেন,' জবাব দিল কিশোর। 'শখের গোয়েন্দা। রবিন আর মুসা আমার সহকারী।'

'কিন্তু…তুমি এর মধ্যে ঢুকলে কি করে?' প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন জেনসেন।

'ঢুকিনি, ঢোকানো হয়েছে। রবিন লাশটা আবিষ্কারের পর পত্রিকায় ছাপা হলো নিউজটা। ফ্রেডের চোখে পড়ল। ব্ল্যাক সিটিতে হাজির হলো সে। রবিনের পরিচয় জানতে পেরে, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জেনে সোজা গিয়ে হাজির হলো রকি বীচে। তাকে সাহায্য করতে অনুরোধ করল। সব কথা খুলে বলল। রাজি হয়ে গেলাম আমি।'

'ফ্রেড এখন কোথায়?'

'আমাদের বাড়িতে। ক'দিন ধরেই আছে ওখানে। লুকিয়ে। আপনার ভয়ে, মিস্টার জেনসেন…'

গুঙিয়ে উঠলেন জেনসেন। কাঁধ চেপে ধরে আছেন। মাটিতে নেতিয়ে পড়লেন তিনি। 'সোফি…হাসপাতালে খবর দে! আর সহ্য করতে পারছি না!'

দ্বিধা করল সোফি। মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল হাতের রিভলভারটা। দৌড় দিল রাস্তার দিকে। গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে ফিরে তাকিয়ে তিন গোয়েন্দাকে জানাল, 'পুলিশের রেডিও কি ভাবে ব্যবহার করতে হয়, জানি আমি। অ্যামবুলেন্স ডাকতে যাচ্ছি। তোমরা বাবাকে দেখো, প্লীজ!'

তাকে বনের মধ্যে হারিয়ে যেতে দেখল রবিন। ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে। 'এ সব মুসা জানে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'জানে। তাকে নিয়েই তো প্ল্যানটা করেছি।'

আহত স্বরে বলল রবিন, 'কিন্তু আমাকে জানাওনি কেন?'

হাসল কিশোর। 'তোমাকে জানালে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারতে না। অভিনয় করতে হত। ডিটেকটিভ জেনসেনের অভিজ্ঞ চোখকে ফাঁকি দিতে পারতে না। সন্দেহ করে বসতেন। কোনমতেই তাঁকে ফাঁদে ফেলে তখন তাঁর মুখ দিয়ে স্বীকার করাতে পারতাম না খুনটা তিনিই করেছেন। এই নাটকটার প্রয়োজন ছিল, রবিন। এ ছাড়া অন্য কোন ভাবেই প্রমাণ করা সম্ভব ছিল না তিনিই খুনী। আর সেটা প্রমাণ করা না গেলে বেচারা ফ্রেডকেও পালিয়ে বেড়াতে হত চিরকাল।'

সব রহস্যের সমাধান হয়ে যেতেই উত্তেজনাও শেষ হয়ে গেল। ক্লান্তি টের পেল এতক্ষণে রবিন। ভেঙে আসছে শরীর। বসে পড়ল ধপ্ করে। খুঁড়ে তোলা ঠাণ্ডা মাটির স্তূপে হেলান দিল। চোখ বুজে এল আপনাআপনি।

'কোন্ নামে ডাকব আপনাকে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'টম, নাকি ফ্রেড?'

'ফ্রেড,' জবাব দিল ফ্রেড। মুচকি হাসল। 'আর কি ছদ্মনামের প্রয়োজন আছে?'

'না, তা নেই,' রবিন বলল। 'আর টম গ্যারিবাল্ডি নামটাও অবশ্য আপনার

ছিল না,' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'ছদ্মবেশী গোয়েন্দার ছদ্মনাম।'

জেনসেনকে পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেদিন ভোরে, সেদিনই বিকেলবেলা, রবিনদের ব্ল্যাক ফরেস্টের বাড়ির লিভিংরুমে বসে ঘটনাটা নিয়ে কথা বলছে তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে আছে ফ্রেড হুফার। সোফি হাসপাতালে। সারাক্ষণ বাবার পাশে থাকছে। তাকে দেখাশোনা করার জন্যে।

রবিনের পায়ের কাছ থেকে সামান্য দূরে, সোফার কাছেই মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে রাফি।

'অনেক প্রশ্নের জবাবই জানা বাকি,' ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'পালাতে হবে বুঝলেন কি করে আপনি? কি করে জানলেন শেলির খুনের দায়টা আপনার ওপর চাপিয়ে দেয়ার ফন্দি করেছে জেনসেন?'

চোখ বুজল ফ্রেড। যেন মনে করার চেষ্টা করছে। 'সে-রাতে,' চোখ খুলল সে, 'যে রাতে মারা গেল শেলি, তাকে তুলে নেয়ার জন্যে ওদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। বাড়িটা তখন অন্ধকার। কেউ ছিল না। সোফির কথামত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন শেলিকে আসতে দেখলাম না, ঘাবড়ে গেলাম, ভাবলাম, মত বদল করেছে শেলি। বাড়ি থেকে পালাবে না।'

চুপ হয়ে গেল ফ্রেড। নীরবে তার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। মুসা আর কিশোরও চুপ।

'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, বুঝলে,' ফ্রেড বলল, 'শেলিকে না আসতে দেখে। বাড়িতে গিয়ে যখন দেখলাম অন্ধকার, শেলিকে পেলাম না, মনটা এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল না…আমি মনে করেছিলাম, তাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলার জন্যে কোন আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে গেছে জেনসেন…' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'ফিরে যাওয়ার সময় বনের মধ্যে আলো দেখলাম। শেলির গলাও কানে এল মনে হলো। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে দৌড় দিলাম কে চিৎকার করছে দেখার জন্যে।…খোদা, আর কয়েক মিনিট আগে যদি পৌঁছতে পারতাম!'

আবার চুপ হয়ে গেল ফ্রেড।

'তারপর?' ধৈর্য রাখতে পারছে না আর রবিন। শোনার জন্যে অস্থির।

'ততক্ষণে সব শেষ!' প্রায় ফিসফিস করে বলল ফ্রেড। 'দেখি, হাঁটু গেড়ে বসে আছে জেনসেন। বিলাপ করছে মেয়ের জন্যে। শেলি পড়ে আছে মাটিতে। মাথাটা একটা চোখা পাথরের ওপর। এগিয়ে গেলাম, যেটা করা উচিত হয়নি। কিন্তু আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। শব্দ শুনে ফিরে তাকাল জেনসেন। ওর চোখে খুনীর দৃষ্টি দেখতে পেলাম। হোলস্টারে হাত দিতেই চমক ভাঙল আমার। বুঝে গেলাম, কুকুরের মত গুলি করে মারবে আমাকে। কোন দিকে না তাকিয়ে দিলাম দৌড়। অন্ধকার বনের মধ্যে আমাকে ধরতে পারল না জেনসেন। কোনমতে বন থেকে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি গাড়ি থেকে বহুদূরে সরে এসেছি। একটা বাস যাচ্ছে দেখে আর কোন উপায় না দেখে তাতেই চেপে বসলাম।

'সাংঘাতিক লোক!' জেনসেনের কথা মনে হতে ঘৃণায় নাকমুখ কুঁচকে ফেলল রবিন। 'তারপর কি করলেন?'

'বাড়ি ফিরে গেলাম,' ফ্রেড বলল। 'গিয়ে শুনি, পুলিশ আমার খোঁজ করে গেছে। সন্দেহ হলো, আমাকে ফাঁসানোর জন্যে নয় তো? মা'কে খুলে বললাম সব কথা। তারপর পালালাম। বুঝতে পারছিলাম, জেনসেন আমাকে ফাঁসাতে চাইলে কিচ্ছু করার নেই আমার। কোন ভাবেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারব না। গাড়িটাও ফেলে এসেছি বনের ধারে। আবার বাসে চেপে বসলাম। তারপর এক বাস থেকে আরেক বাস, চলতে থাকলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে। কোথায় যাব ঠিক করতে পারছিলাম না।'

'পরে? দুটো বছর কি করলেন?' জানতে চাইল রবিন। এ সব কথা জানা কিশোর আর মুসার। আগেই শুনেছে ফ্রেডের মুখে। ওরা কোন প্রশ্ন করল না।

রবিনের প্রশ্নের জবাব দিল ফ্রেড, 'আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে লুকিয়ে থেকেছি। একখানে বেশিদিন থাকার সাহস পাইনি। কেবলই ছুটে বেড়িয়েছি এখান থেকে ওখানে। বার বার নাম বদল করেছি। বাড়ি ফেরার সাহস করতে পারিনি, জেনসেনের ভয়ে। জানতাম, ফিরলেই ধরবে আমাকে।' আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফ্রেড। 'কি যে ভয়াবহ সময় কাটিয়েছি, বলে বোঝাতে পারব না। ভয়ানক দুঃস্বপ্ন! তুমি আমাকে বাঁচালে রবিন, লাশটা খুঁজে বের করে। তুমি বের না করলে খবরটা প্রকাশও হত না, কিশোর আর মুসার সাহায্যও নিতে পারতাম না, চিরকাল জানোয়ারের মত তাড়া খেয়ে বেড়াতে হত আমাকে। নয়তো পুলিশের হাতে ধরা দিতে হত। কিংবা আত্মহত্যা।'

নড়েচড়ে বসল রবিন। রাফিও নড়ল। বড় করে হাই তুলল। চোখ মেলল একবার। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

'রোগটা তোমার সময়মতই হয়েছে, রবিন,' হাসল কিশোর। 'কল্পনায় সূত্রগুলো দেখতে না পেলে এত সহজ হত না কেসটা ভেদ করা। জেনসেনকে ফাঁদে ফেলা হত আরও কঠিন। সত্যি, কত রকম অবিশ্বাস্য ঘটনাই না ঘটে পৃথিবীতে।'

'এতদিনে তাহলে বুঝলে,' সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ধরে বসল মুসা। 'আমি যখন অদ্ভুত কোন ঘটনার কথা বলি, তখন তো হাসো। রবিনের বেলায় না হয়ে ঘটনাটা অন্য কারও বেলায় হলে এবারও তোমাকে বোঝানো কঠিন হত।'

'দেখো,' গম্ভীর স্বরে কিশোর বলল, 'আমি কখনও কিন্তু বলিনি, অদ্ভুত ঘটনা ঘটে না পৃথিবীতে। ঘটে, তবে সব কিছুরই একটা ব্যাখ্যা থাকে। সেই ব্যাখ্যাটাই আমি খুঁজে বেড়াই।'

'তারমানে বলতে চাও, ভূতও আছে?'

'তা বলব না, যতক্ষণ না নিজের চোখে দেখব। দেখলে আর অবিশ্বাস করব না। তবে ব্যাখ্যা খুঁজব, এটাও ঠিক।'

'যদি না পাও?'

'তাহলে বুঝব ওই রহস্য ভেদ করা আমার ক্ষমতার বাইরে। স্রষ্টা তো আর সব ক্ষমতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাননি মানুষকে।'

'তাহলে সেই আশাতেই রইলাম আমিও।' গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল মুসা, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভূতও একদিন না একদিন তোমার চোখে পড়বেই।'

'পড়ুক, সেটাই তো চাই আমি,' কিশোর বলল। 'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রহস্যগুলোর একটা–ভূত রহস্য। চোর-ডাকাত ধরা কিংবা গুপ্তধন উদ্ধারের চেয়ে সে-সব রহস্যের কিনারা করা অনেক বেশি উত্তেজনাপূর্ণ আর আনন্দের হবে। বিপদ বেশি, জটিলতা বেশি, কাজেই মজাও বেশি। একটা কথা ভুলে যাও তুমি, মুসা–উদ্ভট ঘটনা একেবারেই ঘটে না, যদি বিশ্বাস করতাম, তাহলে আমাদের কার্ডে: "ছিঁচকে চুরি থেকে শুরু করে ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, এমনকি ভৌতিক রহস্যের তদন্তেও পিছপা নই", এ কথাগুলো আর লিখতাম না। সেই প্রথম যেদিন "তিন গোয়েন্দা" গঠন করলাম, সেদিন থেকেই লিখে এসেছি, ভুলে যাওয়ার তো কথা না। মনে না থাকলে হেডকোয়ার্টারে গিয়ে বাক্সের মধ্যে খুঁজে দেখতে পারো, একদম প্রথম ছাপা কার্ডগুলোর বেশ কয়েকটা পেয়ে যাবে এখনও, টেরর ক্যাসলের রহস্য ভেদ করতে যাবার আগে যেগুলো ছেপেছিলাম...'

তাড়াতাড়ি দুই হাত তুলে বাধা দিল মুসা, 'থাক থাক হয়েছে, হার স্বীকার করছি আমি, গলাবাজিতে তো তোমার সঙ্গে পারব না! বহুবার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছ "ভূত বলে কিছু নেই", কিন্তু এখন...'

'কেন করেছি, তারও ব্যাখ্যা আছে...'

'দোহাই তোমার, ওসব ব্যাখ্যা এখন আর শুনতে চাই না। আমি জানি, ভূত আছে। একদিন সেটা তোমারও চোখে পড়বে। ব্যাখ্যা শুনে আর মাথা গরম করার দরকার নেই। কট্টর যুক্তিতর্কের মধ্যে ঢুকলেই আমার খালি খিদে পায়। এই যে এখন যেমন প্রাণটা আইঢাই করছে শরবত জাতীয় কিছু খাওয়ার জন্যে।...রবিন, আছে নাকি তোমাদের ফ্রিজে কোকটোক কিছু? নিয়ে এসো, জলদি! কমপক্ষে একটা দেড় লিটারের বোতল চাই, এর কমে গলাটা ভিজবে না এখন আমার, কিশোরের খড়খড়ে বক্তৃতা শুনতে শুনতে চৈত্র মাসের রোদে পড়ে থাকা কাঠের মত খটখটে হয়ে গেছে!'

হাসল রবিন। 'এক মিনিট। দিচ্ছি এনে।' ফ্রেডের দিকে তাকাল সে। 'ফ্রেড, আরেকটা কথা–ছুরিটা কার? জেনসেন আমাকে বলেছেন, ওটা আপনার হাতে দেখেছেন?'

'দেখার কথাটা মিথ্যে,' জবাব দিল ফ্রেড। 'কি ভাবে, কখন দেখবে? আমি কি আর তার সামনে বের করেছি নাকি। তবে ছুরিটা আমার। জন্মদিনে আমার দাদা উপহার দিয়েছিল। গাড়িতে রেখে দিয়েছিলাম। নিশ্চয় গাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে ছুরিটা চোখে পড়ে জেনসেনের। ওটা দিয়ে আমাকে ফাঁসানোর ব্যবস্থাটা আরও পাকাপোক্ত করে।'

***

ভলিউম ৪৩

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস আঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে।
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি,
নাম তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙ্গালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।
তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি-
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০